THE PASSION OF SACCO AND VANZETTI

by Howard Fast

Howard Fast

Translated into Bengali

by Ananda Dasgupta

প্রচ্ছদ / সত্য চক্রবর্তী

প্রথম পত্রপুট সংস্করণ : পৌষ, ১৩৫৬



পত্রপুট

প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, পত্রপুট ২/৩ এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-৭০০০১২। মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০৭৩

মতবাদ, জন্মভূমি অথবা দেশের মানুষের প্রতি কৃতঘ্নতার চেয়ে কারাজীবন এমন কি মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় মনে করেছেন যাঁরা :

আমার উপন্যাস 'সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি' বাংলায় অনূদিত হচ্ছে জেনে গভীর প্রীতি অনুভব করছি। এ শুধু আমার দেশের দুজন শ্রমিকের ভয়াবহ নির্যাতন ভোগের কাহিনীই নয়, এ দেশ কাল নির্বিশেষে নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতি অবিচারের চিরন্তন উপাখ্যান।

ব্রিটিশ শাসনে এই 'বিচারের' অর্থ আপনারা কেমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন! আমি তাই আশা করছি, পৃথিবীর অপর প্রান্তের এক বিদেশীর লেখা মনে করে এই বই আপনারা পড়বেন না, পড়বেন এমন একজনের রচনা বলে যে মানুষটি আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে সহগামীর মতো জড়িত বলে বোধ করে, যে আপনাদেরই মতো দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে এমন একটি দিনের জন্য, যেদিন অবসান হবে সমস্ত নির্যাতন-নিপীড়নের, সমস্ত ঔপনিবেশিকতার, আর সমস্ত যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের, যা সৃষ্টি করেছে ধনিকরা, অথচ যার বিষময় ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ নিঃস্ব মানুষকে।

অতি সাধারণ আমার কাহিনী কিন্তু নিষ্ঠুরতম নির্যাতনঃ এক অর্থে অত্যন্ত সাধারণ, যেমন সহজ সাধারণ আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা, যেমন সাধারণ সত্য সেই দিনটির অবশ্যম্ভাবিতা, যেদিন সংবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুলবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌভ্রাত্র!

—হাওয়ার্ড ফাস্ট

কথারম্ভ

উনিশশো বিশের পনেরোই এপ্রিল ম্যাসাচুসেট্সের দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে সযত্ন পরিকল্পিত নৃশংস এক ডাকাতি হলো,—বেতনের টাকা ছিনিয়ে নিলো দুর্বৃত্তরা। ওদের হাতে নিহত হলো দুজন,—একজন ক্যাশিয়ার আর একজন রক্ষী।

এর ক'দিন পরেই নিকোলা সাকো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তিকে গ্রেপ্তার করা হলো এই ডাকাতি আর খুনের অভিযোগে। সাকো ছিলো জুতোর কারিগর আর ভাঞ্জেত্তি মাছের ফেরিওয়ালা— আগে সে ছিলো রুটি ব্যবসায়ী এবং ইঁটের কারখানায় শ্রমিক। ম্যাসাচুসেট্সের ডেডহ্যামে তাদের বিচার হলো। জুরিরা তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করলেন।

ম্যাসাচুসেট্সের আইন অনুসারে এ রকম মামলায় বিচারক রায় দেওয়ার আগে দু পক্ষেরই যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করার সুযোগ থাকে। স্যাকো আর ভাঞ্জেত্তির এই মামলায় সওয়াল চলেছিলো সাত বছর ধরে। শেষে উনিশশো সাতাশের এপ্রিল মাসের ন তারিখে প্রধান বিচারপতি এদের দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আর নির্দেশ দিলেন, এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হবে উনিশশো সাতাশের দশই জুলাই।

যাই হোক নানান কারণে এই দণ্ডাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা হলো উনিশশো সাতাশের বাইশে আগস্ট।

এক

ভোর ছটায় দিনের শুরু। যদি তাই হয়, তবে যখন দিনের শেষ বলে অনেকে মনে করেন, সেই মধ্যরাত্রির তখনো আঠারো ঘণ্টা বাকি থাকে।

ভোর ছটায় সব প্রাণী আর তাদের সমগোত্রীয়েরা দিনের আগমনী অনুভব করে। মাছেরা চিৎ হয়ে মেঘলা আকাশের ধূসর যে আলোটুকু পড়ে জলের উপরে তাই দেখে একবার। পাখিরা আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে সূর্যালোকে স্নান করতে থাকে। নিচে মাটির ধূলি মিশে যায় সকাল-বেলার শিশিরবিন্দুর সঙ্গে। আর কুয়াশার মাঝখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো এক অষ্টভুজ বন্দীশালা।

বন্দীশালার দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রক্ষীরা তাদের ভাবলেশহীন বোকা-বোকা চাউনি তুলে ধরে দিনের প্রথম আলোর দিকে। এখনি মোরগ ডেকে উঠবে, আর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সমস্ত পৃথিবী। বন্দীশালার রক্ষীও অন্য সবার মতোই মানুষ। তারও ভাবনা আছে, আছে স্বপ্ন। কিন্তু একথাও সে জানে যে নিপীড়নের পর নিপীড়ন দিয়ে গড়া এই সভ্যতা তার আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সে তোমার আমার থেকে পৃথক। তার কর্তব্য কারো সর্বোচ্চ আশা আর কারো তীব্র ভীতিকে বাঁচিয়ে রাখা। এগুলো তাকে জীইয়ে রাখতেই হবে তার লাঠি আর বন্দুক দিয়ে।

সকালবেলার এই সময়ে বন্দীশালার মৃত্যুকুঠুরিতে এক চুরির আসামীর ঘুম ভাঙলো। আলো ফুটে উঠবার প্রথম আভাস পেয়ে পৃথিবীর নিঃশব্দ আড়মোড়া ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙলো তার। শয্যায় শুয়েই সে হাত পা ছড়ালো, আলস্য ভাঙলো আর যেমন নিদ্রার পরে তার চেতনা ফিরে এলো তেমনিই সে অনুভব করলো তার হাড়ে, তার রক্তধারায় হামাগুড়ি দিচ্ছে একটা ভীতিবোধ।

লোকটির নাম সিলেস্তিনো মাদীরো। বয়স পঁচিশ বছর, কেবল

যৌবনের শুরু, দেখতে সুন্দর। ঘৃণা, সংঘর্ষ আর উত্তেজনায় ভরা এই ভয়ানক বছরগুলো তার চেহারার উপরে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। দীর্ঘ তার নাক, ভরাট মুখ আর সোজা দুটি ভ্রূ। গভীর দুটি চোখ ভয়ে আর জীবনতৃষ্ণায় ভারাক্রান্ত।

এই হচ্ছে মাদীরো মানুষটি, চোর। ঘুম ভেঙে সে চেতনা ফিরে পেলো আর ফিরে পেলো এই বোধ যে পৃথিবীর মাটিতে আজই তার জীবনের শেষ দিন।

ভাবতে গিয়ে সে কেঁপে উঠলো, একটা শীতল ঢেউ বয়ে গেলো তার দেহের ভিতর দিয়ে। এখন যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু এই শীতলতাকে রোধ করার জন্য নিজের বুকে একটু উত্তাপ সৃষ্টি করার আশায় সে কম্বলটা টেনে দিলো গায়ের উপরে। কোন লাভ হলো না তবু, ঠাণ্ডা ঢেউটা বার বার বয়ে বেড়াতে লাগলো তার দেহের মধ্যে। এমনি করে সে জাগলো, ভয়ে জমাট বাঁধা তার বুক।

প্রথমে মাদীরো ভয়টাকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করলো। ভাবতে লাগলো, বন্দীশালায় নেই সে। চোখ বুজে অতীতের স্মৃতিতে ডুব দিতে চাইলো, যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে সে অন্য কোথাও আছে; যেন সে পঁচিশ বছরের পূর্ণ-যৌবন একটি মানুষ নয়, সে যেন আবার ম্যাসাচুসেট্সের নিউ বেডফোর্ডের স্কুলের সেই ছোট্ট ছেলেটি। স্কুলের দিনগুলোর কথা ভাবতে লাগলো সে। যেন সেই স্কুলের একটি ঘরে বসে মাস্টারমশাই তাকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন। অঙ্ক সে ভালোই পারতো, অঙ্ক বেশ খেলতো তার মাথায়। তারপরেই যেন সে আরেক মাস্টারমশাইয়ের কাছে এক জটিল ভাষার বানান শিখছে। তার বাপ মা ভুল করেছিলেন তাকে এই ভাষা শিখতে বলে, যেমন তাঁরা ভুল করে পছন্দ করেছিলেন নিউ বেডফোর্ড, ম্যাসাচুসেট্সের মতো রাজ্য আর সর্বোপরি আমেরিকার মতো একটা দেশ। আর এই ক্লাসেই সে বোকা বনে যেতো, এই বিশ্রী শব্দগুলোকে সে কিছুতেই বাগ মানাতে পারতো না।

তার বাপ-মার পছন্দ করে এই দেশে আসার কথা মনে পড়তেই আবার সে স্কুল থেকে ফিরে এলো বন্দীশালায়। তখন সে তার বাপ-মাকে অভিসম্পাত দিলো পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ থেকে চলে আসার জন্য, যেখানে তার

পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন ওরা আমেরিকায় আসার আগে পর্যন্ত। যে বাপ আর স্নেহময়ী মা তাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন তাঁদের অভিশাপ দিতে দিতেই সে হামা দিয়ে শয্যার বাইরে এসে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসলো।

তার পাপের জন্য প্রার্থনা করলো সে। পাপের তার সীমাসংখ্যা নেই— মদ খাওয়া, জুয়াখেলা, মেয়ে ফুসলানো, চুরি আর খুন। হাত জোড় করে বিছানায় মুখ রেখে সে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলো :

'মা মেরী, আমি যা করেছি তার জন্য আমাকে মার্জনা করো। মানুষের পক্ষে যত রকমের পাপ করা সম্ভব আমি সবই করেছি, কিন্তু তবু আমি মার্জনা পেতে চাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমি আমার কথা, আমার ভাগ্যের কথা আর যার ফলে আমি আজ এখানে এলাম সেই কাজগুলোর কথা ভেবে দেখেছি। আমি বুঝতে পেরেছি এর সবকিছু আমি স্বেচ্ছায় করিনি। আমি তো পাপের পঙ্কে ডুবতে চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম ক্ষমা। আর যা কিছু সব ঘটে গিয়েছিলো, আমি শুধু ক্ষমাই চেয়েছিলাম। অন্যায় বেঁচে থাক, এ আমি চাইনি। যা অন্যায়, তাকে নির্মূল করতে চেয়েছিলাম আমি। কেউ যেন আমার অপরাধের জন্য শাস্তি না পায়। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করেছি। ঐ জুতোর কারখানার শ্রমিক আর মাছের ফেরিওয়ালার নির্দোষিতা আমি ঘোষণা করেছি। আর কী করতে পারতাম আমি? আমি কি জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম? চেয়েছিলাম কি পৃথিবীতে আসতে? আজ আমি বন্দীশালায়। আমার জীবনে যা সম্ভব, ভালমন্দ সবই আমি করেছি। এখন সে জীবন শেষ হলো। আমায় তুমি শুধু ক্ষমা করো।'

প্রার্থনা শেষ করলো সে, কিন্তু তার পরেও মৃদুস্বরে সে তার নাম উচ্চারণ করতে লাগলো, যেন এই নামোচ্চারণের মধ্য দিয়ে কিছু যাদুকরী শক্তি আহরণ করতে চায় সে। সে বলতে লাগলো, 'আমি সিলেস্তিনো মাদীরো।' বার বার, বিশ বারেরও বেশী এই কথা বলে হঠাৎ সে ভেঙে পড়লো আর দু হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলো। প্রায় নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো সে, কারণ এই অতি প্রত্যূষে সে আর কোন বন্দীর ঘুম ভাঙাতে চায়নি। কিন্তু যদি কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতো, ওর কথা-

গুলো শুনতে পেতো, তবে সেও অবিচলিত থাকতে পারতো না। নিজের জন্য আর জীবনের এই পরিসমাপ্তির জন্য তার গভীর দুঃখ অন্যের হৃদয়কেও বিদীর্ণ করতো।

আদেশ হয়েছে তাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে মরতে হবে, আর আজ রাত্রেই সেই আদেশ কার্যকরী করা হবে। মাত্র পঁচিশ বছরের তার জীবন। এর মধ্যে ক'বছর আবার কেটেছে বন্দীশালায়। তবু এই কটা বছরের মধ্যেই যত অপরাধ সে করেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

শিশু বয়সেই ঘৃণা, ক্রোধ আর হতাশায় সে পশুর মতো বন্য হয়ে গিয়েছিলো, বেড়ে উঠেছিলো শহরের নোংরা গলিঘুঁজিতে দারিদ্র্যের মধ্যে পঙ্গু হয়ে—প্রথমে ম্যাসাচুসেট্সের নিউ বেডফোর্ডে, পরে প্রভিডেন্সের রোড দ্বীপে। স্কুলে তার বিদ্যা হয়নি এতটুকুও। ওরা ওকে ভাবতো একটি নির্বোধ মূর্খ। পড়াশোনায় ভালো ছিলো না বলে অন্য ছেলেরা ওর নিত্যনতুন নামকরণ করতো, ডাকতো 'হাঁদারাম, গোবরগণেশ।' কিন্তু আসল কথা, ওর চোখ ছিলো খারাপ, কোন কিছুর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে ওর চোখ জ্বালা করতো।

তাই সে স্কুল পালিয়ে অন্য জিনিস শিখতে লাগলো। বারো বছর বয়সে সে পাহারাহীন গুদামঘরে চুরি করতে লাগলো, আর বোঝাই গাড়ির মাল চুরি করায় হাত পাকালো চোদ্দ বছর বয়সে। পনেরো বছরে সে হলো বেশ্যার দালাল আর দালালীর ফন্দিফিকির সব রপ্ত করে ফেললো। তার জীবন কাটতে লাগলো জুয়ার আড্ডায় আব বেশ্যাবাড়িতে। সে আকণ্ঠ মদ পান করতো, যে সভ্যতায় সে মানুষ যেন তার নির্যাস পান করতো সে। সতেরো বছর বয়সে তার পাঁচটি লুণ্ঠন কার্য শেষ। তার ছ মাস পরে প্রথম সে মানুষ খুন করলো।

মোট কথা, এই হচ্ছে একটি চোর। কী করে সে চোর হলো, সে ইতিহাস জটিল কতগুলো অবস্থার ঠাসবুনানিতে ভরা, যা সে নিজে বুঝতোও না আর বিশ্লেষণ করতেও পারতো না। এমন কেউ ছিলো না যে ওকে সব বুঝিয়ে দেবে। যত নিষিদ্ধ জায়গা আর অলিগলিতে থেকে থেকে তাদেরই অংশ বনে গিয়েছিলো সে। পুলিস তাকে ধরলেই খুব মারতো, যেন তারা

দেখেই বুঝতো ও একটি চোর ; যেন কথাটা ওর গায়ে ছাপানো রয়েছে, খোদাই করা রয়েছে, আর যেন সে জন্য ওকে মার খেতেই হবে। এর পর থেকে সে পুলিসের হাত এড়িয়ে চলতে লাগলো আর সে জন্য সম্ভবমত সব কৌশলই অবলম্বন করতে লাগলো।

যখন সৎভাবে জীবন যাপন করার মতো কাজ তার হাতে আসতো, সে প্রত্যাখ্যান করতো। সে জানতোই না কেমন করে কাজ করতে হয়, যেমন সে জানতো না চোর না হয়ে কি করে বাঁচা যায়। কাজের প্রতি তার ছিলো ভয় আর ঘৃণা, ছিলো গভীর বিতৃষ্ণা। তাই যখনই কোন কাজ হাতে আসতো সে পালিয়ে যেতো।

যখন তার প্রকৃতিটা এমনি হয়ে গেলো, তখন যা এর পরে অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটতে লাগলো ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুলভাবে। আর এমনি করেই তার এই জীবনপ্রবাহের ফলে সে পরিণত হলো খুনীতে।

যখন তার বয়স আঠারো বছর এক মাস, তখন ওরা দুজন প্রভিডেন্সে তার কাছে এলো। ওরা তার কথা জানতো, জানতো সিলেস্তিনো মাদীরো ওদেরই দলের। ওরা এসে পূর্বপরিকল্পিত একটি কাজের কথা বললো। সে কি থাকবে তাদের দলে ?

হ্যাঁ, সে থাকবে ওদের দলে।

এ কাজে অনেক টাকা। যদি ওদের দলে থাকে, সে রাজার হালে বাঁচতে পারবে, পকেটে থাকবে অফুরন্ত পয়সা আর সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিতে পারবে মদে আর মেয়েমানুষে।

হ্যাঁ, সে থাকবে এ কাজে।

এই আলোচনার পরদিন, উনিশশো বিশের পনেরোই এপ্রিল সিলেস্তিনো মাদীরো আর তিনজনের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠলো। প্রভিডেন্সের রোড দ্বীপ থেকে তারা চললো উত্তরে, ম্যাসাচুসেট্‌সের দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে। বিকেল তিনটের আগেই ওরা সেখানে পৌঁছলো। একটা জুতোর কারখানার সামনে গাড়িটা দাঁড়ালো। কারখানায় তখন মাইনে দেওয়ার জন্য পনেরো হাজার সাতশো ছিয়াত্তর ডলার ঠিকঠাক করা হচ্ছিলো। ওরা এ খবর জানতো। কারখানায় ওদের লোক ছিলো। গাড়ি

দাঁড় করিয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো। তিনটের দু-এক মিনিট আগে বাক্সে করে টাকাগুলো নিয়ে দুজন রক্ষী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে এদের গাড়ি থেকে দুজন নেমে চলে গেলো ওদের কাছে এবং আত্মসমর্পণ করার কিংবা পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ না দিয়েই ঠাণ্ডা মাথায় ওদের দুজনকে গুলি করে ফেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাক্স তুলে নিয়ে ওরা দুজন লাফিয়ে গাড়িতে উঠলো। আব গাড়ি ছুটলো।

মাদীরোর কাজটুকু ছিলো খুব সোজা। বন্দুকটি তৈরি রেখে সে শুধু গাড়িতে বসে ছিলো। এবার তাকে কাউকে খুন করতে হয়নি। তার হয়ে অন্যরাই খুনটা করেছে। শেষে টাকাটা যখন ভাগ হলো তখন সে পেলো প্রায় তিন হাজার ডলার।

যদি সিলেস্তিনো মাদীরোর জন্মকে অবশ্যম্ভাবী বলা হয়, তবে তার মৃত্যুও তাই। এক অপরাধ করে বেঁচে গেলেও আবার নতুন অপরাধ করতো সে। আর তাই, আজ তার সাত বছর পরে, সে, এই পঁচিশ বছরের মানুষটি মৃত্যুকুঠুরিতে মরণের অপেক্ষা করছে।

সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিহাস হচ্ছে এই যে আরো দুজন মানুষ আজ তারই সঙ্গে মরবে, দুজন মানুষ, যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে দক্ষিণ ব্রেনট্রির এই জোড়া খুনের অপরাধে, যে খুন মাদীরো নিজের চোখে দেখেছে, সে নিজে যার অংশীদার।

মাদীরো সব জানতো। এই মানুষ দুটিকেও চেনে সে। এদের একজন সাক্কো, জুতোর কারখানার শ্রমিক আর অন্যজন ভাঞ্জেত্তি, মাছের ফেরিওয়ালা। দুজনই সহজ সাধারণ ইতালীয় শ্রমিক। মাদীরো নিজে ইতালীয় নয়, সে পর্তুগীজ। তবু তার ভীতসংবদ্ধ অন্তরের গভীরে সে অনুভব করেছে, এরা তার আত্মীয়। তার বন্দীজীবনের এই কবছর সে এই মানুষ দুটির কথা গভীরভাবে ভেবেছে। যে অপরাধে ওদের মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সে অপরাধ ওরা করেনি। তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই ওদের। এ অপরাধ করেছে মাদীরো নিজে এবং এর অনেকখানি দায়িত্বই তার। বন্দীশালায় বসে বসে এই অপরাধের কথা ছাড়া আরো অনেক কিছু ভেবেছে সে, যদিও কিছু ভাবতে পারা তার পক্ষে সহজ ছিলো না। যে সাধারণ জ্ঞানের উপরে

মানুষের চিন্তাধারা দানা বেঁধে ওঠে, সে জ্ঞান ছিলো না তার। তাই তার প্রথম দিকের চিন্তাধারা যেমন ছিলো ধীরগতি, তেমনি বেদনাদায়ক, আর প্রায়ই তার কোন স্বচ্ছ অর্থ কিংবা যুক্তিময় সিদ্ধান্ত থাকতো না। সাধারণ একজন মানুষ কয়েক ঘণ্টায় যা ভাবতে পারতো তার জন্য মাদীরোর লাগতো কয়েকটি পুরো সপ্তাহ।

তবু তার এই কষ্টকৃত চিন্তার মাধ্যমে একটু একটু পরিষ্কার হয়ে উঠলো তার অবস্থা, তার জীবন, তার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে একটা বোধ, আর তার একটা ধারণা হলো সেই অমোঘ শক্তিগুলো সম্পর্কে, যেগুলো তার জীবনের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য দায়ী। ভাবতে ভাবতে নিজের প্রতি আর অন্য সবার প্রতি তার করুণা হলো, আর তার জন্য কখনো সে কেঁদে ফেলতো, কখনো বা প্রার্থনা করতো। এই প্রার্থনার মধ্যে এক সময় তার উপলব্ধি হলো, যে অপরাধ সে নিজে করেছে, যা সম্পর্কে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞ তার জন্য ওদের কিছুতেই সে মরতে দিতে পারে না। আর এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্তি এলো তার মনে, দুর্ভাবনার দ্বন্দ্ব শিথিল হয়ে এলো। এখনো, অনেকদিন পরে হলেও, সে অনুভব করতে পারে কী গভীর শান্তি নিয়ে তার প্রথম স্বীকারোক্তি লিখে বন্দীশালা থেকে সে 'বোস্টন আমেরিকান' কাগজে পাঠাতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কাগজে না পৌঁছে তার স্বীকারোক্তি গিয়ে পড়লো ডেপুটি শেরিফ কার্টিসের হাতে। তিনি চিঠিখানা সরিয়ে ফেলে ব্যাপারটা ওখানেই শেষ করবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মাদীরো ব্যাপারটাকে এমনি শেষ হতে দেবে না। সে নতুন স্বীকারোক্তি লিখে বিশ্বস্ত একজনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলো সেলগুলোর ওপারে নিকোলা সাক্কোর কাছে। পরে সে লোকটি মাদীরোকে বলেছিলো কেমন করে সাক্কো চিঠিটা পড়েছিলো, পড়ে কেমন কাঁপতে শুরু করেছিলো, কেমন করে তার দু গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমেছিলো। আর যখন হতভাগ্য মাদীরো সব শুনলো তখন তার অন্তর নেচে উঠলো আনন্দে আর মন আরেকবার ভরে গেলো অপূর্ব শান্তি আর স্থৈর্যে।

কিন্তু তারপরে অনেকগুলো মাস কেটে গেছে। তবু মাদীরো জানে না

কি হয়েছে তার স্বীকারোক্তির পরে। কিন্তু এ কথা সে বুঝতে পেরেছে যে পূর্বপরিকল্পিত ঘটনাস্রোতের গতি ওতে পরিবর্তিত হয়নি। তারও কিছু লাভ হবে না ওতে, লাভ হবে না সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিরও। তাদের তিনজনকেই মরতে হবে। তাকে মরতে হবে নিজের অপরাধে, আর ওই জুতোর শ্রমিক আর মাছের ফেরিওয়ালা মরবে এমন এক অপরাধের জন্য, যার কিছুই ওরা জানে না।···

মাদীরো প্রার্থনা শেষ করে উঠে তার ছোট্ট কুঠুরির ছোট্ট জানলাটার কাছে চলে এলো। সেখান থেকে সে তাকালো বাইরে নতুন দিনের নতুন আলোর দিকে। পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা মেঘের মতো সকালবেলার ঘন কুয়াশায় বন্দীশালার দেয়ালের একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। তখন কল্পনায় সেই দেয়াল সে পেরিয়ে গেলো আর হঠাৎ এক মুহূর্তে গভীর আনন্দে প্লাবিত হলো তার সমস্ত অন্তর। আজ সে মুক্তিলাভ করবে। তার আত্মা উড়ে যাবে যেখানে শেষ বিচার অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু এ আনন্দ এক নিমেষের, ক্ষণস্থায়ী। মাদীরো বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। একটা শীতল ভীতিবোধ তার সঙ্গী হয়ে রইলো।

আবার তার ইচ্ছা হলো প্রার্থনা করতে। কিন্তু কী প্রার্থনা সে করবে, কী প্রার্থনা করা দরকার তাই সে ভেবে উঠতে পারলো না। সে বিছানায় উঠে বসলো, আর একটু পরেই দু হাতে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে ফেললো। প্রার্থনার চেয়ে চোখের জল অনেক সহজে আসে।

দুই

প্রায়ই যেমন স্বপ্ন দেখেন, তেমনি এক স্বপ্ন থেকে ঘুম ভেঙে উঠলেন ওয়ার্ডেন। কতগুলো স্বপ্ন রাতের পর রাত পুরনো রোগের মতো ঘুরে ঘুরে আসে। প্রায় স্বপ্নেই ভূমিকা বদলে যায়,—ওয়ার্ডেন হন বন্দী আর বন্দীরা ওয়ার্ডেন। এখন তিনি জাগলেন পরিপূর্ণ দিনের আলোয়। জানলা দিয়ে নীল আকাশের একটা টুকরো চোখে পড়ে। কিন্তু তবু সত্যি সত্যি তিনি জেগে উঠলেও এই মুহূর্তে তাঁর মনে হলো স্বপ্নের মানুষগুলো, দৃশ্যাবলী

আর কথাবার্তা যেন এই বাস্তবের চেয়েও সত্য।

স্বপ্নে তিনি একইভাবে প্রতিবাদ করতেন। একই ভয়, একই ভয়ানক হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। তিনি বলতেন, 'আমি ওয়ার্ডেন।'

'তাতে কিছু এসে যায় না।'

'তুমি বুঝছো না, আমি এই বন্দীশালার ওয়ার্ডেন।'

'আসলে তুমিই বুঝছো না কিছু। আগেই তো বলেছি, ওতে লাভ নেই কিছু। একটুও না, মোটেই না।'

'কে তুমি?'

'সেটাও কথা নয়। তোমার নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করো, আর চুপ করে যা বলি তাই করো। এতটুকু গণ্ডগোল করো না।'

'মনে হচ্ছে, তুমি জানো না কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো। আমি ওয়ার্ডেন। আমি যখন খুশি এখানে আসবো, যখন খুশি চলে যাবো। যখন আমার ইচ্ছে তখনই চলে যেতে পারি আমি।'

'না, পারো না। ইচ্ছেমতো তুমি চলে যেতে পারো না। তুমি যেতেই পারো না এখান থেকে।'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'এ তোমার স্বপ্ন, তোমার অহঙ্কার। আমরা তা সহ্য করবো না। তুমি এখন বন্দী। যা বলছি তাই করো। মুখ বুজে আমাদের আজ্ঞা পালন করো, তবেই নিরাপদ থাকবে।'

সাধারণত এমনি ধারায় কথাবার্তা চলতো। ওরা বিশ্বাসই করতো না যে তিনি ওয়ার্ডেন। যতই তিনি তর্ক করুন না কেন, উপস্থিত করুন না কেন প্রমাণের পরে প্রমাণ। ওরা আবার উলটে ওদের প্রমাণ দাখিল করতো।

একবার স্বপ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'জেলরক্ষী কিংবা ওয়ার্ডেন হতে কে চায়? এই কাজ করার স্বপ্ন কে দেখে? শিশুরা চায় পুলিস কিংবা সৈনিক কিংবা উকিল হতে। কেউ বা চায় চার ঘোড়ার জুড়িগাড়ির কোচ-ম্যান হতে। কিন্তু এই পৃথিবীতে কে চায় জেলরক্ষী কিংবা ওয়ার্ডেন হতে, বলতে পারো?'

জাগ্রত অবস্থায় ওয়ার্ডেন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যের কথাই ভাবছিলেন। কোন কোন মুহূর্তে যখন নিজের উপরেই তাঁর করুণা হয়, তখন তাঁর মনে হয় বন্দীশালায় কাজ যারা করে তারা সব ঝড়ে-তাড়ানো মানুষ। যেন এক ঝড়ে তারা এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে, যেটা তাদের নিজেদেরই পছন্দ নয়। আজ এই সকালবেলা এই কথাটাই তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন। শূন্যতাময় এক করুণ অনুভূতি নিয়ে আজ তাঁর ঘুম ভেঙেছে। ঘুমের ঘোরে কোথায় কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, যা হারিয়েছে আজ আর তা ফিরে পাওয়া যাবে না। নিজেকে তিনি বোঝাতে চাইলেন আজকের এই দিনটাকে তিনি চানওনি, সৃষ্টিও করেননি।

ভাবতে ভাবতে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর চটিজোড়ার মধ্যে পা গলিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে চেহারাটাকে ওয়ার্ডেনের উপযোগী করতে চললেন। মুখ ধুতে ধুতে, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তিনি নিজের সঙ্গেই তর্ক করতে লাগলেন। যা তিনি করছেন তার জন্য তিনি নিজে একটুও দায়ী নন,—এই কথাই তিনি বার বার বললেন মনে মনে। এই ভাবনার ফাঁকে একটা কথা তাঁর মনে হলো, যারা জড়িত থাকবে আজকের এই মৃত্যুদণ্ড পালন করার ব্যাপারে, তারা সবাই নিজেকে এই একই কথা বোঝাবে। সবাই চাইবে নিজেকে এ ব্যাপারে নির্দোষ মনে করতে। তাঁর নিজের কথা অবিশ্যি আলাদা। গতকালও তিনি ওয়ার্ডেন ছিলেন, আর নিঃসন্দেহে আগামীকালও তাই থাকবেন। অবস্থা ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে। কারণ কালে মানুষ সবকিছুই ভুলে যাবে। যত গভীরই হোক না কেন প্রেম, এমন প্রেমিক পৃথিবীতে জন্মায়নি যে তার প্রেমিকাকে ভুলতে না পেরেছে। এই ওয়ার্ডেন ছিলেন দার্শনিক, অন্তত খানিকটা। এ যেন এই কাজেরই দোষ, এই পেশার সঙ্গে যুক্ত একটা রোগ। তিনি জানতেন, সব ওয়ার্ডেনই দার্শনিক। তাদের অবস্থা ঠিক জাহাজের বুড়ো কাপ্তেনের মতো; জাহাজের অধিনায়ক বলে নাবিক আর যাত্রী সাধারণ থেকে যার মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা।

আজ এই সকালে তিনি মনে মনে বললেন, 'এরকম ভেবে কোন লাভ নেই। অবশ্যম্ভাবী হয়ে এসেছে আজকের দিনটি, এক সময় এ শেষও হবে।

আমার কাজ হচ্ছে সব ঠিকঠাক করে রাখা, আর সব কিছু যাতে যতদূর সম্ভব সহজ এবং আরামদায়ক হয় তার ব্যবস্থা করা।'

পোশাক পরে তিনি স্থির করলেন প্রাতরাশের আগে একবার মৃত্যু-কুঠুরিগুলো ঘুরে আসবেন। উঠোন পেরিয়ে আসতেই রক্ষীদের দলপতি তাঁকে অভিবাদন করলো, এমনকি দু-একজন বিশ্বস্ত কয়েদীও তাকে অভিবাদন জানালো। ওরা তখন কাজ শুরু করেছে। বন্দীশালার ভোরবেলাকার জীবনপ্রবাহ বইতে আরম্ভ করেছে। লৌহকপাটগুলো ঘটাং করে খুলে যাচ্ছে, ঘর্ঘর করে বন্ধ হচ্ছে। ঠেলাগাড়িতে করে কাচবার জামাকাপড়গুলো নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছে কয়েদীরা। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে বাসন-পত্রের ঝনঝনানি, কর্মপ্রবাহের মৃদু গুঞ্জন। বারান্দাগুলো ঘষে মেজে ঝক-ঝকে করা হয়েছে এরই মধ্যে। সাতটা কেবল বেজেছে। সকালবেলার এই সময়টিতে বন্দীরা চলেছে তাদের ভোরের খাবার খেতে। ওয়ার্ডেন তাদের সারিবদ্ধ পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন পাঁচশো লোকের চলার ছন্দ, পাঁচশো জোড়া জুতোর মসমসানি কংক্রীটের মেঝের উপরে। একটু পরেই দেয়াল ভেদ করে বন্দীশালার কুঠুরিগুলোর উপর দিয়ে তাঁর কানে ভেসে এলো চামচে আর ট্রের ঠুনঠুনানি। তাঁর কান দুটো বন্দীশালার এই ধ্বনিবৈচিত্র্যের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। এই ধ্বনি, এই কলরব তাঁর জীবনেরই অঙ্গ। সেদিক থেকে তাঁর স্বপ্ন একেবারে খাঁটি সত্য। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে এই বন্দীশালায়।

তিনি মৃত্যুকুঠুরিতে এলেন এবং ঠিক করলেন ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে আলাপ করবেন। কারণ ওর সঙ্গে আলাপ করা সহজ। হাত ঘষতে ঘষতে হাসি হাসি মুখে তিনি এগিয়ে এলেন ভাঞ্জেত্তির কুঠুরির কাছে। ঠিক করলেন শোকের ছায়াকেও তিনি নামতে দেবেন না তাঁর কথায়বার্তায়, চালে-চলনে। আলাপ করবেন সহজ স্বচ্ছন্দভাবে।

ভাঞ্জেত্তি পোশাক পরে বিছানার উপরে বসে ছিলো। এগিয়ে এসে সে গম্ভীরভাবে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে করমর্দন করলো।

'সুপ্রভাত, বার্তোলোমিউ। তোমায় সুস্থ দেখে সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

'যতটা দেখছেন, ততটা সুস্থ হয়তো আমি নই।'

'খুব ভালো অবিশ্যি তোমার লাগার কথা নয়। তোমার অবস্থায় কেউই খুব ভালো থাকতে পারে না।'

'হয়তো তাই,' ভাঞ্জেত্তি মাথা নাড়লো, 'কিছু বলার আগে হয়তো আপনি বিশেষ ভাবেন না। অবিশ্যি তাতে কিছু যায় আসে না। সত্য যা তা ঠিক থেকেই যাচ্ছে। প্রায়ই আপনি না ভেবে একেকটা কথা এমন-ভাবে বলেন, তবু তারা সতাই থেকে যায়।'

ওয়ার্ডেন কৌতূহলীর মতো ওকে দেখতে লাগলেন। যদি তিনি নিজে ওর অবস্থায় থাকতেন আজ তবে নিশ্চয়ই ওর মতো আচরণ করতে পারতেন না। তিনি ভয়ানক ভয় পেতেন, তাঁর গলার স্বর আটকে আসতো, ঘাম ঝরতো দরদর করে, আর সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে থাকতো। ওয়ার্ডেন নিজেকে চেনেন, জানেন তাঁর বেলায় এমনি হতো। কিন্তু ভাঞ্জেত্তির তা হলো না, ওকে মনে হচ্ছে বেশ শান্ত। গভীর দুটো চোখ মেলে সে ওয়ার্ডেনকে খতিয়ে দেখছে। তার মোটা গোঁফ জোড়ায় চেহারাটা তেমনি রহস্যময়। তার দৃঢ় উঁচু হাড়ওয়ালা মুখখানায় অন্যান্য দিনের থেকে নতুন কিছু দেখতে পেলেন না ওয়ার্ডেন।

'আজ সাক্কোর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' ভাঞ্জেত্তি জিজ্ঞেস করলো ওয়ার্ডেনকে।

'এখনও হয়নি। পরে দেখা করবো।'

'ওকে নিয়ে একটু ভাবনা হচ্ছে আমার। অনশন ধর্মঘটের পর থেকে ও একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও অসুস্থ। ওকে নিয়ে আমার বড় ভাবনা হয়।'

'আমারও ভাবনা হয় ওর জন্য,' ওয়ার্ডেন বললেন।

'তা অবশ্য হয়। যা হোক, আপনার বোধহয় ওর সঙ্গে দেখা করে একটু কথাবার্তা বলা উচিত।'

'বেশ, তাই করছি। আর কি বলতে বলো আমাকে?'

অকস্মাৎ ভাঞ্জেত্তি হাসলো। সে ওয়ার্ডেনের দিকে তাকালো, বয়স্করা যেমন শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসে।

'সত্যি আপনি জানতে চান, আমি আপনাকে দিয়ে কী করাতে চাই?'

'আমি কী আর করতে পারি,' ওয়ার্ডেন বললেন, 'সব কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ক্ষমতায় যা আছে তা করতে পারলে আমি খুশি হবো, বার্তোলোমিউ। আজ তোমাদের খানিকটা ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকার আছে। যা খেতে চাইবে তা পাবে। আর যখন খুশি পাদ্রীকে পেতে পারবে তোমরা।'

'সাক্কোর কাছে খানিকক্ষণ থাকতে চাই আমি। তার ব্যবস্থা করতে পারবেন? ওকে আমার অনেক কথা বলার ছিলো, কিন্তু কোন দিনই তা বলা হয়নি। যদি ওর সঙ্গে ঘণ্টাকয়েক কাটাতে দেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।'

'মনে হয়, হয়তো সে ব্যবস্থা করা যাবে। আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু যদি না পারি, তুমি হতাশ হয়ো না।'

'আপনি ভাববেন না যেন ওর চেয়ে আমার মনের জোর কিংবা সাহস বেশি। হয়তো আমাকে দেখে সে রকম মনে হতে পারে। কিন্তু বাইরের চেহারাটা কিছুই নয়। আসলে ওর মনের জোর আমার মতোই, বরঞ্চ ওর সাহস আমার চেয়ে ঢের বেশি।'

'তোমরা দুজনেই খুব ভালো আর খুব সাহসী,' ওয়ার্ডেন বললেন, 'যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য আমি ভয়ানক দুঃখিত।'

'আপনি তো কিছুই করতে পারতেন না। আপনার তো দোষ নেই।'

'তবু আমার দুঃখ হচ্ছে,' ওয়ার্ডেন বললেন, 'ব্যাপার যদি এমনটি না হতো।'

আর কথা বলবার ইচ্ছে ছিলো না ওয়ার্ডেনের। আর কিছু বলার কথা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। তিনি বুঝছিলেন, এই ধরনের কথাবার্তায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়ছেন। ভাঞ্জেত্তির কাছে বিদায় নিলেন তিনি। বললেন, আজকের দিনটিতে তার অনেক কাজ, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি। ভাঞ্জেত্তি যেন বুঝতে পারলো ওঁর অবস্থাটা।

ওয়ার্ডেন গিয়ে প্রাতরাশে বসলেন। সাধারণত তিনি বেশ খেতে পারেন। কিন্তু আজ যেন ক্ষুধা নেই একটুও। তাঁর বার বার একটা দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছিলো, অতীতে যেমন হয়েছে অনেকবার, তেমনি আজও ওদের

দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকবে। সাকো বা ভাঞ্জেত্তিকে মরতে হবে না আজ। তিনি বুঝতে পারলেন, যদিও তা হয়ও তবু চোর সিলেস্তিনো মাদীরোর দণ্ডাজ্ঞা আজ পালন করা হবে। সেটা বিশ্রী এবং বেদনাদায়ক হলেও ততটা আঘাত করবে না স্নায়ুতন্ত্রে, যতটা করতো সাকো-ভাঞ্জেত্তির মৃত্যু হলে।

এই ভেবে তাঁর অনেকটা ভালো লাগলো। যতই তিনি এই সম্ভাবনার কথা ভাবলেন, ততই তাঁর মনে হলো তাই ঘটবে। তাঁর গোটা চেহারাই বদলে গেলো। মনটা অনেক হালকা হয়ে গেলো, আর স্ত্রীর কাছে তিনি বললেন, তাঁর মনে হচ্ছে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকবে আজ। বলতে বলতে আজ সকালে এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি ফুটলো।

বছরের পর বছর তিনি মনের উত্তেজনাকে অবদমিত করে রেখেছেন। তাঁর জীবনে আনন্দ নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষার সামান্যতম পরিপূর্তি নেই। তাই তাঁর কণ্ঠের উদ্বেগে, তাঁর ঘোষণার দৃঢ়তায় অবাক হলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি একটি সোজা প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আজ স্থগিত থাকবে কেন?'

ও প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে এলো। কিন্তু একটু থেমে একবার তিনি ভাবলেন সমস্ত সম্ভাবনাটা। তাঁর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, 'দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকবে কারণ এ মামলা সম্পর্কে যারা একটু খবরও রাখে, তারা জানে মানুষ দুটি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

কিন্তু এ কথা বলতে তিনি ইতস্তত করলেন, এমন কি স্ত্রীর কাছেও। এমন একটা মন্তব্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছে নেই তাঁর। অনেকবার এ কথা বলেছেন তিনি যে অপরাধ কিংবা নিরপরাধিতা স্থির করা নিয়ে তাঁর কিছু করার নেই, সে কাজ ওয়ার্ডেনের নয়। তাই মামলাটার নানান দিক মনে মনে ভেবে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'ওদের দুজনের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের অনেক অবকাশ আছে।'

'কিন্তু মানুষ কি করে বেঁচে থাকে এর পরেও?' তাঁর স্ত্রী বললেন আশ্চর্য হয়ে, 'সাত বছর ধরে একবার মৃত্যুদণ্ড আবার স্থগিত রাখা, আবার দণ্ডের সম্ভাবনা আবার স্থগিত রাখা, এইতো চলছে। এর চেয়ে যে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। এমন করে আমি বাঁচতে পারতাম না।'

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,' ওয়ার্ডেন বললেন।

তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন, 'আমি বুঝতে পারি না ও কথা। আর দেখছি, সবাই এই মানুষ দুটির প্রশংসা করে।'

'সত্যি ওরা চমৎকার লোক। এমন দুটি মানুষ পেতে হলে অনেক খুঁজতে হবে তোমাকে। বলে বোঝাতে পারবো না তোমায়, ওরা কেমন চমৎকার, কেমন ভদ্র, শান্ত, নম্র। ওরা কেউ একদিন একটা কঠোর কথা বলেনি। আমার উপরে রাগ নেই ওদের। ভাঞ্জেত্তিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে, সে বোঝে আমি নির্দোষ। সাক্কোও বোঝে। ভাঞ্জেত্তি বলে, 'রাগ যদি সঠিক জায়গায় না করা যায়, তবে রাগের অপচয় হয়।'

'সেই জন্যেই তো আরো বিস্ময়কর লাগছে,' তাঁর স্ত্রী বললেন।

'এর বিস্ময়টা কোথায়? এইটেই তো স্বাভাবিক। ওরা বড় চমৎকার।'

'অ্যানার্কিস্টরা—' তাঁর স্ত্রী বলতে যাচ্ছিলেন।

ওয়ার্ডেন থামিয়ে দিলেন তাঁকে, বললেন, 'অ্যানার্কিস্টদের সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো কিছু জানি না আমরা। ওরা অ্যানার্কিস্ট হোক কি না হোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এ ব্যাপারের। অ্যানার্কিস্ট বলো, কম্যুনিস্ট বলো, আর স্যোসালিস্ট বলো, ওদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই আমার। হতে পারে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি এর সব কটাই। হতে পারে তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শয়তানীতে বোঝাই। আমি শুধু বলতে চাই যে ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় এ কথা মনেই হয় না। ওদের সঙ্গে কথা বলে যখন বেরিয়ে আসবে তুমি, এ কথা তখন তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে যে কোন অবস্থায়ই খুন করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত যে রকম খুনের দায়ে ওরা অভিযুক্ত, তেমন খুন তো নয়ই। এমন খুন করতে পারে তারাই, যারা ঠাণ্ডা মাথায় মানুষকে গুলি করে মারে। এরা দুজন একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। কেমন করে তোমাকে বোঝাই, জীবনের প্রতি এদের কী অসীম দরদ। এ রকম খুন ওরা করতেই পারে না। কিন্তু শোনো, এ কথা কিন্তু তোমাকেই শুধু বললাম। কেউ যেন জানতে না পারে।...আমি যদি খুনী চিনতে না পারি, কে পারবে?'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'নানা রকমের খুনী আছে।'

'হ্যাঁ, সেই হচ্ছে কথা। তোমার দোষ নেই। সবাই তাই বলবে। নইলে এমন সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের কেন মৃত্যুদণ্ড হবে?'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'আজ সকালেই ভাঞ্জেত্তিকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি। তাকে দেখলাম শান্ত, স্থির, ভদ্র। যেন অন্যদিনগুলোর মতোই একটা দিন আজ।'

ঠিক এই সময়ে একজন জেলরক্ষী এসে বললো, মাদীরো হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো চিৎকার করছে। ওয়ার্ডেন যদি অনুমতি দেন তবে বন্দীশালার ডাক্তার তাকে খানিকটা ঘুমের ওষুষ দিতে পারেন। স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়ার্ডেন তাড়াতাড়ি রক্ষীর সঙ্গে চললেন। ওঁরা জেল হাসপাতাল থেকে ডাক্তারকে নিয়ে মাদীরোর কুঠুরিতে এলেন। দূর থেকেই ওঁরা চিৎকার শুনতে পেলেন। যতই কাছে এলেন, চিৎকার তত তীব্র হতে লাগলো।

মাদীরো ছিলো মৃত্যুকুঠুরিতে, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির খুবই কাছাকাছি। ওর কুঠুরিতে যেতে এদের দুজনের কুঠুরি পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখন ওদের ছোট্ট জানলায় একবার উঁকি মেরেও দেখলেন না ওয়ার্ডেন।

মাদীরো শুয়ে ছিলো তার কুঠুরিতে। তার দেহটা দুমড়ে মুচড়ে উঠছিলো বার বার। তার ফিটের অসুখ ছিলো। বন্দী হওয়ার পর আরো এ রকম অজ্ঞান হয়েছে সে। ওয়ার্ডেন ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ওর তখন শ্রবণশক্তি নেই। ও শুধু চিৎকার করছে আর দু হাত দিয়ে পাথরের মেঝেয় আঘাত করছে। মুখ দিয়ে লালা আর রক্ত বেরিয়ে আসছে। ওকে দেখে, ওর চিৎকার শুনে ওয়ার্ডেনও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

'সব এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে,' ওয়ার্ডেন ওকে বলতে চাইলেন, 'এই দেখো, এখন আর তুমি একা নও। আমরা সবাই রয়েছি এখানে। একটু স্থির হও দেখি।'

ডাক্তার বললেন, 'কথা বলে লাভ নেই। ওকে একটু ঘুমের ওষুধ দেওয়া দরকার। আপনার আপত্তি আছে?'

'বেশ, তাই দিন। দেরি করবেন না।' ওয়ার্ডেন বললেন।

রক্ষী আর তিনি মাদীরোকে চেপে ধরলেন, আর ডাক্তার খানিকটা

মরফিয়া ইঞ্জেকসন করে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে মাদীরোর দেহ শিথিল হয়ে এলো, মাংসপেশীগুলো স্বচ্ছন্দ হলো, আর তার চিৎকার পরিণত হলো ফোঁপানো কান্নায়।

ওয়ার্ডেন কুঠুরির বাইরে এলেন। তাঁর পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো। ওদের দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকবে বলে যে বিশ্বাস হয়েছিলো তাঁর, তা যেন কোথায় তলিয়ে গেছে। আর তার পরিবর্তে ওয়ার্ডেনের মনে হতে লাগলো আজই ওদের শাস্তি হয়ে যাবে। একটা ভয়ানক দিনের শুরু হলো কেবল মাত্র আটটা বাজে। তিনি ভেবে পেলেন না এমন একটা দিনের বাকি সময়টা কেমন করে কাটাবেন।

তিন

ভাবলে অবাক হতে হয় কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠলো, জানতে চাইলো ওরা কে, কেমন লোক। এও অবাক হওয়ার মতো যে অতি অল্প লোকই ওদের মৃত্যুর আগে ওদের সম্পর্কে সামান্য কিছুও জানতে পেরেছিলো।

উনিশশো সাতাশ একটা অদ্ভুত বছর, ঘটনা-বোঝাই বছর। সংবাদ-পত্রের শিরোনামা একটার পর একটা উত্তেজনাময় খবর পরিবেশন করেছে। যেন সব সময়ের সেরা সময় ছিলো বছরটা। সেবারে প্রথম চার্লস্ লিণ্ডবার্গ একা একা উড়ো জাহাজে আতলান্তিক পাড়ি দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাল্টিমোরের 'সান্' কাগজে শিরোনামা পড়লো,'মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে লিণ্ডবার্গের দান।' সভ্যতার অগ্রগমনে পীচেজ্ ব্রাউনিং আর তাঁর বুড়ো স্বামী ড্যাডি ব্রাউনিংএর অবদানও নেহাৎ কম নয়। তারপরে চেম্বারলেন আর লেভিন্ সাগর পাড়ি দিলেন, আর জ্যাক্ ডেম্পসি শার্কেকে হারিয়ে দিয়ে নিজে হেরে গেলেন জেনুটানির কাছে।

যা হোক, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি হয় কম্যুনিস্ট, নয় স্যোসালিস্ট, কিংবা অ্যানার্কিস্ট, আর নয়তো অন্য কোন রকমের অরাজকতা সৃষ্টি করার মতো লোক। সারা দেশময় এমন অসংখ্য সংবাদপত্র ছিলো, যারা ওদের মৃত্যুর

আগে ওদের মামলা সম্পর্কে একটি কথাও ছাপেনি। এমন কি বোস্টন, নিউ ইয়র্ক এবং ফিলাডেল্‌ফিয়ার বড় বড় কাগজেও কচিৎ কদাচিৎ দু-এক লাইন খবর থাকতো। এমনি শুরু হয়েছিলো ওদের মামলার গোড়া থেকেই। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই কাগজগুলো বলতো, 'যাই হোক না কেন, উনিশশো বিশে এ মামলা শুরু হয়েছে, আর এখন উনিশশো সাতাশ। সাত বছর ধরে তো আর—'

মৃত্যুর আসন্নতা এই জুতোর শ্রমিক আর মাছের ফেরিওয়ালাকে মুখর করে তুললো। ওদের নীরবতাই যেন মুখর। বাইশে আগস্ট অতি প্রত্যুষ থেকেই বাতাসে যেন মৃত্যুর অনুভূতি, তার শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ। যে পৃথিবীতে শতে শতে সহস্রে সহস্রে মানুষ সবার অজান্তে মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি তাদের জন্য, সেখানে দুজন সাধারণ বিপ্লবী আর একজন চোরের মৃত্যু এমন আলোড়ন সৃষ্টি করবে, এতটা প্রাধান্য পাবে তা ভাবতেও অবাক লাগে। যতই বিস্ময়কর হোক না কেন, ব্যাপারটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ঘটনাটার প্রতি দৃষ্টি পড়েছিলো মানুষের।

সংবাদপত্রের লোকেরা জানতো কাল তাদের কাগজের প্রধান শিরো-নামা কি হবে, কিন্তু শিরোনামা ছাড়াও আর কিছু যে চাই। একজন রিপোর্টারকে তাই আসতে হলো সাক্কোর পরিবার যেখানে থাকে, সেখানে। এখানে সাক্কোর স্ত্রী তার দুই সন্তানকে নিয়ে থাকে। ওকে বলা হয়েছিলো অনেক লোক ভাঞ্জেত্তির কথা জানতে চায়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি লোক জানতে চায় নিকোলা সাক্কোর কথা। নিকোলা সম্পর্কে ঔৎসুক্য হয় স্বাভাবিক মানবিক দরদ থেকে, এ কথা সবাই বোঝে। এইতো সাক্কো, ছত্রিশ বছরের মানুষটি, অবধারিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে, সে জানে ঠিক কোন্ মুহূর্তে তাকে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। আর সমগ্র দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে নিকোলা সাক্কো তার পিছনে রেখে যাচ্ছে এক মহান সম্পদ, তার সন্তানদের। এই কথা বলা হয়েছিলো রিপোর্টারকে।

স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে সাক্কোর সংসার। স্ত্রীর নাম রোজা। চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাম দান্তে, আর ছোট মেয়ে ইনীসের বয়স এখনো সাত বছর হয়নি। রিপোর্টারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো সাক্কোর স্ত্রীর সঙ্গে

দেখা করতে। ছেলেমেয়ে আর তাদের মায়ের অনুভূতিকে জেনে যেতে হবে তাকে।

এইটুকুন কাজের ভার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়নি রিপোর্টার, এটা এমন কিছু অসাধারণ কাজ নয়। তবু তার কাজ তাকে করতেই হবে। তাই খুব সকাল সকালই সে বেরিয়ে পড়লো, যাতে কাহিনীটা তার আগে কেউ না জানতে পারে, যাতে এই কাহিনী দিয়ে একটা চমক জাগানো যায়। আটটা বাজতেই সে গিয়ে রোজা সাক্কোর বাড়ির কড়া নাড়লো।

রোজা এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো কি চাই তার। রিপোর্টার ওর দিকে তাকালো, আর তার এমন একটা প্রতিক্রিয়া হলো মনে মনে, যা এই অবস্থায় স্বাভাবিক নয়। 'কী আশ্চর্য! এত সুন্দর ও! যত স্ত্রীলোক আমার জীবনে দেখেছি ও কি তাদের সবার চেয়ে সুন্দর নয়?'

তখন কেবল ভোর। রোজার চুল তাড়াতাড়ি করে একটা গেরো দেওয়া, তাতে চিরুনি পড়েনি তখনো। মুখে এতটুকু প্রসাধন নেই। যতটা সুন্দরী রিপোর্টার মনে করছে ওকে, হয়তো সে অত সুন্দরী নয়। রিপোর্টার ওর চেহারা সম্পর্কে অন্যরকম একটা ধারণা করে এসেছিলো। তাই ওর পিঙ্গল চোখের সহজ দৃষ্টি আর ভয়ানক করুণ মুখের শান্ত ভাব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলো রিপোর্টার। কানায় কানায় ভরা একটা পেয়ালার মতো ওর অন্তরটা দুঃখে পরিপূর্ণ, দুঃখ যেন উথলে পড়ছে। আজ এই সকালে রিপোর্টারের কল্পনায় শোক আর সৌন্দর্য যেন সমান হয়ে গেছে। আর এর ফলে এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো ওর মনে যে ওর তীব্র একটা ইচ্ছে হলো ওখান থেকে পালিয়ে যেতে। এ হচ্ছে সেই ভীতি, যা জন্ম নেয় হঠাৎ সত্যের মুখোমুখি এসে পড়লে; কিন্তু সত্যানুসন্ধান ওর কাজ নয়। সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলো।

রোজা বললো, 'আপনি দয়া করে বিরক্ত করবেন না আমাকে, আমার কিছু বলার নেই।'

সে ওকে বোঝাতে চাইলো, সে চলে যেতে পারে না। এটা তার কাজ, আর তার কাজ পৃথিবীতে সবার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

এ কথা বুঝলো না রোজা। সে বললো, তার ছেলেমেয়ে এখনো

ঘুমচ্ছে। কষ্ট হচ্ছিলো ওর কথা বলতে, যেন শোকসমুদ্রে অবগাহন করে বেরিয়ে আসছিলো প্রত্যেকটি কথা। তবু রোজা ওকে অনুরোধ করলো, তার ছেলেমেয়ে যেন জেগে না ওঠে।

'আমি ওদের জাগাতে চাই না। সে রকম ইচ্ছে আমার একটুও নেই। কয়েক মিনিটের জন্য আমি ভিতরে আসতে পারি কি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রোজা। তারপর সরে গিয়ে ওকে ভিতরে আসতে দিলো।

ঘরে ঢুকে প্রথমে ওর দৃষ্টি পড়লো ছেলেমেয়ে দুটির উপরে। অনেক পরে তার মনে হয়েছিলো, সে ওদেরই শুধু দেখেছে। ওর বয়স খুবই কম। এক ইতালীয় জুতোর শ্রমিকের সন্তানদের জন্য ওর দরদ থাকার কথা নয়। ও একজন ইয়াংকি, পুরোপুরি ইয়াংকি বাপের ছেলে। শুধু ওর নয়, ওর ঠাকুর্দারও জন্ম হয়েছে বোস্টনে, তার বাপ জন্মেছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌সের প্লাইমাউথে, আর তারও বাপের জন্ম ম্যাসাচুসেট্‌সেরই সালেম শহরে।

যাই হোক, সে দেখলো কেমন করে ছোট্ট একটি মেয়ে ঘুমুচ্ছে। এ যেন অনন্য, গোটা পৃথিবীতে এর জুড়ি নেই। সাত বছরেরও কম বয়েসী ছোট্ট একটি ঘুমন্ত মেয়ে ঠিক যেন স্বপ্নে-দেখা দেবদূতের মতো। এই ছোট্ট মেয়েটির মাথার চুল বিছিয়ে রয়েছে, হাত দুখানি দু পাশে ছড়ানো আর সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা নিষ্পাপ শান্তির ছাপ। যেন কোন দুঃস্বপ্নও ওর এই ভোরবেলার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। হয়তো অতীতে এত দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে, যে দুঃস্বপ্ন সব ফুরিয়ে গেছে। একটা বৈদ্যুতিক চেয়ারও স্বপ্নে দেখেছে সে, দেখেছে তার শিশুর কল্পনায়।

সে স্বপ্ন দেখেছে, যেন একটা চেয়ারের উপরে কাঠামো করে অনেকগুলো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়েছে। তার আলোয় ঝকমক করছে চেয়ারটা, ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ছে তা থেকে। আর তার বাপ নিকোলা সাকো বসে আছে সেই চেয়ারে। অর্থহীন অথচ ভয়ানক এই দুটি কথায় তৈরি বস্তুটি তার চেতনায় আসতো অস্পষ্ট রূপে, এর নাম সে শুনেছে চুরি করে, কখনো শুনে ফেলেছে হঠাৎ, আর শুনেছে ওর সমবয়সীদের কাছে, যারা কথাটা বলতো খেলার ছলে। এ সব থেকেই তার শিশুমন একটা আবছা

ধারণা করে নিয়েছিলো বস্তুটি সম্পর্কে।

'অনশন ধর্মঘট' কথাটা ভাবতেও তার এমনি কষ্ট হয়েছিলো। তার স্বপ্নে সে এই ভয়ানক ব্যাপারটাকে দেখেছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। সে স্বপ্ন দেখতো যেন জাগ্রত অবস্থায় যতটা ক্ষুধা পেতো তার, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্ষুধার্ত হয়েছে সে। একদিন এমনি এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে সে কেঁদে উঠলো। সে রাত্রে ওর মা ওর কাছে ছিলো না। ওর দাদা দান্তে কোলে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ওকে শান্ত করেছিলো। বলেছিলো, ব্যাপারটা সম্পর্কে ও যেমন স্বপ্ন দেখেছে আসলে তা সে রকম নয়। বলেছিলো, 'এই দেখো, বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি আমি। এতে এ সম্পর্কে সব কথা লেখা আছে।'

সে বললো, কাল সে ওকে চিঠিটা পড়ে শোনাবে। তাই সে করলো। ইনীস্ হাঁটু ভেঙে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসলো, আর দান্তে তার বাবার লেখা চিঠিটা পড়ে শোনালো ওকে। সে পড়লো :

স্নেহের দান্তে,

শেষ যেদিন তোমাদের দেখি সেদিন থেকেই ভাবছি তোমাকে একখানা চিঠি লিখবো। কিন্তু এতদিনের অনশন ধর্মঘটের ফলে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ভয়ও অবিশ্যি ছিলো, হয়তো নিজেকে তোমার কাছে সহজ করে ব্যক্ত করতে পারবো না।

সেদিন অনশন ধর্মঘট ভাঙার পরেই তোমার কথা মনে পড়েছে আমার, আর ভেবেছি তোমাকে চিঠি লিখবার কথা। কিন্তু দেখলাম, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি, একনাগাড়ে শেষ করতে পারবো না চিঠিখানা। যা হোক, আরেকবার ওরা আমাকে মৃত্যুকুঠুরিতে নিয়ে যাওয়ার আগে কথাগুলো তোমাকে বলে যাওয়া দরকার। কারণ আমি জানি, আদালতে আমাদের পুনর্বিচার না-মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে। আর যদি এই শুক্রবার থেকে সোমবারের মধ্যে কিছু না ঘটে,তবে বাইশে আগস্ট মাঝরাতের পরেই ওরা আমাদের হত্যা করবে। সুতরাং আজ আমার সমস্ত ভালবাসা

আর খোলা মন নিয়ে এসে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হলাম, ঠিক যেমনটি আমি ছিলাম অতীতে।

সেদিন অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেছি, কারণ আমার দেহে তখন আর জীবনের কোন লক্ষণ ছিলো না, কারণ অনশন ধর্মঘট করে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম মৃত্যুর বিরুদ্ধে, আজও সেই প্রতিবাদ জানাচ্ছি জীবনের সপক্ষে।

দেখো, কান্নাকাটি না করে নিজে শক্ত হও, যাতে তোমার মাকে তুমি সান্ত্বনা দিতে পারো। ওর মনের তীব্র হতাশা থেকে ওকে নিশ্চয়ই বাঁচাতে চাও তুমি। আমি হলে কি করতাম জানো? বেড়াতে বেড়াতে ওকে নিয়ে যেতাম গ্রামের শান্ত পরিবেশের মধ্যে, বনফুল তুলে বেড়াতাম, বিশ্রাম করতাম গাছের ছায়ায়। একদিকে স্বচ্ছ ঝরনার কলতান, অন্যদিকে প্রকৃতির শান্ত মাধুর্য। আমি বলতে পারি এতে তোমার মা আনন্দ পাবেন, আর তোমারও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কিন্তু দান্তে, একটা কথা সব সময় মনে রেখো। দুর্বল যারা সাহায্য চায় তাদের সাহায্য করবে, যারা অত্যাচারিত, যারা লাঞ্ছিত তাদের সাহায্য করবে। কারণ ওরা তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওরা তোমার সংগ্রামের সাথী। সংগ্রামের পথে আত্মদান করছে ওরা, যেমন তোমার বাপ আর বার্তালো আত্মবলি দিচ্ছে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার জন্য। এই জীবনসংগ্রামে তুমি ভালবাসতে পারবে মানুষকে, মানুষও ভালবাসবে তোমায়।

মৃত্যুকুঠুরিতে বসে তোমাদের কথা বারবার আমার মনে পড়েছে,—খেলার মাঠে শিশুদের মিষ্টি গান, তাদের কোমল আদুরে কণ্ঠস্বর—তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে জীবন, ছড়িয়ে আছে মুক্তির আনন্দ। আর এরই পাশটিতে আমরা তিনটি মৃত্যুপথযাত্রী রয়েছি মৃত্যুর যন্ত্রণা বুকে বয়ে। এই সব ভাবতে ভাবতে প্রায়ই তোমার কথা আর ছোট্ট ইনীসের কথা মনে পড়তো আমার, আর বড় ইচ্ছে করতো তোমাদের দেখতে। কিন্তু তোমরা যে দেখা করতে আসোনি, একদিক থেকে তাতে আমি নিশ্চিন্তও হয়েছি। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান তিনটি

মানুষের অন্তর্বেদনার ভয়াবহ দৃশ্য তোমাদের দেখতে হলো না। এর ফল কী হতো তোমাদের কচি মনের উপরে, তা আমি ভাবতেও পারছি না। অবিশ্যি যদি এ দৃশ্য সহ্য করার মতো মনের জোর থাকতো তোমার, তবে এই দৃশ্য দেখলে তোমার লাভ হতো নিশ্চয়ই। আজ বাদে কাল এই ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে তুমি তুলে ধরতে পারতে দুনিয়ার মানুষের সামনে বলতে পারতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, এই অন্যায় মৃত্যু দেশের পক্ষে কত বড় লজ্জার কথা। হ্যাঁ, ওরা আমাদের ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে বটে, আজ ওরা তাই করছে। কিন্তু আমাদের মতবাদকে ধ্বংস করতে পারবে না কেউ, ভবিষ্যতের যুবসমাজের অন্তরের গভীরে বেঁচে থাকবে আমাদের মতবাদ।

আবার তোমায় বলছি, দান্তে, এই গভীর দুঃখের দিনে তুমি তোমার মা আর ইনীসের কাছে থেকো, ওদের আরো বেশি করে ভালবেসো। আমি বিশ্বাস করি, তোমার সাহস, তোমার মহত্ত্ব ওদের দুঃখকে অনেকখানি দূর করতে পারবে। আর আমায়ও নিশ্চয়ই একটু ভালবাসবে তুমি।

তোমরা সবাই আমার অভিনন্দন জেনো, তোমার মা আর ইনীসকে জানিও আমার ভালবাসা। আমার আন্তরিক আলিঙ্গন গ্রহণ করো। ইতি—

তোমার বাবা

পুনশ্চ: বার্তালো তোমাদের স্নেহাশিস্ জানাচ্ছে। আমি আশা করি, তোমার মা এই চিঠিটা বুঝিয়ে দেবেন। যদি ভালো থাকতাম তবে হয়তো আরো ভালো করে, আরো সহজ করে লিখতে পারতাম চিঠিখানা। কিন্তু আমার শরীর বড় দুর্বল।

যদিও ছোট্ট মেয়েটি চিঠিটার সব কথা বুঝলো না, আর ওর দাদা সাবধান হয়ে কিছু কিছু বাদ দিয়ে চিঠিটা পড়েছিলো, তবুও যা সে বুঝলো তাতেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে। এর মধ্যেই নিজের মতো করে সে তার বাপকে একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করতে লাগলো।

তার মধ্যে ভাবনার আলোড়ন তখনো সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি, এমন সময়ে বাপের কাছ থেকে নিজের নামে একটা চিঠি পেলো ইনীস্। শিরোনামায় তিনি লিখেছেন, 'আমার আদরের ইনীস্'। তার পরে যেন কথার পর কথা সাজিয়ে তিনি ওর সঙ্গে আলাপ করছেন।

আমার কী ইচ্ছে হয় জানো? ইচ্ছে হয় যেন তুমি আমার সব কথা বুঝতে পারো, যেন খুব সহজ করে আমি চিঠিটা লিখতে পারি তোমায়, যাতে আমার বুকের প্রত্যেকটি স্পন্দন তুমি শুনতে পাও। আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি আমার সব চাইতে আদরের ছোট্ট মেয়েটি!

তোমার মতো ছোট্ট মেয়েকে সব কথা বোঝানো সত্যি খুব কঠিন। কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমায় আমি বোঝাতে চেষ্টা করবো, তোমার বাপের কাছে তুমি কত আদরের। যদি আমি তা না পারি, তবে নিশ্চয়ই তুমি এই চিঠিখানা তুলে রাখবে। বড় হয়ে এটা পড়বে। তখন তোমার বাপ যে ভালবাসা নিয়ে এই চিঠি আজ লিখছে তার স্পন্দন অনুভব করতে পারবে তোমার অন্তরে।

আমি যে তোমার মতো মেয়ে, তোমার দাদা দান্তে আর তোমার মাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট তকতকে বাড়িতে একসঙ্গে ছিলাম, পেয়েছিলাম তোমাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা, তা আমার সংগ্রামী জীবনের এক অতুলনীয় সম্পদ, অসীম সৌভাগ্য। গরমের দিনে তোমায় নিয়ে বসতাম ওক গাছের ছায়ায় আমাদের ছোট ঘরটিতে, একটা-আধটা কথা শেখাতাম জীবন সম্পর্কে, শেখাতাম লিখতে পড়তে, দেখতাম তুমি হেসে কেঁদে ছুটে বেড়াচ্ছো, গান গেয়ে গেয়ে ফুল তুলছো সবুজ মাঠে, ঘুরে বেড়াচ্ছো এ গাছ থেকে ও গাছের কাছে, তারপর স্বচ্ছ ঝরনাটার কাছ থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছো তোমার মায়ের কোলে।

আমি জানি, তুমি একটি চমৎকার মেয়ে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার মাকে, দান্তেকে আর অন্য সবাইকেও ভালবাসো। ভালবাসো আমাকেও নিশ্চয়ই, কারণ আমি তোমায় ভয়ানক ভালবাসি। ইনীস্,

তুমি জানো না, দিনের মধ্যে কতবার আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি রয়েছো আমার অন্তরে, আমার চোখের তারায়, দুঃখের দেয়ালে ঘেরা এই কুঠুরিটার প্রত্যেকটি কোণে, রয়েছো আকাশে, আর আমার দৃষ্টি যেখানে ফেলি সেখানেই।

তোমার সমস্ত বন্ধু আর সাথীদের আমার অভিনন্দন জানিও, আমার ভালবাসা জানিও তোমার দাদা আর মাকে।

তুমি আমার স্নেহের চুমু আর আদর নাও। সব সময় তোমার কথা ভাবছি আমি। বার্তোলোও তার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে তোমাদের সবাইকে। ইতি—

তোমার বাবা

যখন ওর বাবা এমনি আলাপ করছিলো ওর সঙ্গে চিঠির মধ্য দিয়ে, তখন চোখ বুজে ছিলো ইনীস্। বাবার মুখ, তার ঠোঁটের নড়াচড়া আর চোখের পাতা পড়াকে মনে করতে চেষ্টা করছিলো সে, যেমন সে বন্দীশালায় দেখেছিলো তাকে।

এ অবিশ্যি অতীতের কথা। বড়দের হিসাবে এই তো মাত্র কদিন হলো, কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটির যেমন করে সময় কাটছিলো, যেমন করে সে সময়ের হিসাব করে, তাতে সে যেন অনেক দিন হয়ে গেছে। আজ এই সকালবেলা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে সে, ঘুমুচ্ছে তার স্বপ্ন আর তার সমস্ত স্মৃতিকে নিয়ে।

'আপনি আসুন গিয়ে,' রোজা বললো রিপোর্টারকে।

যুবকটি ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখলো আরেকবার, তার পর বেরিয়ে এলো। সেখানে আর সে থাকতে পারছিলো না। বেরিয়ে এসে পথ চলতে চলতে সে যা দেখেছে, তার টুকরোগুলোকেও জুড়ে জুড়ে একটা কাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলো সে। হঠাৎ এমন সব জিনিস তার চেতনায় এসে আঘাত করেছে যা তার বোধশক্তির বাইরে। তাই ভয়ানক অস্বস্তি লাগছিলো রিপোর্টারের।

এর আগে সে কখনো ভাবেনি, কোন্ বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েছে এই গরীব মাছের ফেরিওয়ালা আর পরিশ্রমী জুতোর মজুরটি। হতে পারে ওরা

অ্যানার্কিস্ট কিংবা কম্যুনিস্ট কিংবা অন্য কিছু। পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্ত থেকে ওরা এখানে এসে পড়েছে। একটা স্রোতে যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছে ওরা, তার পরিণতি হচ্ছে আকস্মিক মৃত্যু, জেল কিংবা অনশন কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ার। এমন পরিণতি এমন লোকেরই সাজে। তার নিজের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, তার চেতনায়ও নেই এমন সব ব্যাপার।

কিন্তু হঠাৎ যেন এখন এই সব কিছুই তার চেতনার, তার জগতের অংশ হয়ে উঠলো। একদিন একটি মেয়ের কাছে সে ছেলেমানুষের মতো গর্ব করেছিলো সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে। নিশ্চয়ই এই ধরনের অভিজ্ঞতাব কথা বলেছিলো সে। কিন্তু আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা সে কি তেমনি গর্বের সঙ্গে, তেমনি ছেলেমানুষের মতো বলতে পারবে কাউকে? যদি পারে, তবে যে কাহিনী তার দরকার সেটিকেও নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে পারবে সে।

কিন্তু কেমন হবে কাহিনীটি? খানিকটা অস্বচ্ছভাবে, খানিকটা দুঃখের সঙ্গে সে যেন অনুভব করতে পারলো, যে কাহিনী ছড়িয়ে আছে ওই ঘুমন্ত শিশু দুটির শান্ত সুন্দর মুখে, তা তার জীবনে বলা বা দেখা সব কাহিনী থেকে আলাদা। সে পড়েছে, দান্তে একজন ইতালীয় কবি, যদিও তাঁর কবিতা সে পড়েনি। কিন্তু সে ভেবে অবাক হলো, কেমন করে এই ইতালীয় জুতোর শ্রমিক তার মেয়ের নাম রাখলো ইনীস্। আরো অবাক হলো সে এই ভেবে, যে এই মেয়েটি তার সাত বছরের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে একটু একটু করে যখন বড হয়ে উঠেছে, তখন তার বাপ নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি দিন যাপন করেছে বন্দীশালার দেয়ালের আড়ালে। এই উপলব্ধি এই সাংবাদিকের কাছে এলো একটা গভীর তীব্র আঘাতের মতো। আর আজ সারাটা সকালের সব ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করে তুললো।

সে ছিলো আলাদা জগতের মানুষ। কিন্তু আর আগেকার মতো হতে পারবে না সে। একটা ভয়ানক পরিবর্তন ক্রমে দানা বেঁধে উঠছে তার মধ্যে। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে সে যেন জীবনকে দেখতে পেলো অন্তরঙ্গভাবে। আর তার যৌবন যেন শেষ হয়ে গেলো এইখানেই।

চার

বাইশে আগস্টের সকালবেলা। তখন নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। কমনওয়েলথের একজন বিখ্যাত আইনজীবী এবং আইনের অধ্যাপক আইন বিদ্যালয়ের সামনের উঠোনটা পার হচ্ছিলেন। গ্রীষ্মকালীন সেসনের বক্তৃতামালার ষষ্ঠ এবং শেষ বক্তৃতা আজ দেবেন তিনি। জীবনে তিনি এবারেই প্রথম গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করলেন। অস্বস্তিকর গ্রীষ্মের সপ্তাহগুলো ভরে তাঁর একবার ইচ্ছে হয়েছে পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রতীরে ছুটির দিন কটা কাটিয়ে আসতে, আবার তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন এই ভেবে যে যাই হোক এখানে এই বোস্টনে থেকে তিনি সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলার শেষ নিষ্পত্তি লক্ষ্য করতে পারলেন।

এই মামলাটার গুরুত্ব তাঁর নিজের কাছে যে কতখানি তা তিনি সব সময়ে মনে মনেও স্বীকার পেতেন না। কারণ এর গুরুত্বকে এমন কি মনে মনে স্বীকার করারও বিপদ অনেক। যে কোন কারণেই হোক না কেন, যখনই তিনি স্বীকার করতেন এই সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা তাঁর বর্তমান দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রবস্তু, তখনই কতকগুলো শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ আর শাসন মানতে চাইতো না। বোধ হয় এই জন্যই তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যাহত বোধ করতেন। তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই, যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, তিনি দৃঢ়ভাবে অসংযত ক্রোধের বিরোধিতা করে এসেছেন।

তবু আজকের শান্ত অথচ গভীরভাবে শোকাবহ এই সকালবেলায় তাঁর মনে ক্রোধ জন্মেছিলো, কিন্তু তা ছিলো অদৃশ্য, ভিতরে গুটানো একটা ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মতো। মাত্র কাল সন্ধ্যায় তিনি শুনেছেন এই মামলায় তদন্তকারী উপদেষ্টা কমিটির যিনি প্রধান, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তাঁকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে এই মামলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ওই দুটো সাম্যবাদীর পক্ষ সমর্থনের মধ্য থেকে যা দৃষ্টিগোচর হয়, তার চেয়ে কিছু বেশি ঔৎসুক্য যেন আছে এই ইহুদি অধ্যাপকের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি যে ইহুদিদের দেখতে পারেন না, তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। যেদিন থেকে অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, সেদিন থেকেই তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন ইহুদিদের প্রতি তাঁর অসাধারণ বিদ্বেষ। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির প্রতিও তাঁর সমান বিদ্বেষ। তাঁর ইহুদিবিদ্বেষ বার বার তীব্র ভাষায় তিনি প্রকাশ করতেন এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করা যত সহজ, অন্য জাতকে সরানো তত সহজ নয়।

উঠোন পেরিয়ে আসতে আসতে প্রত্যেকটি কথা অধ্যাপকের স্মরণে আসছিলো, যেমন নিজের চেহারার কথাও তাঁর মনে হচ্ছিলো বার বার।

এই স্মৃতি তাঁর সংবেদনশীল মনে আঘাত করছিলো বার বার, যেন ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সঙ্গে এই অধ্যাপকের এতটুকু মিল নেই। তিনি ইয়াংকি নন, এমন কি এ দেশে তাঁর জন্মও হয়নি। চোখের তারা নীল নয়, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ নেই এতটুকুও। তিনি কথা বলেন এক বিদেশী উচ্চারণ ভঙ্গীতে। তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী ছোট ছুটো চোখ মোটা চশমায় ঢাকা। তাঁর মাথাটা যেন ঝুলে রয়েছে কাঁধের উপরে। নিজের এই চেহারাকে তিনি যদি কোন রকমে ভুলেও যেতে পারতেন, তবু উনিশশো সাতাশ সালের বোস্টনের সমাজ তাঁকে ভুলতে দিতো না।

উঠোনটা পার হতে হতে তিনি ভাবলেন, 'ইহুদির মতোই আজ এগিয়ে যাবো আমি। বোকার মতো হলেও একটা সাহসের কাজ করবো আজ। বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতাটি হবে সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা নিয়ে।'

কাল সন্ধ্যায় স্থির করা এই সিদ্ধান্ত তাঁকে খানিকটা আরাম দিলো, আবার তাঁর ক্রোধে ইন্ধনও জোগালো বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই জানে, সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলার উপরে যে চমৎকার যুক্তিপূর্ণ ভয়ঙ্কর প্রবন্ধটি লিখে তিনি প্রকাশ করিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সেটাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সভাপতি অধ্যাপকের এই কাজটিকে শুধু অবিজ্ঞজনোচিত বলেই মনে করেন না, তিনি মনে করেন, এর ফলে অধ্যাপক সোজাসুজি সভাপতির বিরোধিতা করছেন। সভাপতি নিজেও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন অবস্থাটাকে। তাঁর মতে অস্ত্রহীন তুজন অসহায় উত্তেজনা-

সৃষ্টিকারী মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, অথচ সারা দুনিয়ার অর্ধ মানুষ ওদের সপক্ষে জেগে উঠেছে। এই রহস্যময় শক্তি দেখে ভয় পেয়েছেন তিনি। তিনি ভাবতেও পারছেন না, যার প্রতি এত বিরক্তি তাঁর, সেই আইনের অধ্যাপক ওদের দুজনের মধ্যে এই শক্তির লেশমাত্রও দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু দেখছেন, ওরা দুজন অসহায় মানুষ মৃত্যুর দিন গুনছে।

আইন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে করতেই অধ্যাপক দেখলেন তিনজন সাংবাদিক অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা জিজ্ঞেস করলো উইলিয়ামস্ বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা নিয়ে তিনি দেবেন বলে যে গুজব রটেছে তা সত্যি কি না।

'হ্যাঁ, সত্যি,' বলে তিনি ওদের থামিয়ে দিলেন। তাঁর কথায় হৃদ্যতা প্রকাশ পেলো না।

'বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির তদন্ত অথবা আপনার এই বক্তৃতা সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেবেন আপনি?' বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিকে প্রধান করে সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলায় শেষ তদন্ত করার জন্য গবর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির কথাই বললো ওরা।

'বিবৃতি দেওয়ার কিছু নেই আমার,' অধ্যাপক বললেন, 'তবে আপনারা যদি আমার বক্তৃতা শুনতে চান, ক্লাসঘরে আসতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বিবৃতি দেওয়ার মতো কিছু নেই আমার।'

আমন্ত্রণটি আন্তরিক। ওরা তাঁর সঙ্গে ক্লাসঘরে এলো। এরই মধ্যে প্রায় তিনশো ছাত্র এসে গেছে, প্রায় সব ছাত্রই উপস্থিত আজ। গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতা হিসাবে তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিতি খুব বেশি থাকে। যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের জন্য অনেকে তাঁকে অপছন্দ করে, ভয় করে, তারই জন্য আবার অনেকে শ্রদ্ধাও করে তাঁকে।

বক্তৃতামঞ্চের উপরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনি ভাবলেন, 'যাই হোক, ছাত্ররা আমাকে ঘৃণা করে না।'

ওখানে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি একবার ছাত্রদের উৎসুক মুখগুলোর উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। এই ঘরখানা পুরনো কায়দায় বৃত্তাকারে নির্মিত। নিচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর তাঁর সামনে চারদিকে

পুরনো বেঞ্চিতে বসে রয়েছে ছাত্ররা, এক সারির পরে আরেক সারি উঠে গেছে, তার শেষ সারিটা ঠেকেছে গিয়ে ছাদে। খাতা খুলে লিখবার জন্য প্রস্তুত সবাই, কেউ কেউ হাতের উপরে রেখেছে তার চিবুক। সবার চোখ ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল।

অধ্যাপক ভেবে দেখলেন, অবিজ্ঞের মতো কাজ কখনো করেননি তিনি। আত্মঅবলুপ্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি জীবনবোধকে উদ্দীপিত করে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি অনেক উত্তেজনাকে অবদমিত করেছেন, কিন্তু অধ্যাপকের এই গুণটি তাঁর অন্যান্য গুণগুলোর মতোই ওঁর কাছে অসহ্য লাগে। এখন অবিশ্যি এতে আর কিছু এসে যায় না, কারণ সাকো-ভাঞ্জেত্তির মামলা সম্পর্কে অধ্যাপকের সমস্ত চিন্তাধারা আর এই মামলায় তাঁর নিজের অবস্থিতি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি।

প্রথমত, এই মামলা সম্পর্কে অধ্যাপকের একটা স্থির অবস্থিতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁকে বলতে হবে ওরা দোষী, কিংবা নির্দোষ, কিংবা অন্তত মামলা পরিচালনায় বিশেষ কোন একটা দিকে কিছু অন্যায় করা হয়েছে। মাসের পর মাস তিনি এই প্রশ্নটিকে ভেবেছেন, ভেবেছেন একটা পক্ষ অবলম্বন করবেন কিনা। এর ফলে হয়তো তাঁকে কম্যুনিস্টদের দলের লোক বলা হবে; হয়তো কম্যুনিস্ট বলা হবে তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক আত্মানুসন্ধানের পর তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করলেন, এই মামলার সমস্ত ঘটনা নিয়ে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত অনুসন্ধান চালাবেন।

প্রথম সিদ্ধান্তে যখন তিনি উপনীত হলেন, তখনকার কথা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। কারণ সেই প্রথম সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই পরের ঘটনাস্রোত এগিয়ে গেছে। যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে হতে পারতো শুধু মাঝে মাঝে সাকো-ভাঞ্জেত্তির মামলার খোঁজ নিতে। কিন্তু তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তের ফলে এই মামলার মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। আর তার পরই আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন হলো: 'ওরা দোষী, না নির্দোষ?'

এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েই পরের অধ্যায়ে এসে গেলেন তিনি। তার

অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কথা ভেবে অনেকদিন পর্যন্ত মনে ভয় ছিলো তাঁর। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে, আর এই সংগ্রাম করতে হয়েছে একটা নতুন দেশে, নতুন ভাষায়, নতুন মানুষ, নতুন লজ্জা, নতুন ঘৃণার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে সংগ্রামের।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে যা তিনি জয় করেছেন এত লড়াইয়ের পর, সবই হয়তো বিসর্জন দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু তবু মনে মনে দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি বলেছেন, 'মিথ্যাবাদী হয়ে বেঁচে থাকা বড় কঠিন। হয়তো মিথ্যের বেসাতি করে বেঁচে থাকতে পারে কেউ কেউ, কিন্তু সে কথা ভাবতেও আমার অস্বস্তি লাগে। হয়তো ভবিষ্যতে আমি একজন বড় বিচারক কিংবা ধনী আইনজীবী হতে পারতাম। এখন আমার ভবিষ্যৎ কী হবে আমি ভাবতেও পারি না, কিন্তু এ কথা জানি যে অস্বস্তি অনেক কম থাকবে আমার।'

এর পরেই তিনি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মামলার উপরে তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

এখন ছাত্রদের দেখতে দেখতে, নিজের চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করতে করতে, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হতে সব কথাই মনে পড়ছিলো অধ্যাপকের। দরজার উপরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, এখন ঠিক নটা বেজে এক মিনিট। কেশে গলা পরিষ্কার করে মাথা নেড়ে পেনসিল দিয়ে বক্তৃতামঞ্চের উপরে দুটো টকটক শব্দ করে তিনি বললেন, 'এবারে আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণের উপরে আগেকার বক্তৃতাটি আবার শুরু করছি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা বিখ্যাত অনেকগুলো মামলার আলোচনা করেছি। মামলাগুলোকে অবিশ্যি কুখ্যাতও বলা চলে। এ সব মামলা সবই অতীতের। আজ এই বর্তমানের একটা মামলা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে আমার। আজ বাইশে আগস্ট, আর আজই আমি এই মামলা নিয়ে আলোচনা করছি। এতে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কমনওয়েলথের গভর্ণর আজ দিনটিকে ধার্য করেছেন সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য। ইতালীয় শ্রমিক দুটি আজ বন্দীশালার মৃত্যুকুঠুরিতে জীবনের শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে আছে।

'ওদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পালনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ওদের অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আলোচনা করাকে কেউ কেউ হয়তো বলবেন অনুচিত কিংবা বোকামি। কিন্তু আমি এই কাজ না ভেবেচিন্তে করছি না। আর আমার মনে হয়, এতে বোকামিরও কিছু নেই কিংবা অনুচিতও নয় এ কাজ। ইতিহাসের পর্যালোচনায় যেমন থাকবে অতীত, তেমনি থাকবে বর্তমান। একজন কৃতী আইনজীবীকে হতে হবে ইতিহাসের গতির একটি সচেতন অংশ।

'রোজার উইলিয়ামস্' স্মারক বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতার বিষয় হিসাবে এই আলোচনাকে গ্রহণ করাও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হয়েছে। প্রায়ই কোন কিছুর নামকরণ করার সময়ে নামটির সঙ্গে জড়িত স্মৃতি কিংবা তার উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা মাথা ঘামাই না। মানুষের মতামতের উপরে ধর্ম বা রাষ্ট্রীয় কোন আইনের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্যই রোজার উইলিয়ামস্ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সুতরাং উইলিয়ামস্ বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণকারী সকলের উপরেই একটা দায়িত্ব গিয়ে বর্তায়। মতামতের স্বাধীনতা শুধু একটা কথার কথাই নয়, সে তো জীবনেরই একটা অঙ্গ এবং তাকে রক্ষা করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করা প্রয়োজন। মানবিক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যিনি সংগ্রাম করেন তাঁর পথে ভয়ঙ্কর সব বিপদ আসে। যাই হোক, জয়ের পুরস্কার তাঁর কষ্টকে সার্থক করে দেয়।

'আজ দিনটি অন্য দিনের মতো নয়। আমার জীবনের যত দিন আমি স্মরণ করতে পারি, তার একটি দিনেরও মতো নয় এই দিনটা। যাঁরা ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী, যাঁরা মানুষের মতামতের স্বাধীনতায় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে একটা দুঃখময় আঘাত হেনে আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখা হবে। সেই জন্যই যা আজ তোমাদের কাছে আমি এখন বলতে যাচ্ছি তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

অধ্যাপক এবারে একবার সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগলো সবার চোখে চোখে। তিনি এতক্ষণ যা বলেছেন তার গুরুত্ব, তার সমস্যার ছাপ পড়েছে প্রায় সকলেরই মুখে। তাই যেন একটু একটু করে ঘাম বেরুচ্ছে দেহ থেকে। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন,

বক্তৃতা শেষ করার আগেই তাঁর সমস্ত দেহ ঘামে চপচপে হয়ে যাবে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়বেন। এবারে তাই তিনি আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলতে লাগলেন :

'সবার আগে আমি এই মামলার কয়েকটা ঘটনা নিয়ে একটু আলোচনা করবো। অবিশ্যি আমাদের হাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ঘটনাকে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা সবাই মামলাটি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখো। আমাদের কাজ হবে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রচলিত রীতির আলোকে ঘটনাগুলোকে বিচার করে দেখা। আমরা তাই করতে চেষ্টা করবো।

'তোমরা জানো, যে ঘটনাবলীর ফলে এই মৃত্যুদণ্ড হতে যাচ্ছে তার শুরু হয়েছিলো ম্যাসাচুসেট্সের দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে সাত বছর আগে উনিশশো সাতাশের পনেরোই এপ্রিল। সেই সময় পারমেণ্টার নামে একজন ক্যাশিয়ার আর তার রক্ষী বেরার্দেল্লিকে দুজন সশস্ত্র লোক গুলি করে মারে। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো পিস্তল। ক্যাশিয়ার এবং তার রক্ষীর কাছে ছিলো স্লেটাব অ্যাণ্ড মরিলের জুতোর কারখানার কর্মচারীদের মাইনে বাবদে পনের হাজার সাতশো ছিয়াত্তর ডলার, একান্ন সেণ্ট। এই টাকাটা জুতোর কোম্পানীর অফিস থেকে কারখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় প্রশস্ত রাজপথের উপরে এই জোড়া খুন হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই আর দুজন লোক নিয়ে একটা গাড়ি এসে সেখানে দাঁড়ালো এবং ডাকাতেরা মাইনের সমস্ত টাকাটা গাড়িটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে গাড়িতে লাফিয়ে উঠলো আর গাড়িটা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো। দুদিন পরে ডাকাতিতে ব্যবহৃত এই গাড়িটাকে দক্ষিণ ব্রেনট্রি থেকে কিছু দূরে একটা বনের মধ্যে পাওয়া গেলো পরিত্যক্ত অবস্থায়। পুলিস সেখানে ছোট একটা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলো। দাগটা ওখান থেকে একদিকে চলে গেছে। মোট কথা, আরেকটা গাড়ি ডাকাতি-করা গাড়িটার কাছে এসে অপরাধীদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

'এই সময়ে পুলিস এই ধরনেরই আরেকটি ঘটনার তদন্ত করছিলো কাছাকাছি ব্রিজওয়াটার শহরে। ঘটনা দুটির মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য ছিলো, —দুটি ঘটনায়ই গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং পর্যবেক্ষকদের মতে দুটি

ঘটনারই অপরাধীরা ইতালীয়।

'এখন যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছলাম তাতে অপরাধীদের খোঁজ করার পক্ষে পুলিস কিছু সূত্র পেলো। পুলিস খোঁজ করতে লাগলো এমন একজন ইতালীয়কে যার গাড়ি আছে। যেহেতু ব্রিজওয়াটারের ঘটনায় গাড়িটা চলে গিয়েছিলো কোচেসেটের দিকে, সেইজন্য খানিকটা সঙ্গতভাবেই পুলিস ধরে নিলো, এই গাড়ির মালিক ইতালীয়টি ওই শহরের বাসিন্দা।

'এখানে এ কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে এই অনুমান প্রযোজ্য হতে পারে নিউ ইংল্যাণ্ডের যে কোন শিল্পশহর সম্পর্কে, কারণ এই রাজ্যে এমন কোন শিল্পশহর নেই যেখানে কিছু ইতালীয় অধিবাসী নেই, আর গড়ে একজন অন্তত ইতালীয় অধিবাসীর গাড়ি থাকবে, এটা তো একান্ত অবধারিত। কিন্তু এই সম্ভাবনাটা ভেবেও দেখলো না পুলিস। তারা কোচেসেটে বোদা নামে একজন ইতালীয় গাড়ির মালিককে আবিষ্কার করলো।

'এর পরে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ খানিকটা বাদ দেওয়া যাক। দেখা গেলো বোদার গাড়িখানা মেরামতের জন্য এসেছে জনসন নামে একজনের গ্যারাজে। গাড়ি নিতে কে আসে লক্ষ্য করার জন্য পুলিস সেখানে গোয়েন্দা বসালো। তারপর ঘটনা ঘটবার তিন সপ্তাহ পরে পাঁচই মে রাত্রে বোদা আর তিনজন ইতালীয় এলো গাড়িটা নিতে।

'এইখানে কাঠামোটা সম্পর্কে, ঘটনাস্রোতের ধারা সম্পর্কে এবং একজন বিপ্লববাদী ইতালীয়ের চোখে দেখা সেদিনের পৃথিবী সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। বিপ্লববাদী কথাটি আমি ব্যবহার করছি কারণ অ্যানার্কিস্ট বা কম্যুনিস্ট বা সোসালিস্ট যাই বলি না কেন, সাকো আর ভাঞ্জেত্তি সম্পর্কে এই বিশেষণটিই নিখুঁতভাবে প্রযোজ্য। আসলে ওরা সত্যি সত্যিই ছিলো বিপ্লববাদী। সেই সময়ে উনিশশো বিশের বসন্তকালে এদের জীবন ছিলো সবচেয়ে অস্বস্তিকর। অ্যাটর্নি জেনারেল পামার সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানুষের সবাইকে দেশ থেকে তাড়াবার আয়োজন করছেন। বিপ্লববাদী, যদি সে বিদেশী হয়, তবে বিশেষ করে তার প্রতি বর্বর ব্যবহার করা হতো। এ ব্যবহার প্রায়ই এমন হতো, যা আজ আর কেউ সহ্য করবে না। যেমন,

উনিশশো বিশে স্যালসেদো নামে একজন বিপ্লববাদী ইতালীয় মুদ্রাকরকে ধরে এনে আটক করা হলো নিউইয়র্কের পার্ক রোতে বিচারবিভাগের কোন আপিসের চোদ্দতলার একটা ঘরে। সেই গাড়ির মালিক ইতালীয় বোদা আর তার বন্ধুরা ছিলো মুদ্রাকর স্যালসেদোর বন্ধু। চৌঠা মে ওরা খবর পেলো, স্যালসেদোর চূর্ণবিচূর্ণ দেহ পার্ক রোর বাড়িটার পাশের গলিতে পাওয়া গেছে। স্যালসেদোকে হয় চোদ্দতলার উপর থেকে ঠেলে ফেলা হয়েছে, কিংবা দৈবাৎ সে পড়ে গেছে। সব শুনে ওরা বুঝলো, ওদেরও বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ওদের কাছে কিছু বিপ্লববাদী সাহিত্য ছিলো। ওরা মনে করলো, সেগুলো লুকিয়ে ফেলা দরকার। ওরা বুঝলো, ওদের বন্ধুবান্ধব অনেকেরই বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে, তাদের সবাইকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। এইসব কাজের জন্য বোদার গাড়ি অনেক কাজে আসবে। তাই বোদা তার বন্ধুদের নিয়ে দেখতে এলো গাড়িটা মেরামত হয়ে গেছে কি না। ওদের বলা হলো, মেরামত সম্পূর্ণ হয়নি এবং ওরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যারাজের মালিক জনসনের স্ত্রী পুলিসে খবর দিলো।

'সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি এসেছিলো বোদার সঙ্গে গাড়ির খবর নিতে। গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তার একটা গাড়িতে উঠলো। ওদের সঙ্গে একজন পুলিস অফিসারও উঠলো গাড়িতে এবং ওদের গ্রেপ্তার করলো। কেন যে ওদের গ্রেপ্তার করা হলো সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ওদের ছিলো না। সুতরাং ওরা বাধা দিলো না, শান্তভাবে কোন গণ্ডগোল না করে ওরা পুলিস অফিসারের সঙ্গে গেলো।

'এই হচ্ছে মোটামুটি আদি ঘটনাটার একটা বিবরণ। এর পরে দীর্ঘ সাত বছর ধরে ঘটনাপ্রবাহের শেষে এই দুটি হতভাগ্য মানুষ এসে পৌঁছেছে তাদের বর্তমান অবস্থায়।

'এতক্ষণ আমি অপরাধটির কথাই বলছিলাম। সহজতম অপরাধও আইনের চোখে দেখলে জটিল হয়ে ওঠে। যাই হোক, আমার আজকের বক্তব্য অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে নয়, আমি বলবো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রকৃতি সম্পর্কে। তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে মোটামুটি সহজ বলেই মনে হচ্ছে। যখন টাকা-

গুলো চুরি হলো এবং খুনটা হলো, তখন রাস্তায় আর গাড়ির মধ্যে উপস্থিত মোট চারজনের দুজন বলে নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তিকে সনাক্ত করতে পারলেই হলো। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণের খুঁটিনাটি বিচার করার আগে আমাদের জানা দরকার যে গ্রেপ্তার হওয়ার সময়ে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি খুব অল্পই ইংরেজী বলতে পারতো। সে সময় ওদের কেউই ইংরেজীতে নিজের কথা বোঝাতে পারতো না, কিংবা তাড়াতাড়ি ইংরেজীতে কিছু বললে তার অর্থও বুঝতে পারতো না। এই সাত বছরে অবিশ্যি অবস্থাটা বদলে গেছে। বন্দী অবস্থায় ওরা দুজনেই চেষ্টা করে করে মোটা-মুটি ইংরেজী শিখে নিয়েছে। যাই হোক, সেই সময়ে অনেক প্রশ্নেরই অর্থ বুঝতে পারতো না ওরা এবং ওদের জবাবেরও কদর্থ করা হতো। আদালতে দোভাষীটি এমন সব কাজ করেছে, যাতে তার সাধুতা সম্পর্কে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থেকে যায়। ওদের গ্রেপ্তার করার এক বছরেরও বেশি সময় পরে ওদের বিচার শুরু হলো। সাত সপ্তাহ বিচার চলার পরে উনিশশো একুশের চোদ্দই জুন ওদের দুজনকে খুনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো।

'আমি আগেই বলেছি, আসল সমস্যা হচ্ছে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে খুনে দলের লোক বলে সনাক্ত করা। বিচারের সময়ে উনষাটজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো সরকার পক্ষে। ওদের সাক্ষ্যে ওরা বললো, ঘটনার দিন সকালে বিবাদীদের ওরা দেখেছে দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে, কেউবা সাক্কোকে খুনেদের একজন বলে এবং ভাঞ্জেত্তিকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছে বলে সনাক্ত করলো। অন্যদিকে বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা দেখালো, ঘটনার দিনে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি অন্য কোথাও ছিলো। শপথ নিয়ে বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা বললো, পনেরোই এপ্রিল সাক্কো ছিলো বোস্টনে ইতালীতে যাওয়ার জন্য একটা পাসপোর্ট যোগাড়ের চেষ্টায়। সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন ইতালীয় দূতাবাসের একজন কর্মচারী। তিনি বললেন, ঘটনার দিন বেলা দুটো পনেরো মিনিটের সময়ে সাক্কো দূতাবাসে এসেছিলো। ভাঞ্জেত্তির পক্ষের সাক্ষীরা বললো, পনেরোই এপ্রিল খুনের দিনে খুনের সময়ে দক্ষিণ ব্রেনট্রি থেকে অনেক দূরে সে মাছ ফেরি করছিলো। মোট কথা, সাক্ষীর পর

সাক্ষী শপথ নিয়ে যা বললো, তাতে সেদিন সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির পক্ষে দক্ষিণ ব্রেনট্রির ঘটনার সঙ্গে কোনরকমে জড়িত থাকা একেবারে অসম্ভব।

'মনে হতে পারে, এমন অবস্থায় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির দোষ কিংবা নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন না। যাই হোক ব্যাপারটা তত সহজ নয়, আর সব মানুষও এই অর্থে এত চিন্তাশীল নয়। সরকার পক্ষেও অনেক সাক্ষী শপথ করে বলেছে যে ওরা সেই অপরাধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। এমতাবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্যপ্রমাণের মুখোমুখি এসে পড়লাম।

'আমাদের হাতে যে সময় আছে তাতে সাক্ষীর পর সাক্ষীকে পরীক্ষা করা কিংবা সাক্ষীদের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আমি তা করতেও যাবো না। তার পরিবর্তে ক্রোধোন্মত্ত অথবা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের চোখে দেখা প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা বলবো আমি। উদাহরণ স্বরূপ একজন সাক্ষীর কথা বলা যায়। সে পর্যবেক্ষণশক্তি এবং স্মৃতিশক্তির অসাধারণ পরিচয় দিয়েছে। কথাটা বার বার বলা দরকার, কারণ এইভাবেই সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সনাক্তকরণ হয়েছিলো। এই সাক্ষীর নাম মেরী স্প্লেন। ঘটনাটি ঘটার কিছু পরেই পিঙ্কার্টন গোয়েন্দা বিভাগ মিস স্প্লেনকে দাগী আসামীদের কতগুলো ছবি দেখায়। মিস স্প্লেন টনি পামিসানো নামক একজনের ছবি দেখিয়ে বললো, সে ছিলো দস্যুদলের গাড়িতে। অথচ তার চোদ্দ মাস পরে সে-ই আবার নিকোলা সাক্কোকে সনাক্ত করলো গাড়িতে দেখা ডাকাতদের একজন বলে।

'অপরাধের ঘটনাকে যে অবস্থায় সে চাক্ষুষ করেছিলো, তাও এমনি কৌতুকপ্রদ। যেখানে ঘটনাটি সংঘটিত হয় সেই রাস্তার উল্টোদিকে একটা বাড়ির তিনতলায় বসে সে কাজ করছিলো। বন্দুকের শব্দ শুনে সে কাজ ফেলে জানলার কাছে ছুটে আসে। কল্পনা করো, এমন অবস্থায় কতখানি উত্তেজিত ছিলো তার মন। যখন সে জানলায় এসে পৌঁছলো, তখন খুনেদের গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। সুতরাং গাড়িটা অদৃশ্য হবার আগে সে মাত্র

মুহূর্তের জন্য গাড়িখানা দেখতে পেয়েছিলো। কিন্তু চোদ্দ মাস পরেও সে তার সেই মুহূর্তের দেখা দৃশ্যটি মনে করতে পারলো। এমনি করে সে তার স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিলো। আমি এখন মামলার বিবরণ থেকে খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

'প্রশ্ন : "আপনি লোকটার বর্ণনা দিতে পারেন?"

'মিস স্প্লেন বললো, "হ্যাঁ, স্যার। লোকটি আমার চেয়ে মাথায় একটু লম্বা হবে। তার ওজন হবে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চান্ন পাউণ্ডের মধ্যে। পেশীবহুল, মানে কর্মঠ বলেই মনে হয় লোকটিকে। বিশেষ করে আমি তার বাঁ হাতখানা দেখলাম বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখে মনে হলো, বেশ শক্তি আছে সে হাতে কিংবা তার কাঁধে—"

'প্রশ্ন : "হাতখানা কোথায় দেখেছিলেন আপনি?"

'উত্তর : "বাঁ হাতখানা ছিলো সামনের আসনের উপর, মানে তার পিছনটিতে। ধূসর রঙের হয়তো একটা সার্ট ছিলো তার গায়ে, ধূসর ভাবের নেভি রঙের মতো। আর মুখখানা ছিলো যাকে বলি আমরা চোখাচোখা, পরিষ্কার। আর একটু সরু ধরনের। কপালটা উঁচু। চুলগুলো ছিলো ওলটানো, আর মনে হচ্ছিলো দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি লম্বা। চোখের উপরে কালো ভ্রূ আর গায়ের রঙ ছিলো ফর্সা, অদ্ভুত রকমের ফর্সা, একটু সবুজ সবুজ ভাব।"

'এই হচ্ছে চোদ্দ মাস আগে সে যা এক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলো, তার বর্ণনা, যেমনটি সে দিয়েছে। স্মৃতি রোমন্থন করে নিকোলা সাকোকে তার দেখা সেই লোক বলে আবার সে সনাক্ত করেছে। কেউ কেউ বলতে পারে, স্বাভাবিকভাবে এই রকম অবস্থায় স্মৃতি থেকে এই ধরনের সনাক্তকরণ শুধু অসম্ভবই নয়, খানিকটা ভয়ঙ্করও বটে। কেমন ভয়ঙ্কর তা ভালো বোঝা যাবে লুইস্ পেল্সার নামে আর একজনের সাক্ষ্য থেকে। মিস স্প্লেনের মতোই সে প্রথমে সাকো আর ভাঞ্জেত্তিকে সনাক্ত করতে পারেনি, কিন্তু পরে আবার মিস স্প্লেনেরই মতো তার স্মৃতিশক্তি ভয়ানক বেড়ে গেলো। সাকো আর ভাঞ্জেত্তিকে গ্রেপ্তার করার পরেই পুলিস পেল্সারকে নিয়ে যায় ওদের সনাক্তকরণের জন্য। অপরাধী বলে পেল্সার ওদের সনাক্ত

করতে পারলো না। পেল্সার কাজ করতো একটা জুতোর কারখানায়, সে কারখানা স্লেটার অ্যাণ্ড মরিলের কারখানার সঙ্গে নানানভাবে যুক্ত ছিলো। দু একদিনের মধ্যেই পেল্সারের চাকরি গেলো, সে বেকার হয়ে পড়লো। কয়েক সপ্তাহ পরেই তার স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবিত হলো। আবার সে চাকরি ফিরে পেলো এবং এবারে সে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে অপরাধী বলে সনাক্ত করতে পারলো। শুধু সে-ই নয়। মামলার পর মামলায় এমনি স্মৃতিশক্তি আর বেকারি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রইলো। কখনো কখনো যেখানে চাকরি থেকে তাড়ানো সম্ভব হতো না, সেখানে জিলা অ্যাটর্নি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অপরাধীর বিচারের উত্তেজনায় প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে নানা রকমের ভয় দেখাতো। মাঝে মাঝে এই ভয় দেখানো এত স্পষ্ট হয়ে উঠতো যে এর প্রমাণ পাওয়া যেতো মামলার সরকারী বিবরণের মধ্যেই।

'এই ধরনের দোষারোপ করা এবং তার মধ্য থেকে এই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়; কিন্তু সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মামলায় ব্যাপার-গুলো এমনই হয়েছিলো। আজ রাত্রে যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পালন করা হবে, তা এই অবিশ্বাস্য এবং নিষ্ঠুর বিচারপদ্ধতিরই স্বাভাবিক পরিণতি। কিছু লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। এ কথা আজ আমি বলছি গভীর দুঃখের সঙ্গে, কিন্তু ইতস্তত করছি না।

'দক্ষিণ ব্রেনট্রির এই ঘটনা ঘটেছিলো এই দেশের ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে, একটা অদ্ভুত এবং খানিক ভয়ানক সময়েও বটে। অ্যাটর্নি জেনারেল পামারের নেতৃত্বে দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হচ্ছে আর তার ফলে সমস্ত দেশময় একটা বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। দেশের সর্বত্র, প্রত্যেক প্রান্তে, অলিতে গলিতে, কারখানায় কারখানায়, বিশেষ করে যে সব কারখানায় শ্রমিকরা তাদের মাইনেতে সংসার প্রতিপালন করা যাচ্ছে না বলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, সেইখানেই ছড়িয়ে পড়েছে সাম্যবাদীরা। আর এই অবস্থার ফলে একদল শয়তানের সৃষ্টি হলো, যারা বোমা নিয়ে লুকিয়ে থাকতো ঝোপঝাড়ের আড়ালে। সমস্ত দেশের প্রধান খবরের কাগজগুলোতে পরোক্ষে এদের প্রচার করা হলো সাম্যবাদী বলে, আর ইঙ্গিত করা হলো

বিদেশী যারা আমেরিকায় বসবাস করছে, তাদের প্রতি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিশ্বাস করানো হলো, স্বাধীন জাতি হিসাবে আমেরিকার অস্তিত্ব ঘোরতর বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ম্যাসাচুসেট্‌সের এই ভয়ঙ্কর হিংস্র অপরাধে অপরাধী বলে কজন ইতালীয়কে সনাক্ত করা হলো, আর মানুষ সহজেই এ কথা বিশ্বাস করলো এবং তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া ধারণা আরো দৃঢ় হলো। অপরাধী হিসাবে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে আদালতে হাজির করা হলো। ওরা ইংরেজী বলতে পারে না। ওদের পরনে ছেঁড়া পোশাক, চেহারা বিপর্যস্ত, ভীত, হতভম্ব। সাক্ষীর পর সাক্ষী ডেকে প্রশ্ন করা হলো, যে অপরাধ মানুষের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো এবং স্মৃতিতে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিলো, এক বছর আগে দ্রুত সংঘটিত সেই অপরাধে এরা দুজন অপরাধী কিনা, কিংবা এরা তাদের মতোই দেখতে কিনা। আর সাক্ষীর পর সাক্ষী সনাক্ত করলো সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে।

'আইনানুগ সাক্ষ্যপ্রমাণের মাপকাঠিতে এর কী অর্থ হয়? যা নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনানুসারে সংশয়হীন চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে কোন লোককে খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না যদিও কখনো কখনো ঘটনার পারম্পর্য বিচার করে অপরাধীকে দণ্ডিত করা হয়ে থাকে, তবু আইনের সাহায্যে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাবার মধ্যে যে গভীর গুরুত্ব তারই জন্য এই সাবধানতা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে দণ্ডিত করা হলো চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েই, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত এই সাক্ষীর পক্ষে সত্য কথা বলা সম্ভব ছিলো না, কারণ তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী প্রমাণ করেছে ঘটনার সময়ে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি ছিলো ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে। আর বিশেষ করে ঘটনাপরম্পরার একটি প্রমাণ একেবারে অকাট্য।

'এবারে আমি সেই ঘটনাপরম্পরার কথা বলি। যখন ওদের গ্রেপ্তার করা হয় তখন সাক্কোর কাছে একটি পিস্তল ছিলো। এই পিস্তলটি মামলায় প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন প্রোক্টর নামে একজন

আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞকে পিস্তলটি পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছিলো এবং নিহতদের একজনের দেহে বিদ্ধ একটি কার্তুজ ওই পিস্তল থেকে ছোঁড়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত চাওয়া হয়েছিলো।

'এই রকম অবস্থায় একজন ভালো আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ মোটামুটি সঠিক মতামত দিতে পারেন এবং মনে করা হয়েছিলো, ক্যাপ্টেন প্রোক্টরও পারবেন। তিনি সবকিছু পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন, ওই কার্তুজ নিকোলা সাক্কোর কাছে পাওয়া পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত হয়নি। যাই হোক, জিলা অ্যাটর্নি ব্যাপারটা নিয়ে ক্যাপ্টেন প্রোক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং মামলায় যাতে হেরে যেতে না হয় তার জন্য প্রশ্ন করলেন, "তিন নম্বর বুলেটটি এই পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া সম্পর্কে কোন মতামত আপনি দিতে পারেন কি?"

'এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ক্যাপ্টেন প্রোক্টরকে বলতে বাধ্য করলেন, "আমার মতে বুলেটটি ওই পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যুক্তি থাকতে পারে।"

'এই উত্তর বহুদিন ধরে ইতিহাসের পাতায় ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হবে। এখানে "যুক্তি" কথাটির অর্থ কি? জুরির সদস্যগণ স্বাভাবিক ভাবেই সাক্কোর পিস্তলটিকে খুনীর অস্ত্র বলে মেনে নিলেন। সোজা ভাষায় এই অর্থই হয় বিশেষজ্ঞের কথার। আসলে এর অর্থ ও ধরনেরই নয়। সরকারী উকিল আর আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ নিজেদের মধ্যে একটা আপোস করে এই ভাষায় উত্তরটি তৈরি করেছিলেন। পরে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞই ঘোষণা করেছিলেন, "ওই বুলেটটি সাক্কোর পিস্তলটি থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সপক্ষে আমি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি কিনা, সোজাসুজি এই প্রশ্নটি যদি আমাকে করা হতো, তবে সেদিনও আজকের মতোই দৃঢ়তার সঙ্গে আমি নেতিবাচক জবাব দিতাম।"

'কেউ কেউ ভাবতে পারেন, সাকো-ভাঞ্জেত্তির পক্ষের এক আপীলের শুনানির সময় যখন এই উক্তি তিনি করলেন, তখন তাঁর পূর্বতন উক্তির আর মূল্য রইলো না, সুতরাং নতুন করে আবার মামলার বিচার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হলো না। চাক্ষুষ দ্রষ্টাদের সাক্ষ্যপ্রমাণের

কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি। এবারে সম্ভাব্যতা এবং নিশ্চিতির মাপকাঠিতে সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোচনা করলাম। কারণ মাঝে মাঝে মনগড়া দৃশ্যও মানুষ নিজের চোখে দেখতে পারে, যেমন দুর্বল কোন সাক্ষী এক অর্থগৃধ্নু সরকারী উকিল আর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচারকের ইচ্ছামতো সাক্ষ্য দিয়ে আসতে পারে। উনিশশো বিশে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে, ম্যাসাচুসেট্‌সে, এমন কি দক্ষিণ ব্রেনট্রিতেও এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিলো, যাতে অসংখ্য মানুষের ইচ্ছা হয় খুনের দায়ে দণ্ডিত আসামী হিসাবে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মতো মানুষকে দেখতে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিলো যাতে মনে হয় মৃত্যুদণ্ড ন্যায়তই ওদের প্রাপ্য। ওরা কি সাম্যবাদী এবং ফলে যা কিছু সুন্দর তার শত্রু নয়? ওরা কি বিপ্লববাদী নয় এবং তার জন্যই সমস্ত ভদ্র শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের থেকে আলাদা মানুষ নয়? যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিধাতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ওরা কি তার বিরোধী নয়? ওরা কি যুদ্ধবিরোধী নয়? পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে নিষ্কণ্টক করার জন্য কি আমরা মাত্র কিছুদিন আগে একটা যুদ্ধ শেষ করলাম না, যে যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করা কোন ভদ্র এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব? ওরা কি সেই মুনাফা ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে না, যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিধাতা স্বয়ং এবং আমাদের সংবিধান? দেশের সমস্ত শিল্প কি দাঁড়িয়ে নেই এই মুনাফার উপরে, দাঁড়িয়ে নেই একে অন্যকে শোষণ করে প্রতিবেশীর গায়ের রক্তের বিনিময়ে নিজের টাকা বাড়ানোর লিপ্সার উপরে?

'আমার এই ধরনের প্রশ্ন শুনে হয়তো একটু খারাপ লাগছে তোমাদের; কিন্তু আইনের ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে তোমাদের ধারণা জন্মানোর জন্যই প্রশ্নগুলো করলাম। আমার বক্তব্যের গুরুত্ব আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছি। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের কার্যাবলীকে মিলিয়ে দিতে না পারলে জীবনের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। এতেই গুরুত্ব বাড়ে জীবনের। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির গুরুত্বও বেড়েছিলো জীবনের প্রয়োজনে। আর আজ দিন শেষ হওয়ার আগেই ওরা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবে ওদের বিশ্বাসের জন্য, কৃত কোন অপরাধের জন্য নয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ মানুষের উপরে প্রভুত্বও করতে পারে, যেমন পারে তার দাস

হতে। এ কথা আমি খানিকটা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম এবং হয়তো আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারবো।...'

আরো বিশ মিনিট ধরে অধ্যাপক বক্তৃতা করলেন, কিন্তু বক্তৃতা শেষ করার পরেও তাঁর মনে হলো, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চেয়েছিলেন তিনি, যা বলা হলো না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যে আদালতের শাসন, পরিচালনা এবং মালিকানা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, কমনওয়েলথের গভর্নর এবং এই মামলার বিচারকের মতো মানুষের হাতে, সেখানে সাকো আর ভাঞ্জেত্তির মতো মানুষের পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এইটুকুই যদি তিনি বলতেন তবে নিজের হাতেই তিনি নিজের ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দিতেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু তখনো চিন্তাস্রোতে তন্ময় হয়ে তিনি অনড় দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলে যেমন চিরদিন হয় তেমনি একটা বিশেষ ধরনের দুর্বলতা বোধ করতে লাগলেন তিনি এবং তাঁর ইচ্ছে হলো এখন খানিকক্ষণ একা থাকতে। কিন্তু ছাত্ররা ভিড় করে এলো তাঁর চারদিকে। কেউ কেউ তাঁকে ধন্যবাদ দিলো, কেউবা আলোচনা করতে লাগলো তাঁর বক্তৃতা নিয়ে। একজন বললো, 'কিন্তু স্যার, আজ রাত্রে নিশ্চয়ই ওদের দণ্ড কার্যকরী করা হবে না। বলুন, আমরা কি করবো। আমাদের নিশ্চয়ই কিছু কর্তব্য আছে।'

'হয়তো কিছুই করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে,' তিনি বললেন।

'কিন্তু স্যার, আপনি নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত করবেন না যে আইনের সবটাই ফাজলামো, আদালতগুলো অযোগ্য এবং ন্যায়বিচারের অস্তিত্বই নেই?'

তিনি মনে মনে আহত হলেন। প্রশ্নকর্তা ছাত্রটির দিকে তাকালেন তিনি। ছেলেটির চুল লাল, চোখ দুটি উজ্জ্বল। হঠাৎ আরো গম্ভীর, আরো শান্ত হয়ে গেলেন অধ্যাপক। একটু ভয়ও পেলেন। মনে মনে দুঃখিত হলেন। হ্যাঁ, ভয় পাওয়ার মতোই সময় এখন।

'আপনি কি সত্যি সত্যিই তাই বলতে চান?' ছাত্রটি আবার প্রশ্ন করলো।

তিনি বলে ফেললেন, 'যদি তাই হয়, তবে তোমার মতোই আমার জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'তবু, আপনি তো অবিচারের কথাই বললেন। যদি আইন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে অবিচারই করে তবে সুবিচার আসবে কেমন করে?'

'তা নিয়ে আরেকটা বক্তৃতা দেওয়া যাবে, কেমন?'

তিনি ঘড়ি দেখলেন। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই প্রায় তাঁর ঘামে ভেজা পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছিলো আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছিলো। ওদের ঠেলে পথ করে প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন অধ্যাপক।

পাঁচ

প্রাতরাশ শেষ করে কফির দ্বিতীয় পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি খানিক সময় র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্‌ডো ইমার্সনের প্রতিকৃতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ দুটি প্রায় বুজিয়ে এনে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে ঢেকুর তুললেন একটি। ঠিক তেমনি করেই নাক কোঁচকালেন একবার। ইংরেজী বিভাগের একজন একে বলেন ওঁর "ভারিক্কি চালের প্রভুসুলভ সরলতা", যেন কোন অর্থ নেই এ ভঙ্গীটির, আবার অর্থ আছেও। অন্য কেউ হলে হয়তো এর জন্য "বর্বর" আখ্যা পেতো; কিন্তু শুধু ভয়ঙ্কর অথচ অবিশ্বাস্য চালবাজীর জন্যই এ নামকরণ এখনও হয়নি তাঁর।

তাঁর উলটোদিকে বসে উপদেষ্টা গল্প শেষ করলেন।

'কি বললে, মাত্র পাঁচ মিনিট আগে?' সভাপতি বললেন, 'এ আমি বুঝতেই পারছি না। আমি তোমায় বলছি, ও ইহুদিটা একটা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়েছে। ওর কথার আর শেষ হবে না।'

আরেকবার তিনি ইমার্সনের প্রতিকৃতির উপরে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। 'যখন আমি "ইহুদিটা" বলছি, আমি বিশেষ কোন একজনের কথা বলছি না, ও জাতটার কথাই বলছি।' তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'তুমি আরেকবার সেই অংশটা বলো তো, যেখানে ও রক্তপিপাসার কথা বলেছে।'

'তিনি ওই কথাগুলোই বলেছেন এমন কথা আমি বলি না।'

এই সময়ে আইন বিদ্যালযের অধ্যক্ষ এসে ঢুকলেন। বাতাসে তিনি একটু ক্রোধের গন্ধ পেলেন এবং মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। ভোজন কক্ষটি বেশ বড়, চমৎকার সব আসবাবপত্রে সাজানো। হাতে আঁকা দেয়াল কাগজে মোড়া দেয়াল, আংটায় ঝুলছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সুন্দর পর্দা, তার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। ঝুলে পড়া মোটা পেটের উপরে তাড়াতাড়ি হাত দুখানা রেখে অধ্যক্ষ এসে হেনরী থোরোর প্রতিকৃতির ঠিক নিচটিতে দাঁড়ালেন।

'ও এখানেই আসছে,' কণ্ঠস্বরে একটু আপসোস, একটু আশঙ্কা ফুটিয়ে তিনি বললেন। সভাপতি তাঁর কথায় নজরই দিলেন না। তিনি তখনো অল্পবয়সী উপদেষ্টাকে নিয়ে ব্যস্ত।

'না বলছো তুমি? কিন্তু সেরকম খবরই তো তুমি বললে?'

'অর্থ ধরলে অবিশ্যি তাই দাঁড়ায়। কিন্তু একটু সাবধানতার সঙ্গে কথাগুলো বলতে চাই আমি।'

'তোমার ইচ্ছাটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু খুব বেশি লোক এটা পছন্দ করবে না।' সভাপতি বললেন।

'আমার পক্ষে একটু সাবধানতার সঙ্গেই তাঁর কথাগুলো বলা উচিত। তাঁর মত হচ্ছে, কিছু লোক নিজেদের পদস্থতা এবং রক্তপিপাসার জন্য মনে-প্রাণে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যু কামনা করে।'

'তাই বলেছে! রক্তপিপাসা!'

'হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি তাই।'

'আপনি শুনেছেন?' আইন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলেন তিনি। অধ্যক্ষ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ঠিক বলেনি ওকথা, তবে তাই বোঝাতে চায়।'

'আপনি তাকে বাধা দিলেন না?'

'তার সুযোগ ছিলো না,' অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করলেন, 'তার অন্তত পনেরো মিনিট বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পরে আমি ওখানে যাই এবং সঠিকভাবেই আমার মনে হলো, বলে যা ক্ষতি ও করতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হতো ওকে তখন বাধা দিলে। ব্যাপারটা আমাদের বিবেচনা করা দরকার,

কারণ আমার ধারণা ও বেশ শক্তিশালী এখন। ও বেশ ধড়িবাজ, সে গুণটি ওর আছে।'

'ওটা ওর জাতের গুণ। ধড়িবাজী করেই বেঁচে আছে জাতটা। আপনি যতটা বলেন ততটা শক্তিশালী বলে আমার মনে হচ্ছে না ওকে। সব লোকদের নামে ও কুৎসা রটাচ্ছে, তার জন্য ওকে শাস্তি পেতেই হবে। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি।'

'কিন্তু আপনার চেয়ে কমবয়েসী অনেকেরই এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা নেই।'

'তা হতে পারে। তবু ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত আমার। আমার শক্তিক্ষয় হলে সে শক্তি আর ফিরে পাবো না। সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে আমার, মৃত্যু আমার দোরগোড়ায়। তবু আমি পাশ কাটিয়ে যাইনি। জনগণের সেবার জন্য যখনই ডাক পড়েছে তখনই এগিয়ে এসেছি আমি। আমি কখনো বলিনি ইতালীয়রা খারাপ। লাটিনদের সম্বন্ধে আমি কি কোন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করি? কেউ কেউ বলে, ইহুদিদের প্রতি আমার মনোভাব ভালো নয়। কিন্তু তা নয়, তা নয়।' বার বার কথাটি বললেন তিনি, 'আমার পূর্বপুরুষেরা এই দেশে এক শক্তিশালী জাতির পত্তন করেছিলেন, তাঁদের চোখ ছিলো স্বচ্ছ, তাঁরা দেখতে ছিলেন সুশ্রী। তখন সাক্কো বা ভাঞ্জেত্তি বলে কোন নামই আমাদের জানা ছিলো না। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিলো অসংখ্য লজ্ আর ক্যাবট্, ক্রুস্ আর উইনথ্রপ্, বাট্‌লার, প্রোক্টর আর ইমার্সন। কিন্তু আজ যখন তাকাই চার-পাশে, কোথায় সেই জাতি? তবু কাজ করতে গিয়ে এ সব কথা মনেও আনিনি আমি। এই মামলার ফলে মানুষের মুখে মুখে বেশ্যার নামের মতো আমার দেশের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সেই মামলার তদন্তে সাহায্য করার জন্য যখন এই প্রাচীন কমনওয়েলথের প্রধান আমাকে বললেন, আমি আপত্তি করিনি। আমি সে কাজ গ্রহণ করলাম, সমস্ত ঘটনা পরীক্ষা করলাম, খাঁটি আর ভেজাল ঝাড়াই বাছাই করলাম। তারপর—'

আইনের অধ্যাপক ঠিক এই মুহূর্তে এ ঘরে প্রবেশ করলেন, ফলে সভাপতির বক্তৃতা বাধা পেলো। আর এই মুহূর্তে আইন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

এবং উপদেষ্টার মনে হলো, এই আইনের অধ্যাপক সত্য সত্যই দুঃসাহসের সঙ্গে এমন সব কাজ করতে যান, যা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কি দেবদূতেরাও করতে ভয় পান। বিশ্রী চেহারার এই মানুষটি চোখ পিটপিট করতে করতে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

'আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?'

সভাপতির মনে হলো যেন তিনি কেঁপে উঠলেন একটু; ভাবলেন, "এটা বয়সের কাঁপন, রাগের নয়।" তারপর জোরের সঙ্গেই বললেন, 'আমি শুনলাম, আজকের বক্তৃতায় আপনি এমন অনেক কথাই বলেছেন যার জন্য যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অনুশোচনা হওয়া উচিত।'

অধ্যাপক শান্তভাবে বললেন, 'খুব তাড়াতাড়িই আপনি খবর পেয়েছেন, দেখছি। কিন্তু আমি এমন কিছু তো বলিনি যার জন্য আমার অনুতাপ হওয়া উচিত। আর নিজেকে খুব বোকা বলেও মনে করি না আমি।'

'আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন।'

'আমি অনেক ভেবেছি, গভীরভাবে ভেবেছি। কত সময় যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভেবেছি আমি, তার হিসাব নেই। এবং তারপরে সিদ্ধান্ত করেছি, যা বলার, তা বলতেই হবে।'

মেপে মেপে তিনি কথাগুলো বললেন, বিদেশী উচ্চারণভঙ্গী ছাড়াও আরও কিছু যেন ছিলো তাঁর কণ্ঠস্বরে। তাঁর কথার গঠনভঙ্গী থেকেই তাঁকে বিদেশী বলে চেনা যাচ্ছিলো। শব্দোচ্চারণেরও একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিলো তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এ সবই জানতেন। তবু এর ফলেই বিরক্তিতে তাঁর মন ভরে গেলো, এর জন্যই যেন তিনি অন্য সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি এবং তদন্ত কমিটির অন্যান্য সভ্যরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার জন্য কিছুদিন পর্যন্ত সাফল্য এবং শক্তির এক আরামদায়ক অনুভূতিতে তাঁর মন ভরে আছে। এই মামলার বিচারক বলেছেন, "ওই বেজন্মা বিপ্লবীদের যা পাওনা আমি তাই দিয়েছি ওদের।" সভাপতি নিজে নিশ্চয়ই কোনদিন এমন বোকার মতো বিশ্রী ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করবেন না। তবু যেন বিচারকের মতো একই অনুভূতি ছড়িয়ে আছে তাঁর মনেও। কিন্তু আজ সকালে যেন তাঁর সাফল্য-

বোধ একটু একটু করে উবে যাচ্ছিলো এবং যখন তিনি অধ্যাপকের ভয়ঙ্কর বক্তৃতার কথা শুনলেন তখন আর সেই সাফল্যবোধের একটুও অবশিষ্ট রইলো না।

তিনি ভাবছিলেন, অধ্যাপক এমন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, কী অর্থ এ কথার? ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা, যাঁদের অনেকেই তাঁর মতোই বোস্টন শহরে প্রতিষ্ঠাবান, তাঁরা কি ওঁর মতকেই সমর্থন করেন? তা কি হতে পারে?

'আপনার আত্মবিশ্বাস বড় বেশি,' সভাপতি ঠাণ্ডা গলায় বললেন।

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।'

'আর তার জন্যই কি আপনি মনে করেন, এই দুটি মানুষের মৃত্যু কামনা করার সমস্ত দোষ জনসাধারণের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার জন্মেছে আপনার?'

'জনসাধারণ নয়, সমাজের উঁচুতলার দু-একজন মানুষ ওদের মৃত্যু চায়। সমস্ত পৃথিবী এ কথা জানে। আমি এ কথা বলেছি, এবং তা বলার জন্য আমার এতটুকুও অনুতাপ নেই।'

'আপনি আমাকে অপরাধী বলছেন?'

'না, আপনার নাম কখনও করিনি আমি। আপনিই নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। আমি জানি, আপনার মনে আঘাত লাগছে, কিন্তু এই দুটি মানুষ আজ রাত্রে মরতে যাচ্ছে। আপনি কবার মরেছেন জীবনে?'

'আপনি অসহ্য হয়ে উঠছেন।'

'তাই নাকি? ওদের পক্ষের উকিলও বুঝি অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন? তিনি তো আমার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলেছেন। তাঁর সওয়াল আমি একবার মাত্র পড়েছি, কিন্তু ভুলতে পারিনি। উপসংহারে কী বলেছিলেন তিনি? "যদি ওদের প্রতি সুবিচার করতে না পারেন আপনারা তবে যা কিছু পবিত্র তার নামে ওদের মার্জনা করুন। খৃস্টানেরা যে ভগবানে বিশ্বাসী তিনি দয়ালু, ক্ষমাশীল। আর আপনারা সেই ভগবানের আসনে বসে আছেন মানুষের জীবন নেওয়ার জন্য।" তিনি কি এই কথা বলেননি, এমনি কোন কথা? এ তো কেবল গতকালের ঘটনা। আমি কি ভুলবো, আপনারা জল্লাদের মতো কাজ করে আনন্দ পেয়েছিলেন?'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির মনে ক্রোধ মিলিয়ে গেলো, তার বদলে এলো ভয়। তাঁর কানের মধ্যে বোঁ বোঁ করতে লাগলো এবং মনে হলো, যাঁর কথা অধ্যাপক এইমাত্র বললেন, সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির পক্ষের সেই উকিল যেন আবার এসে দাঁড়িয়েছেন ওঁর সামনে।

কদিন আগে এই উকিল শেষবারের মতো সওয়াল করতে এসেছিলেন তাঁর কাছে, এসে দাঁড়িয়েছিলেন এখন যেমন ইহুদিটা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছেন কেন?'

উকিল জবাব দিয়েছিলেন, 'বসে বসে সওয়াল করতে পারি না আমি। বসে বসে মামলা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এত সাক্ষ্যপ্রমাণের পরেও যদি আপনারা পুনর্বিচার না করতে পারেন, তবে ওদের মার্জনা করুন। ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যে যদি এমন একজন বিচারক নিযুক্ত হন যিনি আসামীদের বলেন "বেজম্মা বিপ্লবী", বলেন কি করে তাদের পাকড়াবেন এবং গর্বিত হয়ে ওঠেন তাদের কী পরিণতি তিনি করবেন তাই ভেবে, তবে তার জন্য এই মানুষ দুটিকে দোষ দিতে পারেন না আপনি। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি ওকে নিযুক্ত করেনি, আর ম্যাসাচুসেট্‌সের কর্তৃপক্ষ যদি ওকে বরদাস্ত করে, তবে তার জন্য ওদের কোন দোষ থাকতে পারে না।

'বিচারকদের ওপরে ন্যস্ত ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য এই রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত যদি বলে, কোন বিচারকের রায় পরিবর্তন করা যায় না, কারণ তা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে, তবে রাজ্য সরকারের উচিত ওদের মার্জনা করা। কারণ ওদের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছে, তা ভাবতেও প্রত্যেকটি নাগরিক লজ্জিত বোধ করবে। এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, এ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যদি কোন রকমে এ সত্যকে অস্বীকার পেতে চেষ্টা করি, যদি অপব্যাখ্যা করি এর, যদি একে অবদমিত করতে চাই, তবে লাভ হবে না কিছু। সমস্ত পৃথিবীময় প্রত্যেকটি মানুষ এ মামলার সব খবর রাখে। ইউরোপের সমস্ত ভাষায় এই মামলার বিবরণ অনূদিত হয়েছে। যেমন জার্মানীতে তেমনি ফ্রান্সে সবাই এ মামলার সঙ্গে পরিচিত। বিরোধিতার একটা কঠিন দেওয়াল গড়ে উঠেছে

আমাদের সামনে।

'ম্যাসাচুসেট্সের ক্ষমতাশালী লোকেরা, যাঁরা আদালতকে সম্মান করেন, তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থা হয়ে পড়েছে, যাতে এই ঘটনার একটা ব্যাখ্যা আমাদের করা উচিত, যদিও মানুষ তা গ্রহণ করবে না এবং এর ফলে সত্যি সত্যিই মনে হবে আমাদের বিচার স্যায়বিচার হয়নি। নইলে সোজাসুজি এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এ মামলা অন্যায়ভাবে পরিচালিত হয়েছে, গোড়াতেই এমন একটা সন্দেহের অবকাশ ছিলো যা ক্রমশ বাড়ছেই। সন্দেহের নিরসন করতে পারেননি বিচারক। ফলে বিচার হয়েছে ভুল, হয়েছে অন্যায়। সুতরাং দোষী বলুন আর নির্দোষ বলুন, কিংবা পাঁচ বছর বাদে ওদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে, এ কথা আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, গবর্নরের উচিত ওদের মার্জনা করা। বিচারে অনেক সময় লাগলো, তার মধ্যে এ সমস্ত যুক্তিই শোনানো হয়েছে। আদালতের কাজ এতদিনে শেষ হয়েছে, আর এই তার ফল!

'এ মামলায় আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমার পক্ষে যা সম্ভব সবই আমি করেছি। সাধারণ স্যায়বিচার লাভের আশায় আমি বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রম করেছি। যদি স্যায়বিচার না হয়, আমি হতাশ হবো না, দুঃখিত হবো। আমার ক্ষমতায় যা সম্ভব তা আমি করেছি। এখন ঘটনার স্রোতকে সংযত করার জন্য আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করুন। নইলে এই ঘটনা এ দেশের ইতিহাসের একটা লজ্জাজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।'

'আপনি বসুন,' সভাপতি তাঁকে বলেছিলেন, এ ছাড়া আর কিছু বলার কথা ভাবতেও পারেননি তখন। যে কথাগুলো এখন তাঁর মনে নিষ্ঠুরভাবে বিঁধছে, তখন তা যেন ভালো করে শোনেনওনি। সাকো আর ভাঞ্জেত্তির উকিল বক্তব্য শেষ করে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেমন এই মুহূর্তে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে। সভাপতি অনেক কিছু ভাবতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু চিন্তা দানা বাঁধলো না। ভাবলেন বলবেন, "আপনাকে আমার পদত্যাগ করতে বলা দরকার।" কিন্তু বলতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

অধ্যাপক বললেন, 'আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তবু মৃত্যুকে ভালবাসেন। এই বৃদ্ধ বয়সে জল্লাদের কাজ করলেন আপনি।'

'এ কথা বলার দুঃসাহস হলো আপনার?'

উপদেষ্টা আতঙ্কিত নীরবতায় সব দেখছিলেন শুনছিলেন, কিন্তু আইন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বলে ফেললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'না, তা নয়। মোটেই না। কিন্তু আমাকে কেন ডেকেছেন আপনি?'

অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ সেই বৃদ্ধ তাঁর সই করা দলিলখানা আবার স্মরণ করলেন। মনে মনে পড়লেন সেখানা, তারপর যেন কম্পিত হস্তে সইও করলেন আরেকবার। যা বলেছিলেন তখন, তার প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনে পড়তে লাগলো: "ঘটনাস্থল থেকে ভাঞ্জেত্তির দূরে থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ একান্ত দুর্বল। জেরার সময়ে রোজেন নামে সাক্ষী যে আগে মিথ্যা কথা বলেছিলো, তাই মনে হয়েছে কমিটির। আরেকজন সাক্ষী মিসেস ব্রিনি বলেছে, ব্রিজওয়াটারের ঘটনাস্থল থেকে ভাঞ্জেত্তি দূরে ছিলো। আর দুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার আগে ঘটনার তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলো না। এমতাবস্থায়, ভাঞ্জেত্তি যদি সাকোর সঙ্গে অথবা দস্যুদের গাড়িতে থেকে থাকে কিংবা সারাদিন দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে কাটিয়ে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই অপরাধী। কারণ যদি সে কোন নির্দোষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে থেকে থাকে, তবে শপথ করে কেন বলবে যে সে সারাদিন প্লাইমাউথে ছিলো? চারজন লোক ওদের সেখানে দেখেছে। ডলবিয়ার বলেছে, দক্ষিণ ব্রেনট্রির প্রধান রাস্তায় একখানা গাড়িতে সেদিন সকালে ওকে সে দেখেছে। লেভাঙ্গি বলেছে, ওকে সে গুলি চালানোর পরে গাড়িটা চালিয়ে যেতে দেখেছে। অস্টিন রীড বলেছে, ম্যাট্ফিল্ডে রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে ভাঞ্জেত্তি ওকে নাকি গালাগাল করেছিলো। এই চারজনের মধ্যে শেষ সাক্ষী হচ্ছে ফক্‌নার। সে বলেছে, ঘটনার দিন দুপুরের আগে প্লাইমাউথ থেকে দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে আসার সময় রেলগাড়িতে ভাঞ্জেত্তি তাকে একটা প্রশ্ন করেছিলো এবং সে ওকে স্টেশনে নেমে যেতে দেখেছিলো। ফক্‌নারের সাক্ষ্য দুই কারণে অবিশ্বাস্য। প্রথমত, সে বলে-ছিলো, গাড়িখানার যে কামরায় ওরা ছিলো সেখানা স্মোকিং এবং লাগেজ

কামরা। কিন্তু ওই গাড়িতে এ রকম কামরা একখানাও ছিলো না। অথচ কামরাখানার ভিতরের যে বর্ণনা সে দিয়েছে, তাতে মনে হয় ওটা পুরোপুরিই স্মোকিং কামরা। দ্বিতীয়ত, সেদিন সকালে প্লাইমাউথে বা তার কাছাকাছি কোন স্টেশনে এ রকম কোন টিকেট বিক্রি করা হয়নি। কিন্তু এতেই সমস্ত সম্ভাব্যতা শেষ হয়ে যায় না। যাদের কথা বললাম তারা ছাড়া আর কেউই ওকে কিংবা ওর মতো দেখতে অন্য কাউকে দেখেছে বলে দাবি করেনি। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে ভাঞ্জেত্তির মুখ দেখতে খানিকটা অস্বাভাবিক রকমের এবং সেইজন্যই স্মরণ রাখা সহজ, অন্তত সাক্কোর মুখ মনে রাখার চেয়ে। মোটের উপরে ভাঞ্জেত্তির অপরাধ সম্পর্কেও আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ।

"এ রকম যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের অপরাধ শুধু পেশাদারদের পক্ষেই করা সম্ভব। এজন্য কুখ্যাত অপরাধীর দল খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু কমিটির মনে হয়েছে, এই ঘটনা এবং ব্রিজওয়াটারের ঘটনায় পেশাদার-দের হাত ছিলো না; এ ঘটনা দুটির অপরাধীরা অনভিজ্ঞ।"

কমিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করার পরে সভাপতি এই ভাষায় ঘটনা বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য করেছিলেন। এই বিবৃতি তিনি সই করেছিলেন, কোন বিচারক যেমন মৃত্যুপরোয়ানা সই করেন। কিন্তু এত গভীর নিশ্চয়তার সঙ্গে ওদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে আজ কেন তিনি ভীত হয়ে পড়ছেন?

অধ্যাপক আবার বললেন, 'আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? তিরস্কার করার জন্য? আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য? পদত্যাগ আমি করবো না। ইহুদি নির্যাতনের জন্য? নির্যাতন আমি সইবো না।'

'আপনি অসহ্য হয়ে উঠেছেন। বেরিয়ে যান এখান থেকে।' সভাপতি চিৎকার করে উঠলেন।

'আপনি এখন বৃদ্ধ। কিন্তু সাক্কোর বয়স ছত্রিশ আর ভাঞ্জেত্তির চল্লিশ হয়নি এখনো। আর আপনাকে ঘিরে রয়েছে মৃত্যু,—মৃত্যু আর ঘৃণা।' এই বলে অধ্যাপক ঘুরে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর পশ্চাতে ঘরখানা নিথর নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রইলো। শুধু বুড়ো মানুষটি কাঁপছেন থরথর করে। তাঁর ধন-মান যশ যেন নিঃশেষ হয়ে আজ

তিনি দেউলিয়া হয়ে গেছেন; মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা এবং ভীতিবোধ তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অধ্যাপকেরও জয় হলো বলা চলে না। আজ তাঁর অনেক শক্তি, তাই যা বলার তিনি বলে যেতে পারলেন। ন্যায়ের বর্মে আচ্ছাদিত তিনি। কিন্তু তবু কি অনেক কিছু করার এবং বলার বাকি রইলো না? তিনি কি স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারছিলেন, কেন এই মানুষ দুটিকে আজ মরতে হবে? অথবা তা কি এমন কিছু, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে যার মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন?

ছয়

বেলা এগারোটায় চার্লস্‌টন্‌ বন্দীশালায় সৈন্যদলের আমদানি শুরু হলো। দেখে মনে হলো যেন কোথাও ছোটখাটো একটা যুদ্ধ লেগেছে এবং শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই সৈন্যদলকে পাঠানো হচ্ছে। গাড়িতে গাড়িতে রয়েছে সশস্ত্র সৈনিক, মোটর সাইকেলের পাশগাড়িতে টমিগান হাতে সৈন্যরা যাচ্ছে আর তাদের সঙ্গে একখানা ট্রাকে রয়েছে একটা সন্ধানী আলো। সেটা রাত্রির কুয়াশা ভেদ করে তিন মাইল পর্যন্ত আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে এই মিছিল এসে থামলো বন্দীশালার সামনে। ওয়ার্ডেন আগেই খবর পেয়েছিলেন, হাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে বলে সৈন্যদল পাঠানো হচ্ছে। তিনি বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন সবাইকে।

রাজ্য পুলিসের বড়কর্তা যখন ওয়ার্ডেনকে ফোন করে বললেন, গভর্নরের আদেশে তিনি আরো সৈন্য বন্দীশালায় পাঠাচ্ছেন, তখন বিরক্ত হয়ে ওয়ার্ডেন প্রায় ঝগড়াই করেছিলেন তাঁর সঙ্গে।

'কী হাঙ্গামার আশঙ্কা করছেন আপনারা?' ওয়ার্ডেন জানতে চেয়েছিলেন।

ওরা সে কথার জবাব দেয়নি। কী ধরনের হাঙ্গামা হতে পারে, তা ওদেরও জানার পথ ছিলো না। শুধু মনে হয়েছিলো একটা হাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে এবং সে জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার।

'আপনারা যদি সে রকম মনে করেন, তবে তার কিছু কারণ হয়তো আছে।' ওয়ার্ডেন পুলিসের বড়কর্তাকে বললেন। তিনি ভাবলেন, হাঙ্গামা অনেকই হয়েছে এবং আজকের এই বিশ্রী দিনটি শেষ হওয়ার আগে আরও অনেক হবে, কিন্তু ও রকম হাঙ্গামা নয়। ওয়ার্ডেন ভাবলেন, ওরা কী ভাবছে? ওরা কী মনে করে বন্দীশালার দেয়াল ফুঁড়ে একদল সৈন্য বেরিয়ে এসে এই দুজন বিপ্লবীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? মনে মনে তিনি সাকো আর ভাঞ্জেত্তির জীবন রক্ষা করতে চান। তাঁর বিশ্বাস হয়েছে, বাইরের মানুষ যা জানে না, সে রকম অনেক কিছু তিনি জানেন এই দুটি মানুষ সম্পর্কে। তিনি জানেন, এরা দুজন কত নম্র। একমাত্র বন্দীশালার মধ্যে থেকেই এ কথা জানা যায়। ওয়ার্ডেনের আজ মনে পড়ছে, কত দীর্ঘদিন ধরে তিনি একটু একটু করে বুঝতে শিখেছেন, যাদের বাইরের পৃথিবীর লোকেরা একবাক্যে ভয়ঙ্কর বলে, তাদের অনেকেই কত শান্ত, কত নম্র!

ওয়ার্ডেন এই সৈন্যদলের নেতা রাজ্য পুলিসের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করতে বাইরে এলেন এবং বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ক্যাপ্টেন তাঁর নিজের ইচ্ছামতো বন্দীশালার যেখানে সেখানে সৈন্যদের মোতায়েন করতে পারেন।

'আপনি কী ধরনের হাঙ্গামার আশঙ্কা করেন?' ক্যাপ্টেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কোন হাঙ্গামারই আশঙ্কা করি না, অন্তত আপনারা যে রকম ভাবছেন সে রকম তো নয়ই।' ওয়ার্ডেন ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন।

তারপর তিনি আপিসে চলে এলেন। ক্যাপ্টেন তাঁর এক লেফটেনান্টকে তখন বলছেন, 'ওর মাথায় কী যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, ও যদি পারতো তবে আমাদের মাথা কেটে নিতো।'

ওয়ার্ডেন আপিসে ফিরে এলেন। তাঁর মুখ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো কালো, তারই মতো আশঙ্কায় থমথম করছে। তারা ভাবলো, ওঁর মনের ভাব পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ানকে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কিছু ব্যাপার আলোচনা করতেই হবে, তা ওয়ার্ডেনের মেজাজ ভালো থাকুক আর না থাকুক। ওয়ার্ডেনের মতোই

সেও এই দিনটিকে চায়নি কিন্তু বাধ্য হয়েছে এর মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে। সে ওয়ার্ডেনের আপিসে ঢুকে সোজাসুজি বলে ফেললো, এই বেলা সওয়া এগারোটা পর্যন্ত সে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরীক্ষা করতে পারেনি।

ওয়ার্ডেন বললেন, 'কেন পরীক্ষা করোনি এখনো?'

'পরীক্ষা করার আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়ার নির্দেশ পেয়েছিলাম আমি।' ইলেকট্রিসিয়ান কৈফিয়ত দিলো।

ওয়ার্ডেনের মনে পড়লো, এ নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। তিনি ভেবে-ছিলেন, একটু সদয় হবেন, কারণ বৈদ্যুতিক বাতিগুলোকে কেঁপে কেঁপে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে এবং পরমুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠতে দেখে বন্দীশালার লোকদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। যখন এ রকম হবে তখন বন্দীশালার সবাই বুঝতে পারবে, ইলেকট্রিক চেয়ার প্রস্তুত করা হচ্ছে, প্রাণ হরণের মহড়া দেওয়া হচ্ছে। হৃদয়বৃত্তিহীন নন বলেই ওয়ার্ডেন বুঝতেন, আজ বন্দীশালার সব বন্দীই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান ওই তিনটি মানুষের অনুভূতির অংশীদার। তারা ভয় আর অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রাণদণ্ডের মুহূর্তটির জন্য। এই বন্দীশালার মানুষগুলো সবাই মিলে যেন একটা দেহ, যখনই তার কোন অংশের মৃত্যু হয়, তখনই প্রত্যেকটি মানুষেরও যেন খানিক অপমৃত্যু ঘটে। যারা কোনদিন বন্দীশালায় আসেনি, সেখানে কাজ করেনি, কিংবা সেখানে থাকেনি, তারা এ কথা বুঝতে পারবে না। এ কথা তারা বিশ্বাসও করতে পারে না যে সাধারণ কয়েদীরা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের প্রতি এত সহানুভূতি পোষণ করতে পারে। তবু ওয়ার্ডেন জানতেন, বেদনার এই সহমর্মিতা কত সত্য। শত শত মানুষের মনে এই অনাবশ্যক বেদনাদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করতে তিনি চাননি এবং তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে এই মহড়ার ফলে কতখানি মানসিক যন্ত্রণ ভোগ করবে সাক্কো, ভাঞ্জেত্তি এবং মাদীরো। যে যাই করুক না কেন, এর মধ্যে ওরা বেশ কয়েকবার মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে। সে অবস্থায় এই ভীতিবো ওদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়াকে তাঁর মনে হলো নিষ্ঠুর বর্বরতা।

এই রকমের কিছু কথা ওয়ার্ডেন ইলেকট্রিসিয়ানকে বললেন। সে সা দিলো এতে, কিন্তু বললো, তার কিছু করার হাত নেই।

ইলেকট্রিসিয়ান বললো, 'বৈদ্যুতিক তারগুলোর এমন অবস্থা যাতে আপনি কখনো নিশ্চিত হতে পারবেন না ওর মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় শক্তির বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা সম্ভব হবে কি না। আপনাকে একটা কথা বলছি, মানুষ মারার এই পদ্ধতির চেয়ে আর কিছু খারাপ হতে পারে না। কেন যে ওরা উপায়টা উদ্ভাবন করলো, তা ভাবতেও আমার বুক কেঁপে ওঠে। একটা মানুষকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে তার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দেওয়ার কোন মানেই হয় না। যদি ওরা মনে করে এতে যন্ত্রণা হয় না, তবে আমি বলবো ওদের মাথা খারাপ। যদি একবার ব্যাপারটা দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন এটা কেমন যন্ত্রণাহীন! আমি আপনাকে বলছি, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি এই রকমে মরতে চাই, না ফাঁসি গিয়ে মরতে চাই, আমি বলবো ফাঁসিতে মরাই কাম্য। বলবো, আমাকে গুলি করে মারা হোক কিংবা যে কোন উপায়ে মারা হোক, তবু ইলেকট্রিক চেয়ারে যেন মরতে না হয় আমাকে।'

ওয়ার্ডেন বিরক্তি সহকারে বললেন, 'তোমার মতামত আমি শুনতে চাইনি। শুধু জিজ্ঞাসা করছি, ইলেকট্রিক চেয়ার পরীক্ষা করতে তোমার সারাটা দিন কেন লাগবে?'

ইলেকট্রিসিয়ান ব্যাখ্যা করে বললো, 'তার কারণ, ধরুন একজনকে চেয়ারটিতে বসিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা হলো, আর তখন হয়তো একটা তার পুড়ে গেলো কিংবা একটা ফিউজ নষ্ট হয়ে গেলো। বেশ চমৎকার একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তখন। চেয়ারের উপরে সে হতভাগাকে আরো দু ঘণ্টা চোখ বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে হবে, যতক্ষণ না সব গলতি সারিয়ে আবার তার প্রাণদণ্ড দেওয়া যায়।'

'আমরা সে রকম ঘটতে দিতে চাই না। তুমি নিশ্চয় জানো, এ আমি কখনো চাই না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় একবার পরীক্ষা করলেই কেন কাজ হবে না তোমার?'

ইলেকট্রিসিয়ান আবার ব্যাখ্যা করতে লাগলো, 'ওতে কাজ হয় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে কোথায় কোন খুঁত আছে, তারপর সেগুলোকে সারিয়ে নিতে হবে, যেন সন্ধ্যার পর আর কোথাও কোন খুঁত না থাকে।

তবে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলে আর কিছু গণ্ডগোল হবে না এবং বন্দীশালার আলোক ব্যবস্থাও ঠিক থাকবে।'

ওয়ার্ডেন বললেন, 'বেশ, তবে যাও। যা খুশি করো গিয়ে।'

ইলেকট্রিসিয়ান ঘাড় নেড়ে চলে গেলো। একটু পরেই নিজেদের কুঠুরিতে বসে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি দেখলো, আলোগুলো ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, দু-এক মুহূর্ত নিষ্প্রভ থেকে আবার জ্বলে উঠছে। দেখে দেখে ওদের সমস্ত শরীর কঠিন হয়ে উঠলো। বেঁচে থাকতে থাকতেই মৃত্যুর স্বাদ পেলো ওরা।

বন্দীশালার "মৃত্যু-সারি"তে তিনটি মাত্র কুঠুরি। কি কারণে জানা নেই, এই অংশের নাম ছিলো "চেরী পাহাড়"। এর নির্মাতারা কখনো ভাবেনি যে একই সময়ে তিনজনের বেশি লোক মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকতে পারে। তাই "মৃত্যু-সারি"তে ছিলো নিরানন্দ, বায়ুহীন, আলোহীন তিনটি কুঠুরি। সব কটি ঘর একই সারিতে, পাশাপাশি। বন্দীশালার অন্যান্য কুঠুরিগুলোর মতো সাধারণ পাল্লা লাগানো দরজার বদলে এই তিনটি কুঠুরিতে ছিলো ভারি কাঠের দরজা আর তার মধ্যে ছোট একটু জানলার মতো ফাঁক। তাই কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন ছিলো এই কুঠুরিগুলোর। যখন বন্দীশালার বৈদ্যুতিক তারগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছিলো, তখন এই কুঠুরিগুলো যেন ছোট হয়ে আসছে, যেন দু পাশের দেয়াল এসে মিশে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড গতিতে, আর সব মিলিয়ে নেমে আসছে একটা মন্থর ভয়ঙ্করতা।

নিজের বিছানার এক কোণে বসে নিকোলা সাক্কো এইসব দেখছিলো। হঠাৎ সে তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী, তীব্র একটা চিৎকার শুনতে পেলো, কেউ যেন অসহ্য বেদনায় পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠেছে। পাশেই মাদীরোর কুঠুরি থেকে এসেছে চিৎকারটা। আর্তনাদ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো, তারপর একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগলো, সাক্কোর মনে হলো তার সমস্ত জীবনে হতভাগ্য, নিঃসঙ্গ, ভয়ার্ত এই চুরির আসামীটির চিৎকারের মতো এত করুণ আর্তনাদ আর সে শোনেনি। কান খাড়া করে সে শুনতে পেলো, মাদীরো তার বিছানার ওপরে গিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে

শুরু করেছে। এ সব সাক্কোর অসহ্য মনে হলো। সে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে দরজার ফাঁকের কাছে এসে চিৎকার করে উঠলো, 'মাদীরো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

কান্নাভেজা গলায় মাদীরো বললো, 'শুনছি। কী বলছেন আপনি?'

'তোমায় একটু সান্ত্বনা দিতে চাই। বলছি, স্থির হও, বুক বাঁধো।' বললো বটে সাক্কো, কিন্তু সে নিজেই ভেবে পেলো না, তাদের তিনজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কী আছে, কিসের আশায় তারা বুক বাঁধবে। তার এই চিন্তারই যেন প্রতিধ্বনি করলো মাদীরো, 'কি ভেবে বুক বাঁধবো?'

'এখনো আশা আছে।'

'হয়তো আপনাদের আছে, মিঃ সাক্কো, হয়তো আপনাদের আশা আছে এখনো, কিন্তু আমার নেই। আমার মৃত্যু অবধারিত। পৃথিবীতে কিছুই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। খানিকক্ষণ বাদে আমার মৃত্যু অনিবার্য।'

'বাজে কথা বোলো না,' সাক্কো চিৎকার করে বললো। আরেকজনের ভয় ভাঙাতে হচ্ছে বলে তার নিজের একটু ভালো লাগছিলো। 'এ তো বাজে কথা, মাদীরো। আমাদের মৃত্যু না হলে তোমারও মৃত্যু হবে না। যতক্ষণ ওরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে ততক্ষণ তোমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলায় তুমিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। এবারে আমি যা বলছি তা ভেবে দেখো তো। আমরা তিনজন আজ এখানে কেন বলতে পারো? কারণ আমাদের ভাগ্য একই সুতোয় গাঁথা। এখনো কাঁদবার মতো কিছুই হয়নি।'

'মৃত্যুর জন্য কি কাঁদে না মানুষ?' বেদনাক্লিষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলো মাদীরো, যেমন শিশুরা কখনো কখনো অবশ্যম্ভাবী অথচ করুণ একেকটা প্রশ্ন করে বসে, যার জবাবটাও হয় তেমনি অবশ্যম্ভাবী, তেমনি করুণ।

'তুমি শুধু মৃত্যুর কথা বলছো। ওরা আলো নিয়ে খেলা করছে বলেই মৃত্যুর কথা বলার কিংবা ভাববার সময় এখন নয়। কী আসে যায় ওতে? কী আসে যায় যদি ওরা আলো নিয়ে খেলা করে? যদি ইচ্ছে হয় ওরা

সারাদিন ধরে আলোগুলো নেভাক আর জ্বালাক।'

'যে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে আমাদের মরতে হবে সেটাকে পরীক্ষা করছে ওরা।'

'উঃ, আবার সেই কথা, শুধু মৃত্যুর কথা! তুমি হতাশ হয়ে গেছো।' সাক্কো চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ, তাই। আমি হতাশ হয়ে গেছি। সব বৃথা হয়ে গেলো।'

'কী বৃথা হয়ে গেলো?'

'আমার জীবন। কোনদিনই কিছু হলো না আমার। জন্মের দিন থেকেই আমার সব ব্যর্থতা আর অন্যায়ে ভরাট হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমি তো তা করিনি। আপনি বুঝতে পারছেন? এর জন্য আমি দায়ী নই। অন্য কেউ, অন্য কোন শক্তি আমাকে অমন করে গড়ে তুলেছে। একবার মিঃ ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করেছিলাম আমি। তিনি আমায় বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কারা দায়ী এর জন্য। খুব মন দিয়ে আমি তাঁর কথা শুনেছিলাম। হয়তো খানিকটা বুঝতেও পেরেছিলাম, কিন্তু সব বুঝিনি। আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন, মিঃ সাক্কো?'

'বুঝতে পারছি, অবশ্যই বুঝছি।'

সাক্কো বললো, 'জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না, মাদীরো। আমি শপথ করে আজ এক গভীর সত্য তোমায় বলছি। জীবন ব্যর্থ হতে পারে না। জীবনে কিছু কিছু খারাপ কাজ করেছো বলে তোমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে এ কথা ভাবা তোমার অন্যায়। আমার ছোট্ট ছেলেটিকে কী করতাম আমি? সে যদি কোন খারাপ কাজ করতো, আমি কি তাকে একটা অন্ধকার ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতাম? না! আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম। তাকে দেখিয়ে দিতাম কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ। মাঝে মাঝে তফাতটা সে বুঝতেই পারতো না। ছোট্ট একটি ছেলে তো আর বড়দের মতো বুঝতে পারে না সব কিছু! তার বেলায় এটা সম্ভব হয়েছিলো কারণ তার বাপ ছিলো, তার বাপ তাকে সব বুঝিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মাদীরো, তোমার মতো আঠারো-উনিশ বছর বয়সে যদি কেউ খারাপ কাজ করে তবে ব্যাপার হয় অন্য রকম। তখন কেউ একটু সময় তোমার

সঙ্গে বসে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা তোমায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মাথা ঘামাবে না।'

সে শুনতে পেলো, মাদীরো আবার কাঁদতে শুরু করেছে। তখন সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মাদীরো, মাদীরো, তোমার দুঃখ যাতে বেড়ে যায় এমন কিছু আমি বলতে চাইনি। আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম, জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি তা কেন বিশ্বাস করি, সে কথা তুমি শুনতে চাও, মাদীরো?'

'হ্যাঁ, আপনি বলুন, মিঃ সাক্কো। কাঁদছি বলে আমি দুঃখিত। মাঝে মাঝে এমন সব ঘটে যা আমি রোধ করতে পারি না। আমি অজ্ঞান হতে চাই না, তবু মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কাঁদতে চাই না, তবু কাঁদতে বাধ্য হই।'

'আমি বুঝতে পারছি, মাদীরো,' সাক্কো শান্তকণ্ঠে বললো, 'আমি যা বলতে চাই, শোনো। পৃথিবীতে প্রতিটি জীবন প্রতিটি জীবনের সঙ্গে জড়িত, ঠিক যেন একটা অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা আমরা প্রত্যেকটি মানুষ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোতে যখন আমাদের বিচারকের নির্মমতা এবং সহানুভূতিহীনতার জন্য তার প্রতি তীব্র ঘৃণায় আমার অন্তর ভরে যায়, তখনো মনে মনে ভাবি যেন অন্যায়ভাবে ওকে ঘৃণা করি না আমি। সেও আমাদেরই মতো এই মনুষ্যজগতের একটি অংশ। শুধু তার অন্তর ঘৃণা আর অসুস্থ মনোভাবে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো, মাদীরো?'

'বুঝতে চেষ্টা করছি আমি, যদি না পারি, সে তো আপনার দোষ নয়।'

'কিন্তু জীবন ব্যর্থ হয় না।' দৃঢ়তার সঙ্গে সাক্কো বললো। তারপর আরো উঁচু গলায় ভাঞ্জেত্তিকে ডেকে সে তার সমর্থন চাইলো, 'বার্তোলোমিউ! আমার কথা শুনছিলে তুমি, বার্তোলোমিউ?'

'হ্যাঁ, শুনছিলাম।' বার্তোলোমিউ বললো। তার কুঠুরির দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে, অশ্রুধারা নেমে এসেছে তার দুই গাল বেয়ে।

'জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না, এ কথা মাদীরোকে ঠিক বলিনি আমি?'

ভাঞ্জেত্তি জবাব দিলো, 'তুমি ঠিকই বলেছো, নিক। তুমি সবই ঠিক বলো, তোমার অসীম জ্ঞান। ও যখন যা বলে ওর কথা শুনো মাদীরো, ওর অসীম জ্ঞান, অশেষ দয়া।'

এই সময়ে বন্দীশালায় দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বেজে উঠলো। এখন উনিশশো সাতাশের বাইশে আগস্ট বেলা বারোটা, ঠিক দুপুর।

সাত

সময়ের পার্থক্য পরিমাপ করলে ম্যাসাচুসেট্স কমনওয়েলথের বোস্টন নগরীর দুপুরবেলা ইতালীতে রোমের ছ ঘণ্টা পিছনে পড়ে থাকবে। যুক্ত-রাষ্ট্রের পূর্ব সমুদ্রোপকূলে যখন বেলা বারোটা, তখন রোমের সুন্দর পুরাতন ধ্বংসাবশেষ, মনোরম খোলা মাঠ, আর দৈন্যময় গলিঘুঁজির উপরে অপরাহ্নের শেষ আলো নেমে আসছে।

এই সময়ে ডিক্টেটর ডিনারের পোশাক পরার আগে তাঁর বৈকালিক ব্যায়াম করেন। আজ তিনি হালকা গ্লোভস্ পরে বক্সিং করলেন। এই ব্যায়াম দৈনন্দিন ব্যাপার নয়, রোজকার ব্যায়াম এক রকমও হয় না। কোনদিন তিনি দড়ি নিয়ে স্কিপিং করেন, কোনদিন বক্সিং, আবার কখনো কখনো প্রাচীন রোমান ঢাল আর ছোট তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধও করেন। দৈহিক সামর্থ্যের জন্য তিনি গর্বিত। "আমেরিকান কায়দায়" বক্সিং করার সময়ে তিন তাঁর বিপক্ষকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেন, এতটুকু দয়ামায়া দেখান না। যোদ্ধা হিসাবে সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, দুর্ভাগা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নীরবে সব মার সহ্য করতে হয়। সে ভাবে, শাসনকর্তার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির একটা সীমা থাকা উচিত। অথচ ডিক্টেটর বক্সিংয়ের দৈহিক সংযোগ আর মাংসের উপরে চামড়ার কঠিন স্পর্শ থেকে একটা জয় এবং সাফল্যের আনন্দ অনুভব করেন।

প্রায়ই দশ মিনিটকাল তিনি তীব্র গতিতে এক জায়গায় দাঁড় করানো একটা সাইকেল চালান, পাঁচ মিনিট দাঁড় টানেন একখানা আটকে রাখা নৌকোর কাঠামোয় বসে, দশ মিমিট বক্সিং করেন দুজনের সঙ্গে, তারপর

বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের সূচিধারায় স্নান করে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন।

অন্যদিনের মতো অনাবৃত অবস্থায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গভীর নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি যোদ্ধার মতো লাফিয়ে বেরিয়ে আসেন জলধারার নিচ থেকে। তখন তিনজন ভৃত্য তাঁর গায়ের চামড়া মর্দন করে দেয়, তোয়ালে দিয়ে মুছে দেয় শরীরটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এইসব করান তিনি, কারণ নিজের বক্ষস্ফীতি লক্ষ্য করতে এবং মাংসল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আর স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল চামড়া দেখতে বড় ভালো লাগে তাঁর। এর পরে প্রায়ই তিনি অঙ্গ সংবাহন করেন। টেবিলের উপরে শুয়ে শুয়ে সংবাহকের দক্ষ আঙুলগুলো দেহের সমস্ত মাংসপেশীর উপরে সঞ্চালিত হওয়ার অনুভূতি একটা গভীর জৈবিক আনন্দ ছড়িয়ে দেয় তাঁর চেতনায়। আর এই মুহূর্তগুলোতে নিজেকে সংবাহকের হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে নিজের উলঙ্গতার জন্যই বেশ খানিকটা উত্তেজিত বোধ করেন তিনি। উলঙ্গ, অরক্ষিত অবস্থায় শিথিল হয়ে তিনি পড়ে থাকেন টেবিলের উপরে, আর তখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতিতে রক্তপ্রবাহ বইতে থাকে, নতুন জীবন পেয়ে ঝলমল করে ওঠে গায়ের চামড়া।

এই মুহূর্তগুলো তীব্র ইন্দ্রিয়াসক্তি জাগায় এবং প্রায়ই এই সময়ে তিনি ভাবেন ডিনারের আগে বাকি সময়টুকুর মধ্যে কি আনন্দ তিনি উপভোগ করতে পারেন। উপভোগে তাঁর বাধা নেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে তিনি বলতেন, নারী সম্ভোগের আনন্দ বিকালবেলা সান্ধ্য আহারের আগে যেমন গভীর, যেমন মধুর হয়, তেমনটি আর কখনো হয় না। আজ এইসব ভাবতে ভাবতে মনের এক নিভৃত কোণে অনেক ছবি আঁকলেন তিনি। মনের এই কোণটি তিনি সযত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছেন তাঁর এই ধরনের চিন্তা, এইসব আমোদের জন্য। আজ তিনি পূর্ণ সংবাহন করালেন। একটা অতিকায় বিড়ালের মতো তিনি শুয়ে রইলেন, তাঁর গায়ে তেল ঢেলে ঢেলে সংবাহন করে যেন সারাদিনের ক্লান্তিকে দূর করে দিলো সংবাহক। এ যেন স্বাভাবিক যে এই সময়ে তিনি একটু প্রেম, একটু আমোদের পরিকল্পনা করবেন, আবার তার সঙ্গে ভাববেন রাজ্যসংক্রান্ত দু-একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও। তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন শুধু দৈহিক সংবাহনের জন্যই

নয়, উত্তেজনাময় চিন্তাগুলোর জন্যও যথেষ্ট উজ্জীবিত বোধ করলেন তিনি, নতুন ঔৎসুক্য নিয়ে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তলপেটের উপরে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন, আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের কোন লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে কি না।

বার্ধক্যকে তিনি ভয় করেন, ঠিক যেমন ভয় করেন মৃত্যুকে। যখনই বার্ধক্য অথবা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে তাঁর, তখনই ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যায়। ইদানীং এই অস্বস্তিকর ব্যাপার দুটি সম্পর্কে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবছেন তিনি। তাঁর নিজের জীবন বা পদস্থতার জন্য এত ভাবনার প্রয়োজন নেই।

পরিস্থিতি মোটামুটি ভালোই, কারণ তাঁর মনে হয় অবস্থা এর চেয়ে ভালো কখনো ছিলো না। প্রতিরোধকারীদের শেষ ঘাঁটিগুলোও চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়ে গেছে। সাম্যবাদের বিপদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে। কিছুদিন আগে একদিন তিনি গর্বিতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ব্যালকনিতে, নিচে তখন শত সহস্র মানুষের এক সমুদ্র একই সুরে গর্জন করে উঠছে তাঁকে অভিনন্দিত করে, 'দ্যুচে! দ্যুচে! দ্যুচে!'

ওদের জন্য কী করেছেন তিনি তাই বললেন। বললেন, অবিশ্বাসের ড্রাগনকে যেমন হত্যা করেছিলেন পুরাকালের মহাবীরেরা, ঠিক তেমনি তিনিও ভগবানে অবিশ্বাসী সাম্যবাদের ভয়ঙ্কর দৈত্যকে হত্যা করেছেন। ইতালীতে সাম্যবাদের মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত দেশে এখন শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। ফ্যাসিবাদের হাজার বছর পরমায়ু এখন নিশ্চিত। এই হাজার বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীর ধনসম্পদ হবে তাদের, যারা বিশ্বস্ত, যারা অনুগত হয়ে চলবে।

এত বড় অভিনন্দন পেয়েছেন তিনি। চারপাশের সবাই তাঁর স্তোকবাক্যে মুখর। ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকার মতো দেশ যাদের তিনি ঈর্ষা করেন, শ্রদ্ধা করেন, তাদের কাছে তাঁর কূটনৈতিক মর্যাদা বেড়ে গেছে। নিজের দৈহিক শক্তি কমে না যাওয়ারও প্রমাণ পেয়েছেন তিনি। তবু কিছুদিন পর্যন্ত তিনি কেমন যেন দমে গেছেন। যেন খানিকটা চিন্তিত, শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অথচ এর কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

কদিন আগে ভিয়েনার বিখ্যাত একজন মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে ডিনার খেয়েছিলেন তিনি। এই পেশাটির উপরে তিনি গোপনে গোপনে প্রচুর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রাচীন রোম সম্রাটরা নিজেদের দেবত্ব এবং অমরত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন কি না।

মনস্তাত্ত্বিক বলেছিলেন, 'দেখুন, ব্যাপার দুটোকে আলাদা করে দেখা দরকার। দেবত্ব আর অমরত্ব এক জিনিস নয়। মাত্র আধুনিক কালে আমরা দেবতাদের অমর বলে মনে করছি। পুরাকালে বিশ্বাস ছিলো, কোন কোন দেবতা অনেক দীর্ঘদিন বাঁচতেন, আবার অনেকে মানুষের মতোই স্বল্পায়ু ছিলেন। পুরাকালে দেবতাদের অমর বলে আদৌ কল্পনা করা হতো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই অমরত্বের কথা তারা ভেবেও দেখেনি কখনো, কারণ আমাদের মতো ওদের অমর হওয়ার লোভ জাগেনি।'

ডিক্টেটর ভাবছিলেন, এ কথা সত্যি কিনা। প্রায়ই তিনি নিজেকে কল্পনা করতেন প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে। টাস্কানির এক ভাস্কর-সংঘ তাঁকে প্রাচীন রোমানদের তিনটি মূর্তি উপঢৌকন দিয়েছিলো। প্রত্যেকটি মূর্তির সঙ্গে তাঁর নিজের চেহারার এত মিল যে ওদের যে কেউ তাঁর যমজ ভাই হতে পারতো। আবার মাঝে মাঝে তিনি স্বপ্নে দেখতেন যেন তিনি দেবতা, আর তারপর এই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরেও কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নিজেকে দেবত্ব থেকে কিংবা দেবতাকে নিজের থেকে আলাদা ভাবতে পারতেন না। নিজের এই কল্পনাবিলাসিতার জন্য সহজে স্বচ্ছন্দভাবেই তিনি মনে মনে হাসতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয়ও ছিলো যে দর্শন বা বিজ্ঞান সমস্ত রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারেনি এখনো। খুব হালকা ঠাট্টার সুরে তিনি অস্ট্রীয় মনস্তাত্ত্বিককে এ কথা বললেন। তিনি জানতেন সব মানুষই মহাপুরুষদের নিয়ে আলোচনা করতে, বিশেষ করে তাঁদের সম্পর্কে গুজবে বিশ্বাস করতে ভালবাসে। তিনি চাইতেন না চারপাশের মানুষেরা তাঁর নিজের দেবত্ব সম্পর্কে কল্পনাবিলাসের কথা বলে বেড়াক। কিন্তু ডিক্টেটরের তুচ্ছতম ইচ্ছা সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন বলে

মনস্তাত্ত্বিক আন্দাজ করতে পারলেন তাঁর মনের কথা। আর তাই নিয়ে আলোচনা করে ডিক্টেটরকে বুঝিয়ে দিলেন যে জুলিয়াস্ সীজারের যে কোন বংশধরের চেয়ে দেবত্বে অধিকার তাঁর একটুও কম নয়।

মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে বলতে লাগলেন, 'দেহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। তাই তার অসীম রহস্যের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারিনি আমরা। দেহের গ্রন্থিগুলোর কথা ভাবুন, ওরা যদি ওদের নিজেদের রাসায়নিক ভাষায় কথা বলতে পারতো তবে কী যে রহস্য উদ্ঘাটিত হতো, তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। কে বলবে মনুষ্যদেহ শুধু ধূলি, ধূলিতে তার উৎপত্তি, ধূলিতে তার শেষ? মানুষ কেন মরে? এর জবাব আমরা শুধু আন্দাজই করতে পারি। বার্ধক্যই একটা গভীর রহস্য।'

'কিন্তু মরে তো সব মানুষই।' ডিক্টেটর এই বিষয়টিকে আঁকড়ে ধরে তর্ক শুরু করলেন যাতে মনস্তাত্ত্বিক এই ধারাতেই আলোচনা চালিয়ে যান।

মনস্তাত্ত্বিক ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তাই কি ঠিক? এ কথা কেমন করে জানব আমরা? সব মানুষের জন্মমৃত্যুর হিসাব কি আছে আমাদের? কথাটা ভেবে দেখুন। মনে করুন, কেউ একজন অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তি দিয়েই দেহ এবং আত্মার অমরত্ব লাভ করলেন, যাদুমন্ত্র দিয়ে নয়। তিনি দেখতে পাবেন, বছরের পর বছর কাটছে, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হচ্ছেন না। যখন সত্যি সত্যিই তাই হবে, তখন তাঁকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকলেও তাঁকে মৃত্যুর ভান করতে হবে, তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হবে স্থান থেকে স্থানান্তরে, আত্মহত্যা করার মতো অবস্থা হবে তাঁর। অনেক লোকের ভাগ্যে যে এরকম ঘটেনি তা কি করে জানবো আমরা? যদি এমন ঘটে থাকে, তবে এই রহস্যকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে গোপন রাখা হতো; কারণ যাদের আয়ু অল্প, যাদের মরতেই হবে, তারা এই অমর মানুষদের ধরে নির্দয়ভাবে হত্যা করবে ঠিক যেমন নেকড়ের দল হরিণকে টেনে হিঁচড়ে মেরে ফেলে।'

এই অদ্ভুত বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা ডিক্টেটর মন দিয়ে শুনলেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর ঔৎসুক্য, তাঁর গভীর মনোযোগকে তিনি গোপন রাখতে পারলেন না।

'কিন্তু শক্তিশালী মানুষেরা যদি অমরত্ব লাভ করে তবে তাদের তো আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না।'

মনস্তাত্ত্বিক নরম সুরে বললেন, 'কিন্তু ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কজন শক্তিশালী লোক জন্মগ্রহণ করেছেন ? যদি সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখি তবে বুঝতে পারবো এমন লোক এত কম জন্মেছে যাতে এ সত্যকে যাচাই করে দেখা সম্ভব নয়,—এমন লোক যিনি সেই নিঃসংশয় ক্ষমতার অধিকারী। লক্ষ লোকের মধ্যে অসীম শক্তি, জ্ঞান আর আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মাত্র একজনই সেই ক্ষমতা লাভ করতে পারেন।'

এই আলাপ আলোচনা ডিক্টেটরের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যি সত্যিই এক আশ্চর্যজনক এবং লাভজনক ঘটনা। সেই রাত্রে তিনি শিশুর মতো ঘুমিয়েছিলেন। মনে এতটুকু ভয় ছিলো না সেদিন, অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিলো না, ছিলো না ঘুমিয়ে পড়ার আগের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে মৃত্যু সম্পর্কে শীতল মানসিক ভীতি।

আজ ব্যায়াম, স্নান এবং সংবাহনের পর স্বচ্ছন্দ এবং উজ্জীবিত বোধ করার পরিবর্তে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি ভেবে পেলেন না, হঠাৎ কেন তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো। যখন পোশাক পরতে যাওয়ার আগে তিনি তোয়ালে দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত করলেন, তখনই তাঁর সেক্রেটারী এসে সে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে কিছু চিঠিপত্র। ডিক্টেটর যখন পোশাক পরবেন তখন রাজ্য পরিচালনার নানান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন তিনি।

ডিক্টেটর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আজ সব কাজ থাক। কাজ করার মতো মনের অবস্থা নেই আমার, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ?'

'অল্প কিছু কাজ আছে। কোন কাজ চাপা থাকতে পারে আজ, কিন্তু দু-একটা কাজে দেরি করা যাবে না।'

দুজনে পোশাক-পরার ঘরে এলেন। দুজন ভৃত্যের সাহায্যে পোশাক পরতে পরতে ডিক্টেটর প্রয়োজনীয় দু-একখানা কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"এ কাজ আজ না করলেও চলবে। নিশ্চয়ই চলবে। আমি যখন বিরক্ত হতে চাই না তখন এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ বিরক্ত করলে ভয়ানক রাগ হয় আমার। এই তো সেই মোটা শুয়োর গিনেটি রাস্তার গাড়ির কনসেসনের জন্য আবেদন করেছে। ওকে তো বলাই হয়েছে কত টাকা লাগবে। বেটা ভান করছে কোন খবর পায়নি বলে, যেন জানে না কত টাকা লাগবে। এ রকম ব্যাপারে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ওর দরখাস্ত ফেরত পাঠিয়ে ওকে বলে দাও, আমি ভয়ানক বিরক্ত হয়েছি ওর ওপরে; যদি সে আমার কথামতো না চলে তবে ওই দরখাস্ত ওকে দিয়ে আমি গিলিয়ে ছাড়বো।...ওলন্দাজ মন্ত্রী অপেক্ষা করুক। ওলন্দাজদের যত অসম্মান করতে পারবো, জার্মানদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ততই চরিতার্থ হবে।...সান্তানিকে আমি মনে করি একটা দস্যুদলের নেতা বলে। দশ লক্ষ লিরা না পেলে ওর সম্পর্কে কিছুই করবো না আমি। ওটা ওর আভিজাত্য লাভ করার মূল্য। তিরিশ দিনের মধ্যে টাকাটা না দিলে ওকে বিশ লক্ষ লিরা দিতে হবে।...এই আবার সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা। আচ্ছা, এর কি শেষ হবে না? মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি ছাড়া অন্য কিছু আমার কানে আসবে না? ওদের নাম শুনলেই এখন আমি অস্বস্তি বোধ করি। ও বেজন্মা কম্যুনিস্ট দুটো নরকে ভাজা ভাজা হয়ে মরুকগে। নাম দুটো আমি সহ্যই করতে পারি না। ওদের নামও যেন আর শুনতে না হয় আমাকে।'

তাঁর পোশাক পরা হয়ে গেলো। তাঁর সেক্রেটারী এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এবারে তিনি বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি জনসাধারণের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি মানুষ।'

'ওদের বলে দাও, ব্যাপারটা আমরা বিবেচনা করে দেখছি এবং ওই দুটো বেজন্মা কম্যুনিস্টের প্রতি ন্যায়তই যে নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে তার প্রতিকার করার জন্য আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয় তা আমরা করবো।'

ওরা দুজন হেঁটে আপিসের দিকে চললেন। পথে শ্রমমন্ত্রী ওদের সঙ্গ নিলেন। সেক্রেটারী এবং শ্রমমন্ত্রী দুজনেই ডিক্টেটরের খানিকটা পেছনে

যাচ্ছিলেন। তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে আর চোখের ইশারায় নিজেদের মনের ভাব আদানপ্রদান করছিলেন। ডিক্টেটর যখন আপিসে ঢুকলেন তখন চার পা পেছনে ছিলেন ওঁরা। যতক্ষণ তিনি নরম দামী কার্পেটের ওপর বিশটি পদক্ষেপ করে গিয়ে তাঁর আসনে না বসলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওঁরা অপেক্ষা করলেন। আসনে বসে যখন তিনি ঘুরে ওঁদের দিকে তাকালেন, তখন ক্রোধে তাঁর মুখাবয়ব কালো হয়ে গেছে, যেন ফেটে পড়ছে প্রায়। ওঁরা যেন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁরই কর্মচারী, তাঁরই সহকারী, তাঁরই বিদূষকরা তাঁকেই তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস পায়। কোথায় এখন ঘণ্টাখানেক সময় তিনি নিজের খেয়াল-খুশিতে কাটাবেন, তা নয়, সময়টা ওঁরা ওঁদের কাজে লাগাবেন বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

সেক্রেটারী বলতে লাগলেন, 'নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি—'

'ওদের বিষয় আর কোন কথাই নয়।' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ডিক্টেটর।

শ্রমমন্ত্রী দু পা এগিয়ে এলেন এবং একটু হিসাব করে দ্বিধা এবং আত্মবিশ্বাসের অন্তরঙ্গতা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'আর বেশিদিন ওদের কথা শুনতে হবে না, স্যার। আজ রাত্রেই ওদের দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। সুতরাং একদিক থেকে ব্যাপারটা এবারে শেষ হলো। মানে আমি বলছি, ব্যাপারটার চরম পরিণতির সময় এসেছে।'

ডিক্টেটরের ক্রোধের গভীরতা কিংবা তাঁর মনোভাব বুঝতে না পেরে শ্রমমন্ত্রী একটু থেমে তাঁকে লক্ষ্য করলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বলবার অনুমতি দিচ্ছেন তো? এই মামলা সম্পর্কে কিছু ব্যাপার বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং কিছু একটা করাও দরকার। কিন্তু বিস্তারিত সব শুনতে আপনার বোধহয় ভালো লাগবে না।'

ডিক্টেটর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'বলতে থাকুন।'

'আচ্ছা। আমি বলেছি, ব্যাপারটা আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনের মৃত্যুদণ্ড আজ রাত্রেই কার্যকরী করা হবে, আর এর প্রতিক্রিয়া

যত তীব্রই হোক না কেন, তাও খুব তাড়াতাড়ি শান্ত হয়ে আসবে। মৃত মানুষকে নিয়ে উত্তেজনাকর আন্দোলন চালানো অসম্ভব। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাই এ রকম আন্দোলনকে শক্তিশালী হতে দেয় না। এমন আন্দোলন করে কোন পরিবর্তন ঘটানোই সম্ভব নয়, কারণ মৃত্যু অপরিবর্তনীয়।'

ডিক্টেটর জানতে চাইলেন, 'দণ্ডাজ্ঞা যে আবার স্থগিত থাকবে না, সে সম্পর্কে আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন?'

'এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজ সকালে কারখানার শ্রমিকরা খাওয়ার জন্য বাইরে এসে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে কয়েক হাজার লোক মিলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ইট ছুঁড়ে, জানলা ভেঙে দূতাবাসের সামনে দাঁড়ানো চার্জ-দ্য-ফেয়ারের গাড়িখানা উলটে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিস এসে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে নেতৃস্থানীয় বাইশজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে ওদের মধ্যে অন্তত দুজন কম্যুনিস্ট। অন্য সবাই আমাদের অপরিচিত, এমন কি আমাদের কাগজপত্রেও ওদের নাম নেই। এতেই বোঝা যায় সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা কতখানি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং কেমন সুচতুরভাবে একে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে পুলিস পড়েছে এক বিশ্রী অবস্থায়, কারণ সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে বাঁচানোর প্রশ্ন আজ জাতির গৌরব আর সম্মানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। আমেরিকার ইতালীয় অধিবাসীদের প্রতি অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের এত কাহিনী আজ আমাদের দেশের মানুষের কানে এসে পৌঁছেছে যে তারা আর এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারছে না। তারা জাতির সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন বলে মনে করছে একে। সুতরাং ওই দুজন কম্যুনিস্টসহ বাইশজনকেই মুক্তির আদেশ দিয়েছি আমি। অবিশ্যি ওদের ওপরে নজর রাখা হবে, যাতে ভবিষ্যতে ওরা আমাদের কাজে লাগতে পারে। আমি আশা করি, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এই অবস্থায় আমি যা করেছি, তাই সবচেয়ে বিজ্ঞজনোচিত।'

ডিক্টেটর সায় দিয়ে বললেন, 'তারপর?'

'বেলা দুটোর সময় আমি আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে-

ছিলাম। তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। তিনি বললেন, আপনি যেন এই বিশ্রী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা না ঘামান।' বললেন, খুব শীগগিরই এর শেষ হবে, আর কোন গণ্ডগোল হবে না।'

'তাই বললেন?' ডিক্টেটর প্রশ্ন করলেন। তাঁর মুখাবয়বে ক্রোধের ছাপ অনেক ফিকে হয়ে এসেছে।

'ঠিক এই কথা কটি বললেন।'

শ্রমমন্ত্রী সমর্থনের আশায় সেক্রেটারীর দিকে তাকালেন, 'আমি খানিক আগে আপনাকে ঠিক এই কথাই বলিনি?'

'হ্যাঁ, এই কথাই বলেছেন।' সেক্রেটারী ঘাড় নাড়লেন।

'তবে দেখুন, বন্ধুত্ব কখনো বৃথা যায় না, কেমন?' সংবাহকের টেবিল থেকে চলে আসার পর ডিক্টেটরের মুখে এই প্রথম হাসির রেখা ফুটলো, 'বন্ধুত্ব অবিশ্যি অনেক রকমের হয়। নির্বোধরা যখন আকাশকুসুম রচনা করে, বিজ্ঞেরা তখন প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন।'

শ্রমমন্ত্রী আবার বলতে লাগলেন, 'রাষ্ট্রদূতের কথামেতো আজ বেলা তিনটেয় একজন আণ্ডার সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম আমি। ইনি আমায় বললেন, আজ যে ওদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবেই, তা একরকম অবধারিত। তিনি বুঝতে পারেন, এই আসন্ন মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আপনি এবং আপনার সরকার একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়েছেন। তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন, সব দলই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছে। তিনি আরও বললেন, অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ব্যাপারটি পরিচালনা করায় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আপনার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।'

ডিক্টেটর টেবিলের উপরে মুষ্ট্যাঘাত করে জোরের সঙ্গে বললেন, 'এই দেখুন! যারা বলে, যে কম্যুনিস্ট, সে কম্যুনিস্টই, সেই সব ষাঁড়ের মগজ-ওয়ালা শুয়োরগুলোর কথা শুনে কাজ করলে কী হতো দেখলেন তো? ওদের মাথায় আছে "ক্যাস্টর-অয়েল" মনোভাব।'

এই মুহূর্তে একটি কথা সৃষ্টি করে ফেললেন তিনি এবং জোর করে একটু হাসলেন। শ্রমমন্ত্রী এবং সেক্রেটারীও হাসলেন। অভিব্যক্তিটি বেশ সুন্দর, বেশ তীক্ষ্ণ।

ডিক্টেটর আবার বলতে লাগলেন, 'অবিশ্যি এই "ক্যাস্টর-অয়েল" মনোভাব সমস্ত জাতির মনোভাব নয়। শুধু কম্যুনিস্টরাই কি ওই দুটো বেজন্মা বিপ্লবীর ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন? তা নয়। আমি বলছি, যে অন্যায় অত্যাচার সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির উপরে হয়েছে, তাতে দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি ইতালীয়ই অপমানিত বোধ করছে। আমাদের কার্যাবলীর ফলে দেশের মানুষ বুঝতে পারছে, পৃথিবীর যে কোন দেশে একজন ইতালীয়েরও অবমাননা হলে দেশের নেতারা মুখ বুজে থাকেন না। ইতালীর সম্মান অতি পবিত্র। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ওই আণ্ডার সেক্রেটারী সত্য কথা বলেছেন?'

শ্রমমন্ত্রী উত্তর দিলেন, 'সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তাছাড়া, ভিলাফলেত্তো থেকে এক প্রতিনিধিদল এসেছে। তারা বিনীতভাবে এবং আন্তরিকভাবে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। আপনি জানেন, ভিলাফলেত্তো ভাঞ্জেত্তির জন্মস্থান। অবিশ্যি আমার বিশ্বাস, প্রতিনিধিদলের দুজন তুরিন থেকে এসেছে।'

'তাদের নাম টুকে নিয়েছেন?' ডিক্টেটর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর হাবভাব বদলে গেলো, ক্রোধ অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং তার পরিবর্তে মুখাবয়বে ফুটে উঠলো পিতৃসুলভ দাক্ষিণ্য।

'ওদের নাম আর আঙুলের ছাপ নিয়ে এরই মধ্যে ওদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। ওরা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন চব্বিশ ঘণ্টাই ওদের ওপরে নজর রাখা হবে।'

'বেশ বিজ্ঞ আর পাকা লোকের মতোই কাজটি করেছেন।' ডিক্টেটর মাথা নাড়লেন, 'যোগ্যতার অভাবে আমাদের দেশের লোক কিছু করতে পারছে না। তাই আপনার এই বিচক্ষণতা দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখবেন, যখন কয়েকশো মাইল দূর থেকে কোন প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই কম্যুনিস্টদের হাত আছে এর কোথাও। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকটি মানুষের মাথায় সাম্যবাদের নোংরা জঞ্জাল খানিক নিশ্চয়ই আছে। এ কথা মনে রাখবেন। এখন আমি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

প্রতিনিধিদল যখন ডিক্টেটরের প্রশস্ত আপিসকক্ষে এসে ঢুকলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত বাড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা করার জন্য ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। আজকের এই দিনটিতে ইতালীর সম্মুখে যে বিশেষ সমস্যাটি তারই জন্য তাঁর চোখে আর মুখাবয়বে গভীর দুঃখের অভিব্যক্তি, যেন সেখানে প্রতিনিধিদলের মনের দুঃখই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। প্রতিনিধিদলের নেতা একজন বৃদ্ধ। দেখলেই বোঝা যায়, তিনি আজীবন শ্রমিক।

ডিক্টেটর হাত বাড়িয়ে এই বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করলেন এবং মুহূর্তকাল গভীর নীরবতায় কাটালেন। বৃদ্ধ নেতা তাঁর পকেট থেকে লিখিত আবেদন-পত্রখানি বের করে সযত্নে তার ভাঁজ খুললেন। অন্যেরা টুপি হাতে নিয়ে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর তিনি দ্বিধা এবং ভয়মিশ্রিত কম্পিত স্বরে পড়তে লাগলেন, 'আমরা ইতালীর এক সহস্র কৃষক এবং শ্রমিক বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির জন্মস্থান ভিলাফলেত্তো শহরে সমবেত হইয়াছিলাম। অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একজন সৎ এবং ভদ্র ইতালীয়ের স্মৃতির সম্মানার্থেই আমাদের এই সমাবেশ। আমরা তাঁহার মৃত্যুকে রোধ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত ক্ষমতা নিয়োজিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং সেইজন্যই ভিলাফলেত্তোর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ এবং তুরিন শহরের অধিবাসীবৃন্দের এক প্রতিনিধিদল "ইল্ দ্যুচে"র সমীপে প্রেরণ করিতেছি। আমরা আবেদন করিতেছি "ইল্ দ্যুচে" যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিয়া আইনসিদ্ধ এই নৃশংস হত্যানুষ্ঠান প্রতিরোধ করেন। আমরা "ইল্ দ্যুচে"র ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। আমাদের বিনীত এবং সশ্রদ্ধ আবেদন, তিনি যেন আমাদের দেশের এই দুই শ্রমিক সন্তান নিকোলা সাকো এবং বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হন।'

আবেদনটি পড়া হয়ে গেলে বৃদ্ধের পিচুটি-পড়া শ্রান্ত দুটি চোখ জলে ভরে এলো। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষটি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আত্মীয়।

ডিক্টেটর বৃদ্ধকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই তাঁর

আবেগ দেখে বিচলিত হলেন। প্রতিনিধিরা যখন আপিসকক্ষ থেকে নির্গত হলেন তখন তাঁদের অনেকেই কাঁদছিলেন। ডিক্টেটর ঘুরে এসে আবার নিজের আসনে বসলেন। তিনিও তখন খানিকটা বিচলিতবোধ করছিলেন। ঘটনাটির প্রভাব চলে যাওয়ার আগেই তিনি একজন স্টেনো-গ্রাফারকে ডেকে পাঠিয়ে সংবাদপত্রের জন্য এই বিবরণটি বলে গেলেন :

'ইতালীর সন্তান নিকোলা সাক্কো এবং বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির জীবন রক্ষার জন্য "ইল্ দ্যুচে" যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান তাহাকে ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্যই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন।

'যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি "ইল্ দ্যুচে"র পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া গভীর দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা ম্যাসাচুসেট্‌স্ কমনওয়েলথ রাজ্যসরকারের হাতে রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি "ইল্ দ্যুচে"র আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়াও গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছেন যে এই ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকারই নাই।'

ডিক্টেটর শ্রমমন্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন, এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন থেকেও ঠিক এই মর্মে একটা বিবৃতি দেওয়ানো দরকার এবং ডিক্টেটরের বিবৃতি সংবাদপত্রে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে ওদের সমর্থন আদায় করতে হবে। শ্রমমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দিলেন, ঘটনার এরকম বাঞ্ছনীয় পরিণতি ঘটাতে কোন অসুবিধে হবে না।

ডিক্টেটর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মুখের উপর থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরে গেলো। মিনিট কুড়ি পরে তিনি তাঁর শয়নকক্ষের দিকে চললেন। আর মুহূর্তের মধ্যে এই দিনটি, তাঁর জীবন, তাঁর ভবিষ্যৎ আবার উজ্জ্বল, আনন্দমুখর হয়ে উঠলো।

আট

বাইশে আগস্ট ভোর থেকেই রাজভবনের সামনে পিকেট লাইনটা এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে। ওদের সংখ্যা কমছে বাড়ছে। আজ অতি প্রত্যুষে মাত্র মুষ্টিমেয় কজন আত্মসচেতনতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পাশের ফুটপাথের উপরে পায়চারি করেছে। খানিক বাদে যখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে সবাই কাজে বেরুচ্ছে তখন ওদের সংখ্যা কিছু বাড়লো। দুপুরেবেলা পনেরো মিনিট কিংবা আধঘণ্টার জন্য অসংখ্য নরনারী এসে যোগ দিয়েছিলো ওদের সঙ্গে। তারপর আবার তারা সবাই কাজে চলে গেলো।

মোটামুটি দশটা নাগাদ ওরা সংখ্যায় বেশ ভারী হলো। ততক্ষণে ওদের ঘিরে একদল পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন জনগণের রক্ষাকর্তারা এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে এলো সিটি পুলিস, তারপর তাদের সাহায্যার্থে এলো রাজ্য-পুলিস। খানিক বাদে একটু দূরে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তাতে চারজন সৈনিক টমিগান নিয়ে যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। অথচ সম্ভাব্য এমন কোন পরিস্থিতির কথা ভাবতেও পারছে না পিকেট লাইনের মানুষগুলো, যার জন্য এই সব প্রস্তুতি প্রয়োজন। আসলে ওদের ঘিরে এই পুলিসের আমদানি এবং আধাসামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করা, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা নয়। আর এই ভীতি সঞ্চার করতে ওরা একেবারে অকৃতকার্যও হয়নি।

গত তিন-চারদিন পর্যন্ত সাকো ভাঞ্জেত্তির মামলায় উদ্বিগ্ন লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বোস্টনে এসে জমা হচ্ছিলো। কমনওয়েলথের গভর্নর যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে বাইশে আগস্ট মধ্যরাত্রে সাকো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যুদণ্ড হবে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বহু লোকের মনে হয়েছিলো, তারা যেন বোস্টন থেকে যন্ত্রণার একটা অস্পষ্ট অথচ মর্মভেদী কাতরোক্তি শুনতে পেলো। এত বিভিন্ন রকমের মানুষের এই অনুভূতি হয়েছিলো যে তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। ডাক্তার, গৃহিণী,

ইস্পাত-শ্রমিক, কবি, লেখক, রেলের মিস্ত্রী, এমন কি পূর্ব প্রান্তে, পশ্চিম প্রান্তে একাকী কর্মরত গোলাঘরের কর্মীরাও সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-দুর্ভাবনার সঙ্গে এক অদ্ভুত ভীতিময় একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলো। মৃত্যুদণ্ড অতি প্রাচীন ব্যবস্থা, মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকে এ ব্যবস্থা প্রচলিত। নিঃসন্দেহে নিরপরাধ অনেক মানুষই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। তবু এর আগে আর কোনদিন কোন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা এ দেশের মানুষকে এমনভাবে নাড়া দেয়নি, বিচলিত করেনি।

বাইশে আগস্টের পূর্বদিন ওয়াশিংটনের সীত্‌ল্‌-এ একজন নিগ্রো মেথডিস্ট পাদ্রী সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা নিয়ে এক বক্তৃতা দিলেন। শৈশবে আলাবামা রাজ্যে তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। দক্ষিণ দেশের নিগ্রো অধিবাসীদের জীবনের এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তাঁর শ্রোতাদের মনের এক বিশেষ তন্ত্রীতে আঘাত করবে, এ কথা তিনি জানতেন। তিনি বলতে লাগলেন, যে ছোট শহরে তিনি থাকতেন সেখানে মানুষের রক্তপিপাসা কত তীব্র হয়ে উঠেছিলো। একটি গরীব, বোকা, মাথাখারাপ স্ত্রীলোক বলে বেড়াতে লাগলো সে ধর্ষিতা হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন নরকের সব কুকুরগুলো ছুটে এলো। ছোট্ট শিশু হলেও তখন এই নিগ্রো পাদ্রী বুঝতে পেরেছিলেন কেমন করে এক নির্দোষ নিগ্রোকে ষড়যন্ত্র করে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত তাকে লিঞ্চ্‌ করা হলো। এখন তিনি সেই ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা এবং ফাঁদে-পড়া মানুষটির লাঞ্ছনা-নির্যাতনের কথা আর একবার উল্লেখ করলেন।

বক্তৃতামঞ্চ থেকে তিনি বললেন, 'সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মামলায় আমরা কি দেখেছি? ভগবানের দূত হয়ে আপনাদের কাছে কোন বক্তব্য বলা খুব সহজ নয়। কিন্তু একজন নিগ্রো হিসাবেও কিছু বলার আছে আমার। আমার আত্মাকে যেমন ত্যাগ করতে পারি না আমি, তেমনি আমার পক্ষে আমার এই কালো চামড়া পরিত্যাগ করাও সম্ভব নয়। আমি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির এই মামলা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এবং এই কথা বুঝেছি যে এমন এক রবিবার আসবে যেদিন আর আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। সেদিন এই মামলার ওপরে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে। এমন

ভুল ধারণা আমার নেই যে একজন মানুষ একদিন এই মামলা নিয়ে বক্তৃতা দিলেই এই তুই হতভাগ্যের অদৃষ্ট পরিবর্তিত হবে। আবার নিজেকে এ কথাও বোঝাতে পারছি না যে ওদের অদৃষ্টের কথা জেনে শুনে আমার পক্ষে নীরব থাকাই সমীচীন।

'কাল রাত্রে সাকো আর ভাঞ্জেত্তিকে নিয়ে আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। গায়ের রং কালো বলে জীবনের তিক্ততার স্বাদ বহুবার পেয়েছি আমরা। আলোচনা করতে করতে আমরা সবাই কেঁদে ফেললাম। পরে আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন কেঁদেছি। আমার মনে পড়লো, ইদানীং কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁরা প্রভু যীশু খৃষ্টের নির্যাতনের কথা ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাননি। এঁরা কী নির্বোধ! যে সময়ে লক্ষ লক্ষ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেই সময়ের ইতিহাসে এঁরা একজন খৃষ্ট এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ খুঁজছেন। তুদিন আগেও আমরা দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। তু হাজার বছর আগে স্পার্টাকাস নামে এক ক্রীতদাস অন্য সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে বলেছিলো বন্ধনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। যখন সে পরাজিত হলো, তখন তার ছ হাজার অনুচরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো। সুতরাং কে বলতে পারে যে যীশু খৃষ্টের নির্যাতনের কথা ইতিহাসে লেখা নেই?

'আজ থেকে হাজার বছর বাদে কেউ যদি ইতিহাসের পাতায় সাকো আর ভাঞ্জেত্তির নির্যাতনের কাহিনী খুঁজে বেড়ায়, তবে কি সে হতাশ হবে? সে কি এ কাহিনীর কোন নিখুঁত সাক্ষ্যপ্রমাণ চাইবে, আর যদি না পায় তবে বলবে যে বিধাতার সন্তান যীশু মানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মবলি দেননি? এই প্রশ্ন আমি নিজের কাছে করেছিলাম। তখন আমার মন গভীর তুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, হৃদয় ভারাক্রান্ত হলো। এই হতাশার অন্ধকারে একটু আলো, একটু পথের আশায় যখন তাকালাম, তখন কিছুই দেখতে পাইনি আমি। মনে মনে বললাম, "তোমার বিশ্বাস অল্প, তোমার জ্ঞান ততোধিক অল্প।" নিজেকে তিরস্কার করলাম, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম নিজের উপরে, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার স্ত্রী, তিন ছেলে-মেয়ে এবং আমি,—আমরা সবাই কেঁদেছিলাম, কারণ এই তুজন ইতালীয়কে

মরতে হবে, ওরা এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছে, আর পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যে ওদের বাঁচাতে পারে। এর ফলে যদি আমি শুধু হতাশার অন্ধকারই দেখি, তবে নিশ্চয়ই আমি ভগবানে কিংবা তাঁর সন্তান প্রভু যীশু খৃষ্টে আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।

'কিন্তু তবু, সমস্ত অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ধর্মকথা বলবার ইচ্ছে হলো আমার। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কাদের কাছে বলবো? মানস নয়নে দেখতে পেলাম আমার শ্রোতারা সবাই গির্জার মধ্যে আসনে বসে আছে। এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকালাম, এমন করে আর তাকাইনি কখনো। কখনো নিজের মনে মনে বলিনি, আমার শ্রোতারা সবাই সাধারণ শ্রমিক, তারা কাঠ কাটে, জল টানে। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, ওরা শুধু মানুষ, কী প্রয়োজন ওদের শ্রমিক বলে ব্যাখ্যা করার? তবুও আমার আত্মীয় বন্ধু সবাই শ্রমিক, তাই নয় কি? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা চোখ মুছছো। এ তো স্বাভাবিক, কালে কালে একদিন কাঁদবে তোমরা, কারণ সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির অন্তর্যাতনা তোমার আমারই অন্তর্যাতনা। সাদা-কালো নির্বিশেষে এ অন্তর্যাতনা আমাদের দেশের সমস্ত শ্রমিকের। এ অন্তর্যাতনা আমার শৈশবের সেই হতভাগ্য বিতাড়িত নিগ্রোর, যাকে একদল ঘৃণা-তাড়িত মানুষ গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসি দিয়েছিলো। এ অন্তর্যাতনা সেই শ্রমিকের, যে তার শ্রম বিক্রি করার আশায় দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়, কারণ তার স্ত্রী, তার শিশুসন্তনরা ক্ষুধার্ত। এ অন্তর্যাতনা বিধাতার সন্তানের, যিনি নিজে ছিলেন সূত্রধর।

'আমরা ধৈর্যশীল জাতি। আমি পরিমাপ করতে পারি না কত চেষ্টা করে আমরা এই ধৈর্য শিখেছিলাম,—কী দিয়ে পরিমাপ করবো রক্তপাত, অশ্রু আর অন্তর্বেদনাকে? কিন্তু আমরা ধৈর্যশীল, সহজে আমরা ক্রুদ্ধ হই না। তবু আজ বুঝতে পারছি না, এ আমাদের গুণ না দোষ। ওরা বলে দিয়েছে, দু-একদিনের মধ্যেই সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে মরতে হবে। এত দূরে রয়েছি আমরা, সংখ্যায় এত অল্প! আমি বুঝতে পারছি না আমাদের কর্তব্য কী। পিটার নামে একজন তার সঙ্গীকে আর ভগবানকে দেখতে না পেয়ে তলোয়ার নিয়ে নিজেকে আঘাত করেছিলো। তখন যীশু তাকে

বলেছিলেন, "তলোয়ার খাপে ভরে রাখো। আমার পিতা যে জীবনরসের পেয়ালা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করবো না?"'

'বহুকাল ধরে কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করেছি আমি। আমার অন্তরে কে যেন বলতো, "না, এ যথেষ্ট নয়।" তার সঙ্গে তর্ক করতাম আমি। আজও সে তর্কের শেষ হয়নি। আজ আমার অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ। আমার সেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমি আজ তোমাদের কাছে এসে বলছি, ওদের দুজনের জন্য, এসো, আমরা প্রার্থনা করি। ওরা আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করছে…'

পাদ্রীর এই কথাগুলোতে অভিব্যক্ত হয়েছে একদল মানুষের অনুভূতি; অন্য মানুষের অনুভূতি অন্য পথে অভিব্যক্ত হয়েছে। অনেকে মনের আবেগের গভীরতায় বোস্টনে চলে এলো। এখানে এসে কি করবে তারা তা ভেবেও দেখেনি। এই নিগ্রো পাদ্রীর মতোই তারাও তাদের মনের গভীরে বোধ করেছে, সবল কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রতিবাদ, এ বিক্ষোভকে মূর্ত করার জন্য যে শিক্ষা, যে শৃঙ্খলাবোধ থাকা দরকার তা এদের নেই। যাঁরা বোস্টনে এলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কবি, তাঁরা জানতেন, এ হৃদয়বেদনাকে রূপ দেওয়ার শক্তি ভাষায় নেই; কেউ কেউ ছিলেন চিকিৎসক, তাঁরা অনুভব করলেন, এ রোগ, এ যন্ত্রণাকে উপশম করার ক্ষমতা তাঁদের নেই; আর বাকী যারা শ্রমিক, তারা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করলো যেন তাদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, আর তাদের মনে একটা প্রতিজ্ঞা দানা বেঁধে উঠতে লাগলো, "না, প্রতিবাদ না করে মরবো না।" বোস্টনে এসে এরা প্রতিবাদ-সভায় গেলো, এমন সব প্রশ্ন করতে লাগলো, যার সহজ এবং প্রত্যক্ষ কোন উত্তর নেই, আর তাদের অধিকাংশই শেষে চললো রাজ্যভবনের দিকে, যেখানে অনেকদিন পর্যন্ত একদল মানুষ পিকেটিং করে চলেছে।

অনেকে আবার পিকেট লাইনে এসে যোগ দেওয়ার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারলো না। ভয়, বিস্ময় আর চিরাচরিত ঐতিহ্যের বাধা কাটিয়ে পিকেট লাইনে এসে যোগ দেওয়া সহজ কথা নয়। যারা বোস্টনে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই এর আগে পিকেটিং করা তো দূরের কথা, পিকেট

লাইনই আর দেখেনি ; ব্যাপারটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ওরা জানতো না পিকেটিং করার অর্থ কি, এর উদ্দেশ্য কি অথবা এতে লাভ কি। এদের অনেকের মনে ধারণা ছিলো, এই যে পোস্টার নিয়ে স্লোগান দিয়ে ফলত এই দুটি মানুষ যাতে অসহায়ভাবে না মরে তার জন্য এক তিক্ততাময় প্রার্থনা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া,—এ যেন খানিকটা হাস্যকর। তাই কেউ কেউ এদের সঙ্গে যোগদান করতে পারলো না। তাদের মন চাইছে ওদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু এক তীব্রতর বিরোধী শক্তি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করছে। ফলে তারা শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলো তাদের নিষ্ক্রিয়তার অর্থ, বুঝতে পারছিলো আরো অসংখ্য লোকেরও এই একই অবস্থা। যারা বোস্টনে এসেছে তাদের মধ্যেই শুধু কজন এ রকম অশক্ত হয়ে পড়েনি। আরো লক্ষ লক্ষ লোক যারা বোস্টনে আসেনি তাদেরও এমনি অবস্থা, তাদের আকাঙ্ক্ষাও এমনি নিষ্ফল হয়ে গেলো। আর যখন সেই ইতালীয় জুতোর কারিগর আর মাছের ফেরিওয়ালা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখনও এরা শুধু নিষ্ফল অশ্রু বিসর্জন করবে।

কিন্তু এমনও অনেক মানুষ ছিলো, যারা অশক্ত হয়ে পড়েনি, যারা মনের দ্বিধা কাটিয়ে এগিয়ে এসেছে, স্থান করে নিয়েছে পিকেট লাইনের মধ্যে। এদের কেউ কেউ মনে মনে বললো, 'এই দেখো, কেমন নতুন এক অস্ত্র আবিষ্কার করেছি আমি, অথচ এর কথা আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। এ এক চমৎকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, একে অন্য যে কোন অস্ত্রের মতোই ব্যবহার করা যাবে!'

পরস্পরকে এরা চিনতো না আগে, তবু তাদের সঙ্গেই এরা কাঁধ মেলালো ; আর এক দেহ থেকে অন্য দেহে শক্তির প্রবাহ বয়ে গেলো। এদের কেউ যুবক, কেউ প্রৌঢ়, কেউ বা বৃদ্ধ। কিন্তু এক ব্যাপারে তারা সবাই সমান। সবাই মিলে তারা আজ এমন কিছু করছে, যা জীবনে আর করেনি, আর এরই ফলে এমন এক শক্তি পেয়েছে তারা, যা আগে তাদের ছিলো না। এদের অনেকেই দ্বিধা নিয়ে দুর্বল চিত্তে যোগ দিয়েছিলো পিকেট লাইনে। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস এলো তাদের, শেষে এলো গর্বিতভাব

এবং দৃঢ়তা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মাথা তুলে ঋজু হয়ে দাঁড়ালো তারা। গর্ব আর বিক্ষোভের জ্বালা ছড়িয়ে পড়লো তাদের সমস্ত চেতনায়, খালি হাতে যারা ছিলো, তারা অন্যের হাত থেকে পোস্টার ফেস্টুন নিয়ে দাঁড়ালো। এগুলোই যেন তাদের অস্ত্র, তারা সশস্ত্র এখন। আর সবার মনে মনে উদ্দীপিত হলো এক প্রজ্ঞা, যে সবার সঙ্গে এই সাধারণ মিছিলে যোগ দিয়ে তারা সমস্ত পৃথিবীময় ছড়ানো এক প্রবল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দিয়েছে। তাদের মনে এলো নতুন চিন্তা, নতুন আবেগ এলো অন্তরে; তাদের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হলো; দুঃখকে এক নতুন রূপে দেখলো তারা, যেমন করে দেখেনি কোনদিন, আর তাদের অন্তরের বিক্ষোভ প্রতিবাদে মূর্ত হয়ে উঠলো।

পুলিস বার বার এদের উস্কানি দিতে চেষ্টা করছিলো। বাইশে আগস্টের সকালবেলার দিকে দু দুবার ওরা পিকেট লাইন ভেঙে দিয়ে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অনেককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলো। ওদের অনেকের কাছে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। কবি, লেখক, আইনজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী,—যারা এতদিন নিরাপদ শান্তিতে ছিলেন, তাঁরা সাধারণ কয়েদীদের মতো দুর্ব্যবহার পেলেন, তাঁদের নিরাপত্তা যেন ধুলোয় মিশে গেছে, আর যে আইন এতদিন তাঁদের রক্ষা করে এসেছে, তাই যেন আজ রক্তপিপাসুর ক্রোধের অস্ত্র হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে। কেউ কেউ ভয়ানক ভয় পেলেন, অন্য সবার মনে ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ, ঘৃণার পরিবর্তে ঘৃণা উজ্জীবিত হলো, গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে তাঁদের মনে যে পরিবর্তন এলো, তা চিরস্থায়ী এবং তা তাঁদের বাকী জীবনকে প্রভাবান্বিত করবে।

যে শ্রমিকরা গ্রেপ্তার হলো, তাদের কাছে ব্যাপারটা অনেক সহজ। তারা বিস্মিত হলো না, ভয় পেলো না, কারণ এ তাদের কাছে নতুন কিছু নয়, অসাধারণ নয়। এদের মধ্যে একজন ছিলো নিগ্রো শ্রমিক, রোড দ্বীপের প্রভিডেন্সের এক কাপড়ের কলের ঝাড়ুদার। তারই মতো অন্য যারা ভাবতেও পারছিলো না যে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে সাকো আর ভাঞ্জেত্তি, তাদের সঙ্গে মিলে কি করা যায়, তাই দেখতে সে বোস্টনে এসেছে। এর জন্য পুরো দিনটা বিনা মাইনেয় ছুটি নিয়েছে সে। এই

নিগ্রো শ্রমিকটি সাকো-ভাঞ্জেত্তির মামলা সম্পর্কে বিশেষ গভীরভাবে ভাবেনি কখনো, কিন্তু ক বছর ধরে মামলাটা যেন তার চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সহজ প্রত্যক্ষভাবে তার দুনিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সে কখনো এ মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেনি, শুধু মাঝে মাঝে সাকো বা ভাঞ্জেত্তির বলা দুয়েকটি কথা কিংবা ওদের অতীত সম্পর্কে কিছু পড়েছে কোথাও। এইটুকু পড়েই সে সহজ স্বচ্ছভাবে বুঝতে পেরেছে, এই দুটি অভিশপ্ত মানুষ কোন অপরাধ করতে পারে না, তারা ওর নিজেরই মতো সহজ সাধারণ শ্রমিক মাঝে মাঝে সত্যিই সে এই একাত্মবোধ নিয়ে ভাবতে বসতো। ঠিক এমনি একবার হয়েছিলো, যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাঞ্জেত্তির একখানা চিঠি সে পড়লো। ভাঞ্জেত্তি লিখেছিলো, "আমাদের বন্ধুদের উচিত বজ্র নির্ঘোষে তাদের মতামত ব্যক্ত করা, যাতে আমাদের হত্যাকারীরা সে কথা শুনতে পায়। শত্রুরাই শুধু ফিসফিসিয়ে কথা বলবে কিংবা একেবারে নীরব হয়ে যাবে।"

এই কটি কথা নিয়ে নিগ্রো শ্রমিকটি গভীরভাবে চিন্তা করেছে। কালক্রমে কথাগুলো তার নিজের মতামতেরই অংশ হয়ে গেছে। বাইশে আগস্ট তার বিশ্বাস তাকে নিয়ে এসেছে বোস্টনে, তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রাজ্যভবনের সম্মুখের পিকেট লাইনে। নিজের এই কাজকে সে বড় করেও দেখেনি, ছোট করেও দেখেনি। এর সঠিক মূল্য দিয়েই বিচার করেছে একে। সে জানে, এর ফলে পৃথিবীও গুঁড়িয়ে যাবে না কিংবা যাদের সে এতদিন বন্ধু বলে মনে করে এসেছে, সেই মানুষ দুটিও মুক্তি পাবে না। কিন্তু এই মানুষটি তার সমস্ত জীবন ভরে আত্মঅবলুপ্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে, লড়াই করেছে এমনি ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে, যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নিষ্ফল বলে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে সে বুঝতে পেরেছে, এই ছোট কাজকে ঘৃণা করা মানে সব কাজকেই ঘৃণা করা। আগামী দিনের রঙীন স্বপ্ন নিয়ে সে কল্পনাজাল বুনতো না, সে বাঁচতে শিখেছিলো বর্তমানের কঠিন বাস্তবতার অঙ্গ হয়ে।

যে ক ঘণ্টা সে পিকেট লাইনে ছিলো, তার মধ্যে সে তার মনোভাবকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলো তার চারপাশের স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে। খুব দীর্ঘকায়

ছিলো না সে, কিন্তু তার সুগঠিত দেহে একটা আত্মপ্রত্যয়, একটা কঠিন দৃঢ়তার ছাপ ছিলো। তার মুখখানা ছিলো সুন্দর, মনোরম, আর তার পদক্ষেপ কিংবা কোন কাজে কখনো ত্রস্ততা কিংবা অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়নি। শুধু এরই জন্য ওর আপন শক্তির প্রভাব পড়েছিলো কাছের মানুষগুলোর উপরে, তাদের মনে এসেছিলো নিরাপত্তা বোধ। অন্য অনেক শ্রমিকের মতোই সেও সহজভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছিলো, পিকেট লাইনকে তার জীবনে নতুন বা অসাধারণ কিছু মনে করেনি সে। পুলিস যখন প্রথম পিকেট লাইন ভেঙে দিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করার জন্য উস্কানি যোগাতে লাগলো, তখন সবাইকে শান্ত করে সে বললো, 'সবাই স্থির থাকুন, ওদের দিকে নজর দেবেন না। আসুন, আমরা আমাদের কাজ করে যাই।' এর ফলে পিকেট লাইনের মানুষগুলোর শৃঙ্খলা এবং ঘনত্ব বজায় রইলো। কিন্তু ওর এই ছোট ছোট অথচ সুপরিকল্পিত কাজগুলো পুলিসের নজর এড়ালো না। সাদা পোশাকের পুলিসেরা পরস্পর ওকে দেখিয়ে দিলো। ওর ওপরে নজর রাখা হলো, ওর গুরুত্ব বুঝতে পারলো পুলিস। পিকেট লাইনের এই ক্ষুদ্র সংগ্রামের নাটকে ওকে বাছাই করে রাখা হলো অপসৃত হওয়ার জন্য। পুলিসের দ্বিতীয়বারের উস্কানি এলো সোজা ওকে লক্ষ্য করে। ওকে গ্রেপ্তার করে সেদিন বাইশে আগস্ট দুপুর একটায় পুলিসের প্রধান দপ্তরে এনে একা একটা কুঠুরিতে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

অন্য সবার চেয়ে আলাদা এই বিশেষ ব্যবহারের জন্য মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো সে। প্রায় তিরিশজন গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জুতোর কারিগর, কাপড়ের কারখানার শ্রমিক যাদের গায়ের রঙ সাদা, রয়েছে গৃহিনীরা, আর রয়েছেন নিউ ইয়র্কের একজন বিখ্যাত নাট্যকার এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কবি। ওঁদের সবাইকে এক সঙ্গে রাখা হয়েছে। তবে ওকে কেন সবার কাছ থেকে আলাদা করে একা রাখা হলো?

খানিক বাদেই জবাব মিললো এ প্রশ্নের। মৃত্যুদণ্ডের আগের শেষ দিনটি আজ। আজ সময়ের পরিমাপ হচ্ছে ঘণ্টা দিয়ে, মিনিট দিয়ে। তাই যা করবার তার জন্য বিলম্ব করা চলবে না। এ কথা সে অনুভব করতে পেরে-

ছিলো। কুঠুরিতে অল্প কিছু সময় থাকার পরেই ওরা তাকে একটা কক্ষে নিয়ে এলো। সেখানে কজন মানুষ অপেক্ষা করছিলো। তাদের দুজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস, দুজন সাদা পোশাকের পুলিস, আর বিচার বিভাগের একজন লোক। একজন পুরুষ স্টেনোগ্রাফারও খাতা খুলে বসে ছিলো কক্ষের এক পাশে। যে কোন স্বীকারোক্তি কিংবা যন্ত্রণার অভিব্যক্তিকে লিখে রাখবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিলো সে। সাদা পোশাকের পুলিস দুটির হাতে ছিলো দু টুকরো রবারের হোস্, বারো ইঞ্চি দীর্ঘ, এক ইঞ্চি পরিধিতে। সে যখন এ ঘরে ঢুকলো তখন ওরা হোসের টুকরো দুটোকে সামনে পেছনে দোমড়াচ্ছে। একবার হোসের দিকে, আবার মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকালো সে, নোংরা ঘরখানার বিশ্রী শূন্যতা দেখলো একবার, আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো কী অপেক্ষা করছে তার জন্য। এই নিগ্রো শ্রমিক একজন সাধারণ সরল মানুষ। পরিণতির কথা বুঝতে পেরে তার সমস্ত অন্তর ভয়ে নির্জীব হয়ে এলো। তার দেহ কঠিন হয়ে এলো, মোচড় খেতে লাগলো, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ততটা নয়, যতটা তার দৈহিক অস্তিত্বের অনিচ্ছাকৃত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে। ঘরের মানুষগুলো মুচকি হাসলো, আর সে বুঝতে পারলো এ হাসির অর্থ।

বিচার বিভাগের লোকটি তাকে বুঝিয়ে দিলো কেন তাকে এখানে আনা হয়েছে। সে নিগ্রোকে বললো, 'দেখো, তোমাকে কোন কষ্ট দিতে আমরা চাই না। তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার সত্যিই আমাদের কোন অভিপ্রায় নেই। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবো আমরা। আশা করি তুমি তার সঠিক উত্তর দেবে। তাই যদি করো, তবে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আমরা একটু বাদেই তোমায় মুক্তি দেবো। এই প্রশ্ন কটির জবাব দেওয়ার জন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই একজন সৎ লোক, খাঁটি আমেরিকান।'

নিগ্রো আন্তরিকভাবে বললো, 'আমি একজন সৎ আমেরিকান।'

সাদা পোশাকের পুলিস দুটি হোস্ দোমড়ানো থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওদের দুজনেরই মুখের হাঁ বড়, ঠোঁটগুলো পুরু। এর ফলে ওদের দেখতে দেখাতো দু ভায়ের মতো। ওরা সহজ স্বচ্ছন্দভাবে হাসলো বটে,

কিন্তু শুকনো সে হাসি।

বিচার বিভাগের লোকটি বললো, 'যদি তুমি সৎ আমেরিকান হও, তবে একটুও অসুবিধে হবে না আমাদের, এতটুকুও না। একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে চাই,—ওই পিকেট লাইনে যোগ দেওয়ার জন্য কে তোমাকে পয়সা দিয়েছিলো?'

'কেউ দেয়নি,' নিগ্রো জবাব দিলো।

তখন সাদা পোশাকের পুলিস দুটি হাসি থামালো, আর বিচার বিভাগের লোকটি যেন দুঃখের সঙ্গেই কাঁধ নাচালো একবার। যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সে করেছিলো, ততটা বন্ধুর মতো আর রইলো না সে। তবু একেবারে অ-বন্ধুত্বেরও পরিচয় দিলো না কিছু।

'কি নাম তোমার?'

নিগ্রো নাম বললো। বিচার বিভাগের লোকটি ওকে আবার জোরে নাম বলতে বললো, যাতে স্টেনোগ্রাফার তার কথা শুনতে পায়। নিগ্রো তাই করলো।

'বয়স কত তোমার?'

নিগ্রো বললো, তার বয়স তেত্রিশ বছর।

'কোত্থেকে এসেছো তুমি?'

নিগ্রো বললো, সে প্রভিডেন্সে থাকে। আজ সকালে নিউহ্যাভেন-হার্টফোর্ডের ট্রেনে সে বোস্টনে এসেছে।

'প্রভিডেন্সে কাজ করো তুমি?'

প্রশ্নটি শুনেই নিগ্রো বুঝলো, আশা করবার মতো আর কিছু নেই তার। এখন থেকে সে যাই করুক না কেন, ঘটনাস্রোতকে সে পরিবর্তিত করতে পারবে না। সে যদি না বলে কোথায় কাজ করে সে, তবে ওরা ওদের কায়দায় সে খবর বের করে নেবে, আর তখনই সঙ্গীত শুরু হবে। সে জানে, এ সঙ্গীতে কী সুর বাজবে। সে জানে, কে নাচবে আর কেই বা পয়সা দেবে বাজনদারের। সে বুঝলো, সে ভয় পেয়েছে। আর এ কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা হলো না তার। আপাতত পরিণতিকে সে খানিকটা পিছিয়ে দিলো। যদি শুরু হয়ই, তবে খানিক বাদেই শুরু হোক

সঙ্গীত। সে বললো, কোথায় সে কাজ করে। ওরা তা টুকে নিলো। সে বুঝতে পারলো, আর ওখানে কাজ করতে হবে না তাকে, দেশের এই অংশের কোথাও আর কাজ জুটবে না তার। তার স্ত্রী আছে, তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। তারই জন্য দেশের এই অংশে আর তার কাজ জুটবে না ভেবে সে আরো দুঃখিত, আরো ব্যথিত হলো। কিন্তু তবু এমনটি ঘটতে যাচ্ছে, একে ঘটতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার তার উপায়ও নেই। এ ঘটতে যাচ্ছে, কেবল শুরু করেছে ঘটতে, আর এখন এমন ঘটতেই থাকবে।

'তুমি কেন বোস্টনে এসেছিলে?' বিচার বিভাগের লোকটি মোটামুটি মোলায়েম ভাবেই প্রশ্ন করলো।

'আমি এসেছিলাম, কারণ আমি বিশ্বাস করি, কথায় বা কাজে কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে মরতে দেওয়া উচিত হবে না।'

'তুমি কি মনে করো এখানে এসে ওদের মৃত্যুকে রোধ করতে পারবে তুমি?'

'না, সেরকম মনে করি না আমি।'

'যদি তাই না মনে করো, তবে তোমার কথার উলটো কাজ করছো তুমি, আর তুমি যা বলছো, তার কোন অর্থ ই হয় না। হয় কি?'

'হ্যাঁ স্যার, হয়।'

'কী অর্থ হয় আমায় বলতে পারো?'

'হয়তো আমি কিছু করতে পারবো না, কিন্তু বোস্টনে এসে অন্তত বোঝা যাবে ওই দুটি হতভাগ্য মানুষের জন্য আমি কিছু করতে পারবো কিনা।'

'কী করতে পারবে?'

'পিকেট লাইনে যোগ দেওয়ার মতো একটা কিছু।'

বিচার বিভাগের লোকটি হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহান্নমে যাক সব! মিথ্যুক কোথাকার! তোর মতো ছোকরার কাছ থেকে কতগুলো মিথ্যে কথা শুনতে আসিনি আমি। মিথ্যে বলে নিজের ভালো করছিস না।'

লোকটা একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়লো। সাদা পোশাকের পুলিস দুটি ঘরের একপাশে একটা পুরনো টেবিলের ওপরে উঠে বসলো, আর ইউনিফর্ম-পরা পুলিস দুটি গিয়ে দরজার কাঠামোর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো,—দুজনে দু পাশে। ওদের এই নড়াচড়ায় গোটা ঘরটাই যেন নড়ে উঠলো একবার। নিগ্রো শ্রমিকটি এই গতিপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, এই গতিপ্রবাহ তার প্রতি ওদের মনোভাবের প্রাথমিক অভিব্যক্তি। এবারে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হবে। ওকে একা দাঁড় করিয়ে রাখলো ওরা, কিন্তু সবার দৃষ্টি ওরই ওপরে। অনেক সাদা চামড়ার মানুষ এমন করে কোন নিগ্রোর দিকে তাকিয়ে থাকার কী অর্থ, তা সে জানতো। স্ত্রী আর মেয়েটির কথা মনে পড়লো তার, আর একটা গভীর দুঃখ নেমে এলো তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, যেন তার অন্তরঙ্গ কেউ মারা গেছে। বাতাসে মৃত্যুর স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে বলেই এমন হচ্ছে, এ কথা সে বুঝতে পারলো। ওরাও মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দিতে চাইছিলো তার মনে।

বিচার বিভাগের লোকটি বললো, 'আমার বিশ্বাস, তুমি মিথ্যে বলছো। আমরা চাই, তুমি সত্যি কথা বলো। যদি মিথ্যে বলো, তোমারই অমঙ্গল হবে। আর যদি সত্যি কথা বলো, তবে বন্ধুর মতো ব্যবহার পাবে। আমি বিশ্বাস করি, কেউ তোমাদের সংগঠিত করে বোস্টনে পাঠিয়েছে। পিকেট লাইনে যোগ দেওয়ার জন্য কেউ পয়সা দিয়েছে তোমাদের। এই কথাটিই আমরা জানতে চাই,—কে তোমাদের সংগঠিত করে এখানে পাঠিয়েছে, কে পয়সা দিয়েছে ওখানে গিয়ে পিকেট করার জন্য? তুমি হয়তো ভাবছো, যে তোমায় ওখানে পাঠিয়েছে সে তোমার বন্ধু, কিন্তু তা মনে করা তোমার বোকামি। তোমার চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে, যে তোমাকে এর মধ্যে টেনে এনেছে সে তোমার বন্ধু নয়। সে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলের জন্য এ কাজ করেনি। সুতরাং তার প্রতি তোমার কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। তোমার তাই উচিত এখন আমাদের কাছে সত্য করে বলা,—এ লোকটি কে এবং কত সে দিয়েছে তোমাকে।'

নিগ্রো ভাবলো, এ কেমন ফ্যাসাদে ফেললেন ভগবান! একটু পরে সে মাথা নেড়ে বললো, কেউ তাকে পয়সা দেয়নি। স্বেচ্ছায় সে এখানে

এসেছে, কেউ তাকে আসতে বলেনি। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির কথা সে জানাতো, তাদের যাতনা সে অন্তরে অন্তরে তীব্রভাবে অনুভব করতো। তাই সে এখানে এসেছে। সে ওদের এ কথাও বোঝাতে চাইলো যে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি তারই মতো সহজ সাধারণ শ্রমিক, এও তার বোস্টনে আসার একটি কারণ। কিন্তু সে যখন এ কথা বোঝাতে শুরু করলো তখনই ওরা সবাই মিলে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে মারতে লাগলো। ওর সব কথা তলিয়ে গেলো, কাহিনীটা ওদের কানেই গেলো না।

ওকে বেশি মারলো না ওরা। সাদা পোশাকের পুলিস দুটি ওর কাছে এলো, একজন এলো এক পাশে, অন্যজন পিছনে। পিছনের জন তার হাতের হোস্ দিয়ে ওর কোমরের কাছে মূত্রাশয়ের ওপরে জোরে মারতে লাগলো। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ও যখন পিছিয়ে গেলো, তখন অন্য লোকটি হোস্ দিয়ে ওর মুখ নাক আর চোখের ওপরে মার চালালো। যন্ত্রণায় ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো, আর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। চাপা আর্তনাদ করে ও পিছু হটে গেলো। ওরা আর এগোলো না। ওর জামা বেয়ে তখন রক্ত পড়ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ও রক্তটা মুছে ফেললো, তারপর রুমালটা চেপে ধরলো নাকে। মূত্রাশয়ের ওপরে পিঠের যেখানটায় ওরা ওকে মেরেছে, সে জায়গাটা ভয়ানক ব্যথা করছে, আর চোখে আঘাত লাগার ফলে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখের জল বাধা মানছে না, জলভরা চোখে সে সব দেখছে যেন কুয়াশার মধ্য দিয়ে।

বিচার বিভাগের লোকটি বললো, 'আমাদের সঙ্গে একটু সহযোগিতা করো তুমি, তা হলে আর মার খাবে না। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, মার দেওয়ার এতটুকু ইচ্ছে নেই আমাদের। আচ্ছা, তুমি জানো, জজ সাহেবের বাড়িতে একজন লোক বোমা ফেলতে চেষ্টা করেছিলো? একবার ভাবতে পারো এ কথা! এই কমনওয়েলথের, এই যুক্তরাষ্ট্রের আইনসম্মত এক আদালত আছে, তার বিচারকও রয়েছেন। ওই কুত্তার বাচ্চা সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করে, বিচার করে তিনি রায় দিলেন। এ তাঁর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্মত পবিত্র কর্তব্য। এই সব সম্মানিত ব্যক্তিরা তোমার আমার জীবনের আশ্রয়স্থল। তোমার কি মনে হয় না, এঁদের

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠা উচিত মানুষের? কিন্তু তা তো হয়নি। প্রশংসা করা তো দূরের কথা, ওই দুটো বেজন্মা কম্যুনিস্টকে শাস্তি দিয়েছেন বলে একদল মানুষ কিনা বোমা ছুঁড়লো ওঁর বাড়িতে! তুমি কি মনে করো না বোমা ছোঁড়া একটা ভয়ঙ্কর কাজ?'

নিগ্রো ঘাড় দুলিয়ে সায় দিলো। হ্যাঁ, সেও মনে করে যারা বোমা ছোঁড়ে, মানুষ খুন করে, নৃশংস অত্যাচার করে, তারা ভয়ঙ্কর মানুষ।

বিচার বিভাগের লোকটি বললো, 'তোমার মত শুনে খুশি হলাম। এবারে সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে। আমাদের মনে হয় কে বোমা মেরেছে তা আমরা জানি। আমরা বিশ্বাস করি, তুমিও জানো। আমি যা জানি, আমি বলছি। এখন তোমার কাজ হবে তাতে সায় দেওয়া, সেই বিবৃতিতে সই করা। মানে তুমি সরকার পক্ষের সাক্ষী হচ্ছো। এতেই প্রমাণ হবে, তুমি একজন সৎ আমেরিকান। তা হলেই আমরা তোমায় মুক্তি দেবো, একটুও ফ্যাসাদ হবে না তোমার।'

নিগ্রো শ্রমিকটি বললো, 'কিন্তু আমি তো জানি না কিছুই। যা জানি না তা কি করে সই করবো আমি? তবে তো মিথ্যে বিবৃতিতে সই করা হবে। তা আমি করবো না। এমন গুরুতর ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলতে পারবো না আমি।'

বিচার বিভাগের লোকটি ছাড়া অন্য সবাই অবাক হলো ওর কথায়। সাদা পোশাকের পুলিস দুটি হাসলো একটু, ইউনিফর্ম-পরা পুলিস দুটিও হাসলো। শুধু বিচার বিভাগের লোকটি শান্ত গম্ভীর হয়ে রইলো। তার এখনো অনেক কাজ বাকি।

ওদের কাজ শেষ হলে ওরা নিগ্রোটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কুঠুরিতে বিছানায় শুইয়ে দিলো। আইনের অধ্যাপক সেখানে এসে ওর দেখা পেলেন। অনেক আইনজীবী সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অনেকে আবার স্বেচ্ছায় এই মামলার কাজ করতে চেয়েছিলেন। আইনের অধ্যাপক এঁদেরই একজন। আজ, বাইশে আগস্ট, এরা সবাই শেষবারের মতো ওদের জীবনরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত,—দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার জন্য আবেদন করছেন, শেষ আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন সবাই। তাছাড়া রয়েছে এই

দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিংবা পিকেট লাইনে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের সম্পর্কে নানা রকমের কাজকর্ম।

সাদা চামড়ার যারা আজ পিকেট লাইনে গ্রেপ্তাব হয়েছে, তারা নিগ্রোটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিরক্ষা কমিটিকে ওরা জানিয়েছে, একজন নিগ্রোকে পুলিস আলাদা করে রেখে দিয়েছে। কমিটি আইনের অধ্যাপককে দায়িত্ব দিয়েছেন নিগ্রোটি সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা দেখতে। সে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সত্যি বলতে কি, মামলাটির সঙ্গে এত দূরসম্পর্কিত এই কাজটুকু করার সুযোগ পেয়েও নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছেন। কারণ আজকের দিনে কোন রকমের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অসহায়ভাবে অপেক্ষা কয়া অসহ্য মনে হচ্ছিলো তাঁর। হেবিয়াস্ কর্পাসের এক সমন নিয়ে থানায় গিয়ে তিনি নিগ্রোটির সঙ্গে দেখা করার দাবি জানালেন। ওরা তাঁকে চিনতো, জানতো তাঁর খ্যাতি খুব সামান্য নয়। তাই পুলিসের ক্যাপ্টেন নিজে গিয়ে বিচার বিভাগের লোকটিকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে ইতিকর্তব্য আলোচনা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ইহুদি অধ্যাপক একটা সমন নিয়ে এসেছে। ওই নিগ্রো ছোকরার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হয়তো খানিক গোল বাধাবে আবার।'

বিচার বিভাগের লোকটি বললো, 'আমার মনে হয় না ওকে দেখা করতে দেওয়া উচিত।'

গোয়েন্দা বিভাগের একজন পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। সে বললো, 'আপনারা মশাই এসেছেন ওয়াশিংটন থেকে, এলেন আর চলে গেলেন, পাখীর মতো স্বাধীন। আমাদের এই শহরেই বাস করতে হবে। সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির ব্যাপারটা হয়তো কালই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এই বোস্টনেই আমাদের রোজগার করে খেতে হবে। নিগ্রোটার কী করবেন আপনি? ওকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারবেন? বাকি জীবনটা ওকে বরফের মধ্যে পুরে রাখবেন? তার চেয়ে আইনের অধ্যাপককে ওর সঙ্গে দেখা করতে দিন। কী আর হবে? কেউ মাথা ঘামাতে আসবে না এ নিয়ে।'

'ওকে দেখতে তেমন ভালো দেখাচ্ছে না এখন।' পুলিস ক্যাপ্টেন মৃদু প্রতিবাদ জানালেন।

'জাহান্নমে যাক সব! এমনিতেই বা দেখতে এমন কি সুন্দর ছিলো ও? ইহুদিটা পাকাক না খানিক গোলমাল। কী এসে যায় তাতে? এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।'

সুতরাং আইনের অধ্যাপককে আসতে দেওয়া হলো। তিনি কুঠুরির মধ্যে এসে নিগ্রোর বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। মারের চোটে ওর মুখ থেঁতলে গেছে, চোখ দুটি বোজা, নাক ফাটা আর কেটে-যাওয়া ঠোঁট থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। সে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করছে, ককিয়ে উঠছে। অধ্যাপক তাকে একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন, আশ্বাস দিলেন দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মুক্তি পাবে।

নিগ্রো বললো, 'আমি সত্যি সত্যি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার এই প্রচণ্ড যন্ত্রণার জন্য আপনার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারছি না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। ওরা মেরে আমার চোখ দুটো বুজিয়ে দিয়েছে। আমার বড় ভয় হচ্ছে, হয়তো আমি আর চোখ মেলে চাইতে পারবো না।'

'তুমি আবার চোখ মেলতে পারবে।' অধ্যাপক একে বললেন, 'আমি তোমার জন্য ডাক্তার আনতে যাচ্ছি এখন। আচ্ছা, ওরা তোমায় মারলো কেন?'

'কে একজন বোমা ছুঁড়েছে, তাই নিয়ে একটা স্বীকারোক্তিতে সই করতে চাইনি আমি।' নিগ্রো ধীরে ধীরে বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বললো, 'বোমা ছুঁড়েছে এমন কাউকে আমি চিনি না। ওদের কথাও আমার বিশ্বাস হয় না। কাকে যেন ফাঁসাতে চায় ওরা। কিন্তু ভগবানের চোখের সামনে জেনে শুনে তো আর মিথ্যুক বানাতে পারি না নিজেকে!'

'না, তা পারো না।' দুঃখ এবং তিক্ততামিশ্রিত স্বরে বললেন আইনের অধ্যাপক, 'এখন একটু স্থির হও। আমি তোমার জন্য ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে, আর তোমার এ যন্ত্রণারও শেষ হবে।'

নয়

উনিশশো সাতাশের বাইশে আগস্ট বেলা প্রায় দুটোর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে ফ্যাসিস্ট ইতালীর ডিক্টেটরের একটি সামান্য অনুরোধের কথা জানানো হলো। ডিক্টেটর জানতে চেয়েছেন, "ম্যাসাচুসেট্স কমনওয়েলথ সরকার কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য দুটি ইতালীয়ে"র পক্ষে কোন রকমে মার্জনালাভ সম্ভব কি না। সময় অতি অল্প, ওদের মৃত্যুর আসন্নতার জন্যই ডিক্টেটর সোজাসুজি সভাপতির কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছেন। এ সময়ে সভাপতি গ্রামদেশে ছুটি উপভোগ করছিলেন। সেখানে গিয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগের কয়েকজন লোক এই ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছে। এ কথা অবিশ্যি তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ডিক্টেটর গণ-দাবির ফলেই এই ধরনের অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ সবাই জানে, ডিক্টেটর অনেক কিছুর মতোই প্রগতিশীলদেরও দু চোখে দেখতে পারেন না এবং নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির মৃত্যু হলে একবিন্দু অশ্রুও তিনি বিসর্জন করবেন না।

চিন্তাশীল বলে সভাপতির খ্যাতি আছে, আর দীর্ঘ সময় ধরে অন্যের পক্ষে পীড়াদায়কভাবে নীরব থাকার অভ্যাস তাঁর এই খ্যাতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা কম কথা বলে, তাদের সম্পর্কে যে কোন কারণেই হোক এ কথা কেউ স্বীকার করে না যে চিন্তাশক্তির দীনতার জন্যই তারা নীরব থাকে। পরিপূর্ণতার চেয়ে অন্তরের শূন্যতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরবতার কারণ; কিন্তু লোককথায় একে জ্ঞানের পোশাক পরিয়ে রাখা হয়েছে। যাই হোক, বিভিন্ন গুণাবলী না থাকলে কেউ সভাপতি হয় না, আর এই সভাপতি সম্পর্কেও নিশ্চয়ই এ কথা প্রযোজ্য। তাঁর ঠোঁট পাতলা, চোখ দুটি ছোট আর নাকটা দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ। তাঁর কঠিন মুখমণ্ডলে নম্রতার চিহ্ন নেই, মানুষের মনকে জয় করার ক্ষমতা নেই; তাঁর কণ্ঠস্বরও তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ। অন্য কোন গুণ না থাকলেও তাঁর রসজ্ঞান নিশ্চয়ই ছিলো। কেউ কেউ অবিশ্যি এ রসজ্ঞান খুঁজে পেতে

না, অনেকে আবার বলতো, তারা এর পরিচয় পেয়েছে। আর ওরা তাঁকে বলতো, "ভূতের মতন"। কথাটা খুব প্রচলিত নয়। তাই যারা অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত এই নামকরণের কারণ বুঝতে পারতো, তারা কথাটা উচ্চারণ করতো একটা বিশেষ কায়দায়। ফলে সংবাদপত্রের লোকেরা যখন ওঁকে "ভৌতিক" বলে উল্লেখ করতেন, তখনই বুঝিয়ে দিতেন যে বিশেষ ধরনের কথাটা উচ্চারণ করা ভুল। একবার ঠিক এমনি "ভূতের মতন"ই সভাপতি বলেছিলেন, 'দেহের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে ডান হাত আর বাঁ হাত। তাই দেহের যখন বিপদ আসে, তখন ওরা দুয়ে মিলে তাকে রক্ষা করে। রাজনীতিতেও দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের সেই একই কাজ।'

সংবাদপত্রের লোকেরা এই ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করতেন। কিন্তু সভাপতির অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে অন্য রকম কথা বলতে শুনেছেন। তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডের লোক, ভেরমণ্টে তাঁর জন্ম, বড় হয়েছেন ম্যাসাচুসেট্‌সে। সেখানে একবার এক পুলিস ধর্মঘট ভেঙেছিলেন তিনি। তখন তিনি ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যের গবর্নর। বোস্টনের পুলিসরা তখন ক্ষেপে উঠেছে। সন্তানের ক্ষুধা আর স্ত্রীর বাক্যবাণ অসহ্য হয়ে উঠেছে। ওরা বলতো, "আমরা মানুষ নই ; ক্ষুধাতৃষ্ণায় কুকুরও ক্ষেপে ওঠে।" যে পুলিস ধর্মঘটের কথা আগে লোকে শোনেনি, তাই ঘটলো এর ফলে। সমস্ত দেশময় একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, সীমা ছাড়িয়ে গেলো ঘটনাস্রোত। আজকের সভাপতি, তখন ভয়ানক কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তারই ফলে পুলিস ধর্মঘট ভাঙার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

কমনওয়েলথের বর্তমান গবর্নর দু-এক বছরের মধ্যেই এই ঘটনার বার্ষিকী দিবসে একবার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "জানো তোমরা, কেমন করে তিনি পুলিস ধর্মঘট ভেঙেছিলেন? সেদিন যে দৃঢ়তা এবং স্থির-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন তিনি, তা আর কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তার তুলনা নেই। আমার বদনাম করুক লোকে, তা নিয়ে চিন্তিত নই আমি। আমি শুধু ভাবছি তাঁর সেই মহান কীর্তির কথা!"

আসল কথা হচ্ছে, বর্তমান গবর্নর ভাবছিলেন, আজ যিনি হোয়াইট হাউসে বসে আছেন, একদিন তিনিও এই প্রদেশের গবর্নর ছিলেন। তাঁর

নিজের বেলাও এমনটি যে ঘটবে না তা কে বলতে পারে? তিনি বুঝেছিলেন সাম্যবাদের গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ যাতে আছে তার প্রতি তীব্র অবিচল ঘৃণাই হতে পারে তাঁর উন্নতির সোপান। সব মানুষই চায়, সে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হবে।

এখন যিনি সভাপতি, তিনি কথা বলেন খুবই কম। যখনই তিনি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, যা তিনি ভালো করে বুঝছেন না, কিংবা কোন ব্যাপারে সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না, তখনই তিনি নীরবতার আশ্রয়ে আত্মগোপন করতেন। আজ এই বাইশে আগস্ট স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকটি সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির ব্যাপারে হোয়াইট হাউসের মনোভাব পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো। শেষে সে বুঝতে পারলো, হোয়াইট হাউস এ ব্যাপার নিয়ে ভাবেইনি। তাদের কোন মতামতই নেই।

সভাপতি বললেন, 'আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'

'পারেন না কি?'

'"ইল্ ত্ন্যাচে"র সমস্যার প্রতি সহানুভূতি আছে আমার—,' তিনি থামলেন, কথাটা রইলো বাতাসে দোদুল্যমান। তাঁর বিরাট সাজানো টেবিলের এক পাশে একজন স্টেনোগ্রাফার বসে রয়েছে, অথচ তাকে কিছু টুকতে বলবেন বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর ছোট্ট চোখ দুটি শান্ত, স্বচ্ছ। হয়তো তিনি ভাবছেন, যে দেশ, যে মহাজাতিকে তিনি শাসন করছেন, তার কথা, তার স্বচ্ছন্দ রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা, তার সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার কথা। প্রায় প্রত্যহ এই ব্যবস্থার কবলে ধরা পড়ছে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মতো কম্যুনিস্টরা, উত্তেজনা সৃষ্টিকারীর দল আর শ্রমিক সংগঠকেরা। ওরা যেন ধরা না পড়ে সন্তুষ্ট হয় না। অথচ তারপরেই আবার যন্ত্রণায় ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে।...

'"ইল্ ত্ন্যাচে"র অসুবিধাটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ওরা দুজন ইতালীয় বলে জাতির সম্মানের প্রশ্ন উঠবে, আর ও দেশের কম্যুনিস্টরা এর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে ছাড়বে। তুরিন, নেপল্‌স্, জেনোয়া, রোম,—এ সব জায়গায় এ নিয়ে বড় বড় মিছিল হয়ে গেছে।' স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকটি কথা বলতে বলতে তার কাগজপত্র উল্টে যাচ্ছিলো। সব রকমের তথ্য নিয়ে সে প্রস্তুত

হয়ে এসেছে। সে বললো, 'এবারে আমি "ইল্ পোপোলো" থেকে খানিক পড়ে শোনাচ্ছি। এ মত একেবারে বেসরকারী মত নয়, স্যার।'

'আমি বুঝতেই পারি না, "ইল্ ডুচে"র কতখানি প্রভাব আছে সংবাদ-পত্রের ওপরে।'

'যথেষ্ট। অন্তত আমাদের অভিজ্ঞতায় এতটা আর দেখিনি। সম্পাদকেরা তাঁদের লেখা দিয়ে কোন ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির তীব্রতাকে হ্রাস করাতে পারেন। ফ্যাসিস্টরা বেশ সুশৃঙ্খল, সব কাজের ওপরেই নজর রাখে তারা। এই দেখুন, এই কাগজ লিখেছে, "আমেরিকাই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সুবিচার পরিবেশন করেছে। সুতরাং তাদের আদালতের রায়ের সমালোচনা কোনক্রমেই করা চলে না।" দেখেছেন, কেমন হিসেবী লোক এরা? এইটেই ফ্যাসিবাদের একটা গুণ। "কিন্তু স্বাধীনতা এবং সুবিচারের কথা বাদ দিলে আমরা মনে করি, এখন ওদের মার্জনা করাই সময়োপযোগী, ন্যায় এবং সুবিবেচনার কাজ হবে।" অবিশ্যি কথাটাকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। কাগজে এরকম একটা সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলে "ইল্ ডুচে"ই শক্তিশালী হন, কারণ জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গেই বলতে বাধ্য হয়, "আহা প্রতিটি ইতালীয়ের জন্য ওঁর কী দরদ!" অথচ তিনি বিচারপদ্ধতি কিংবা রায় নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছেন না, শুধু মার্জনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, কত কম্যুনিস্টকে তিনি হত্যা করেছেন, কত গুলি চালিয়েছেন। বন্দীশালা, অন্তরীণ করা, "ক্যাস্টর অয়েল"—'

"ক্যাস্টর অয়েল" সম্পর্কে সভাপতির ঔৎসুক্য ছিলো। তিনি বললেন, '"ক্যাস্টর অয়েল"এর কথা অনেক শুনেছি। ব্যাপারটা কি?'

'যদ্দূর জানা গেছে, কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে ওটা একটা ব্যবস্থা। ওদের বেঁধে, জোর করে মুখ খুলে খানিকটা ক্যাস্টর অয়েল গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। শুনতে বড় ভয়ানক লাগে, ঠিক যেন স্বয়ং শয়তানের কাজ। কিন্তু আমার মনে হয়, ওদের একটু নাড়া দেওয়ার জন্য এ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো।'

সভাপতি সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি ওদের বেশ নাড়া খাইয়েছেন। ওদের ঠিক পথে চলতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু ওরা বোধহয় আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছে না। রাজ্য রাজ্যই, তার ব্যাপারে সভাপতি হস্তক্ষেপ

করতে পারে না। আদেশ যা হয়েছে, তা পালিত হবেই এবং আজ রাত্রেই সব শেষ হবে। আমি তো আর ম্যাসাচুসেট্সে গিয়ে গবর্নরকে তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করতে পারি না। ওদের প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে ; আর সব দিক বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট সময়ও পেয়েছে ওরা।'

তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে শেষে মিলিয়ে গেলো। অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন তিনি, এতটা সাধারণত বলেন না। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করলেও স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকটি জানত, তিনি কোন কম্যুনিস্টকেই দেখতে পারেন না। ওরা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তবু সমস্ত পৃথিবী-ময় যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তার নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে। সুতরাং সভাপতিকে সব খবর জানানো দরকার। ঠিক এই মুহূর্তে লণ্ডনে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, সংখ্যায় তারা দশ থেকে পনেরো হাজারের কম নয়। এখানে আসার কয়েক মিনিট আগে এ সম্পর্কে সে একটা রিপোর্ট পেয়েছে।

সভাপতি সংক্ষেপে বললেন, 'ওরা আমাদের পছন্দ করে না।'

'ফ্রান্সে দিনরাত মিছিল হচ্ছে, প্যারীতে, তুলোউ, লিয়ঁ, মার্সাইয়ে পঁচিশ হাজার। জার্মানীতে বিরাট বিরাট মিছিল হয়েছে বার্লিনে, ফ্রাঙ্কফোর্টে, হ্যামবুর্গে—'

মনে হলো, এর জন্য কোন দুশ্চিন্তা নেই সভাপতির। তাঁর মুখে বিস্ময় কিংবা অবিশ্বাসের এতটুকু চিহ্ন নেই। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠ, মস্কো, পিকিং, কলকাতা আর ব্রুসেল্সের পথে পথে তাদের বিক্ষুব্ধ পদধ্বনি, তাদের প্রতিনিধিদের আবেদন, তাদের প্রতিবাদের প্রচণ্ড ক্রোধ,—সব যেন এখানে এসে এক মৃদু গুঞ্জনে পর্যবসিত হয়ে গেছে।

'এ নিয়ে সরকারের দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই।' সভাপতি বললেন।

'সেক্রেটারী অব স্টেট মনে করেন লাটিন আমেরিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। সেখানে ওরা ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছে।'

'আমি বুঝতেই পারছি না ওদের দুশ্চিন্তার কী কারণ থাকতে পারে।' সভাপতি প্রায় অবোধের মতো বললেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকটি ভেবে

অবাক হলো, মানুষ কি করে বিরোধী শক্তি এবং ঘটনাস্রোতের প্রতি এমন উদাসীন থাকতে পারে। নিশ্চিন্ত থাকা এক কথা, কিন্তু এই ধরনের উদাসীনতা বিশ্বাসই করা যায় না। সে তার রিপোর্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে গেলো,—ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা, বিক্ষুব্ধ মিছিল, দূতাবাস আর কন্‌সুলেটের দরজা জানলা ভাঙা,—কলম্বিয়ায়, ভেনিজুয়েলায়, ব্রেজিলে, চিলিতে, আর্জেন্টাইনে,—আর দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ—

'দক্ষিণ আফ্রিকায়? সত্যি?' সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

'দূতাবাসগুলো থেকে যা খবর আসছে, তা সত্যি সত্যি বিচলিত করার মতো। হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের উদ্দেশে গর্জন করে উঠেছে।'

এবারে একটু হাসলেন সভাপতি,—রসবোধের হাসি নয়, অবিশ্বাসের হাসি। এই প্রথম তাঁর অবিশ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি। 'সত্যি? এ তো বড় অদ্ভুত! আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই রাশিয়ানরা আছে এর মধ্যে। নইলে, এই দুটো উত্তেজনাসৃষ্টিকারীকে নিয়ে এত তর্জন-গর্জন কেন হবে?'

'এর কারণ আমি বলতে পারবো না স্যার। যা হোক, ব্রিটিশ দূতাবাসের ওঁরা মনে করেন, ম্যাসাচুসেট্‌সের গবর্নরকে দিয়ে এ দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার চেষ্টা করা উচিত।'

সভাপতি মাথা নাড়লেন, 'ভালো করে বিচার করা হয়েছে ওদের।'

'আজ্ঞে—'

'হস্তক্ষেপ করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।'

স্বরাষ্ট্র বিভাগের লোকটি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলো। সভাপতি স্টেনোগ্রাফারকে চলে যেতে বলে খানিকক্ষণ একা বসে রইলেন। তাঁর চিন্তা সুসংবদ্ধ ধারায় প্রবাহিত হতে লাগলো। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হওয়া এক আশ্চর্য ব্যাপার। আজ যখন তিনি ছুটি উপভোগ করছেন, তখনো তাঁর টেবিলে কাজের স্তূপ। তবু সব কাজ চাপা পড়ে আছে, কারণ ওই জুতোর কারিগর আর মাছের ফেরিওয়ালাকে নিয়ে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ ডাকোটার ব্লাক্ হিল্‌সে

গ্রামদেশের এক গোলাবাড়িতে রয়েছেন তিনি, অথচ তবু গোটা পৃথিবীটা রয়েছে তাঁর আঙুলের ডগায়, আর তাঁর পশ্চাতে আছে এমন এক প্রবল সমৃদ্ধিশালী জাতি, যেমনটি মানবজাতির ইতিহাসে কেউ কোনদিন স্বপ্নেও দেখেনি। এ দেশে নতুন এক পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম হেনরী ফোর্ড। তিনি "এসেম্বলী লাইন" বলে একটা চলমান ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন ; প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড পর পর এক-একখানা ফোর্ড গাড়ি বেরিয়ে আসছে এ লাইনের শেষ প্রান্তে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মার্কসবাদের পরিবর্তে ফোর্ডবাদ গ্রহণ করার কথা নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন। এই দেশে প্রত্যেকটি গ্যারাজে থাকবে দুটি করে গাড়ি, প্রত্যেকটি পাত্রে থাকবে একটি করে মুরগী। সংবাদপত্রের একজন কটুভাষী প্রবন্ধ লেখক যেমন লিখেছিলেন, "ধীর গতিতে এই উন্নতি চলতেই থাকবে যতদিন না বাথরুমেরও আবার বাথরুম হবে !" বাজারে ক্রমানুবর্তিত মন্দা আসবে বলে কম্যুনিস্টরা যে ঘৃণিত রূপকথার সৃষ্টি করেছিলো, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। মন্দা আর সংকট নেই আর। এ দেশ আজ যত শক্তিশালী, সম্পত্তিশালী এবং ফলবান হয়ে উঠেছে, তা বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর চিরদিনই এমন থাকবে, তাও অসম্ভব নয়।

এই সমস্ত কিছুকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলো ওই দুটো হতভাগা উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী, ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে আগত দুটো অশিক্ষিত মানুষ, যেখানে জন্ম হয় কৃষ্ণকায় মানুষের, যাদের আত্মা পর্যন্ত কালো। অ্যাংলো-স্যাক্সনদের চেয়ে দেখতে কত বিশ্রী ওরা, কত অস্বস্তিকর তাদের কাছে। ক্রোধ আর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে এসেছিলো ওরা দুজনে। ফলে এই মহান দেশে গ্রেপ্তার হয়েছে ওরা, আর ওদের সঁপে দেওয়া হয়েছে প্রচলিত আইনের হাতে।

কিন্তু তবু সমস্ত পৃথিবী ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ওদের নিয়ে প্রতিবাদে, বক্তৃতায় সমস্ত পৃথিবী দুলে দুলে উঠছে। ব্যাপারটাকে রাশিয়ানদের তৈরি বলে হয়তো রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু ব্ল্যাক হিল্‌সের এই রসকসহীন মানুষটির সমস্যার সমাধান হয় না তাতে। ঘৃণা করেও শান্তি পাচ্ছেন না তিনি, ঘৃণা তাঁর আছে বটে, কিন্তু তা বস্তুনিরপেক্ষ। আর এই জুতোর

কারিগর আর মাছের ফেরিওয়ালাকে তিনি তাঁর ঘৃণার যোগ্য মানুষ বলেও মনে করেন না। কুকুর বেড়াল হত্যা করতে মানুষের ঘৃণার প্রয়োজন হয় না।...

তাঁর চিন্তা স্বকীয় কতগুলো স্মৃতির সূত্র ধরে প্রবাহিত হচ্ছিলো। অল্প কদিন আগে একদিন তাঁর সেক্রেটারী সহজ স্বচ্ছন্দতায় ওয়াশিংটনে তাঁর আপিসে ঢুকে বলেছিলেন, 'বিচারপতি এসেছেন।'

'এখানে ?'

'তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করবার কথা ছিলো।'

'তাতে কি হয়েছে ? আমার আবার কথা,—বুঝলে ? তবে বোকার মতো কথা বলছো কেন ? বিচারপতি এসেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।'

বিচারপতি এমন একটি মানুষ যাকে ভুল করা যায় না, অন্য কোন পরিচয়েরও প্রয়োজন নেই তাঁর। সভাপতি ছাড়া অন্য অনেকেরও মাঝে মাঝে মনে হতো, বিচার এবং আইনের সব কিছু, তার সমস্ত স্মৃতি যেন জড়িয়ে আছে ওঁর বার্ধক্যের শুকনো চামড়ার সঙ্গে।

বিচারপতি সভাপতির আপিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। সভাপতি দাঁড়িয়ে অনুযোগ জানালেন বিচারপতি নিজে আসার জন্য। কিন্তু বৃদ্ধ হাত নেড়ে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। ইনি বৃদ্ধ, সত্যি সত্যিই অতি বৃদ্ধ ইনি। কাগজের মতো শুকনো তাঁর গায়ের চামড়া, চোখ দুটো গভীর গহ্বরে লুকানো, বয়সের ভারে ভেঙে গেলেও গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর কারণ সত্তর বছরের অন্যান্য মানুষের চেয়ে সময় তাঁর অনেক ভালো কেটেছে। তাঁর মস্তিষ্কে অনেক কিছুর স্মৃতি। এই চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন গেট্টিস্‌বার্গের গুলিচালনা,—সমস্ত পাহাড়টাই আবৃত হয়ে গিয়েছিলো মানুষের মৃতদেহে। বৃদ্ধ আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে কথায়বার্তায় অনেক সময় কেটেছে তাঁর। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কত মানুষ সংগ্রাম করে মরেছে, সবই তিনি দেখেছেন, এই অতি বৃদ্ধ মানুষটি। যে কোন কঠোর শাসনকর্তাও তাঁর উপস্থিতিতে সচকিত হয়ে উঠতেন। তিনি নিজেই যেন নিউ ইংল্যাণ্ড, যখন ছোট্ট বোস্টন শহরে পল রিভিয়ারের রূপোর দোকান ছিলো, সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ

পর্যন্ত সব কিছুরই যেন প্রতিনিধি তিনি। সভাপতি অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালেন, কারণ তিনি সভাপতি হলেও এই বৃদ্ধের তাঁর কাছে আসা একটা অনন্য ঘটনা।

সভাপতি বললেন, 'আপনি বসুন দয়া করে।'

সেদিন ওয়াশিংটনে ভয়ানক গরম। বিচারপতি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে সভাপতির টেবিলের পাশে কৃতজ্ঞের মতো বসে পড়লেন। মাথার হলদে শোলার টুপিটা রাখলেন টেবিলের ওপরে আর লাঠিখানা রাখলেন তাঁর শক্ত হাঁটু দুটোর মাঝখানে।

নিজের পদস্থতার সুরে বিচারপতি বলতে লাগলেন, 'দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার জন্য ওরা এসেছিলো আমার কাছে। সেই জন্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম। আমি নিকোলা সাকো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্ কমনওয়েলথের মধ্যে মামলাটার কথা বলছি। শেষ পর্যন্ত ওদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং গবর্নর এই দণ্ডাজ্ঞা পালনের জন্য একটা তারিখও ঘোষণা করেছেন। এই দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। আপনি বোধ করি, মামলাটার মোটামুটি খবর রাখেন।'

'তা রাখি।' সভাপতি বললেন।

'আমি অবিশ্যি খুব বিস্তারিতভাবে এ মামলার কথা সব পড়িনি। তবে এই মামলার ওপরে বোস্টনের এক আইনের অধ্যাপকের লেখা একটা প্রবন্ধের ওপরে চোখ বুলিয়েছিলাম একবার। সাধারণত এ রকম কোন বিশেষ ঘটনার ওপরে লেখা প্রবন্ধ আমি পছন্দ করি না, কারণ এতে জনমত দিয়ে বিচারকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধটি সুচতুরভাবে লেখা। মামলাটির কতকগুলো কৌতূহলোদ্দীপক দিক আছে, ফলে দেশে-বিদেশে একটা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলো দল এই দুটি আসামীকে সন্ত বলে তুলে ধরছে। আজ ওরা যখন দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলো, তখন ওদের আমি বুঝিয়ে বললাম, মামলার বিবরণ থেকে যদি এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন রকমে সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এই দণ্ডাজ্ঞা

নাকচ করে দিতে পারেন। এই মামলায় বিবাদীপক্ষ ইতিমধ্যেই সংবিধান লঙ্ঘনের যুক্তিতে মামলা হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন করেছে। হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনও তারা করেছিলো, সে আবেদন বাতিল হয়েছে। তারপর ওরা এসে যতদিন পুনর্বিচারের আবেদন বিবেচনা করা না হয়, অন্তত ততদিন পর্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। পরিস্থিতি যতই অসাধারণ হোক না কেন, গরমের ছুটির মধ্যে তো আর আদালত বসতে পারবে না। কিন্তু আগস্টেই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করার দিন স্থির করা হয়েছে, ফলে ওদের পুনর্বিচারের আবেদন যখন বিবেচনা করা হবে তার আগেই ওদের মৃত্যু হয়ে যাবে। এই জন্যই দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার আবেদন এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন, পরিস্থিতিটা অস্বাভাবিক। এমন কোন ঘটনা আমার স্মরণ হচ্ছে না যাকে নজির হিসাবে ব্যবহার করে একটা পথ বের করা যায়। আমি জানি না, দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী আমার আছে কিনা, কিন্তু তবু যদি প্রয়োজন হয়, আমি সে ক্ষমতা ব্যবহার করবো। আমার অবিশ্যি মনে হয়, এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয়নি যাতে আদালত এই দণ্ডাজ্ঞা নাকচ কিংবা পরিবর্তন করতে পারে। তা সম্ভব বলেও বিশ্বাস করি না আমি। সুতরাং দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখা উচিত নয় বলেই আমার ধারণা। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মতামত নেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার সপক্ষে কোন ঘটনা অথবা পরিস্থিতির কথা আমার জানা না থাকলেও হয়তো আপনি কিছু জানতে পারেন।'

'না, সেরকম কিছু জানা নেই আমার।' সভাপতি বললেন।

'দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখলে করুণা প্রদর্শন করা হয়েছে বলে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এ কথা আপনি মনে করেন না?'

'না।'

বৃদ্ধ সভাপতিকে তাঁর মতামতের জন্য গম্ভীর কণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সভাপতির এখন এই সব কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ম্যাসাচুসেট্সের এক আইনের অধ্যাপকের লেখা প্রবন্ধটির কথা।

'কোথায় দেখেছি ওর নামটা?' সভাপতি ভাবতে লাগলেন। তারপর

কাগজপত্র ঘেঁটে একটা টেলিগ্রাম খুঁজতে লাগলেন। আজই এসেছে সেটা। খুঁজে বের করে আবার সেটা পড়তে লাগলেন, 'যথাবিহিত শ্রদ্ধা এবং বিনয় সহকারে আমি শপথ করে বলছি, এই মানুষ দুটির নির্দোষিতার প্রমাণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এই প্রমাণ যদি সামান্যতম ভাবেও গ্রাহ্য হয়, তা কি আমাদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত নয়? আমি মার্জনার অনুরোধ করছি না, আইনের পরিপূর্ণ প্রয়োগই আমি চাই। আইনই যদি না থাকে, তবে আর কি থাকবে আমাদের? কোথায় আশ্রয় পাবো আমরা? কিসের আড়ালে আত্মরক্ষা করবো? আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি ম্যাসাচুসেট্সের গবর্নরকে তার করে দণ্ডদান স্থগিত রাখুন। চব্বিশ ঘণ্টা স্থগিত রাখলেও অনেক সাহায্য হবে।...'

টেলিগ্রামটির নাছোড়বান্দা সুরে বিরক্ত হলেন সভাপতি। নিচে প্রেরকের নামটি দেখলেন। পরিষ্কার এক ইহুদির নাম। বিচারপতি তো এই নামটিরই কথা বলেছেন। ইহুদিরা এমন অবোধের মতো নাছোড়বান্দা হয় কেন?

বিরক্তির সঙ্গে টেলিগ্রামটা সরিয়ে রাখলেন তিনি। আজ আরো এক-গাদা টেলিগ্রাম তিনি পেয়েছেন, তার একটারও জবাব দেননি, দেবেনও না। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অস্বস্তি এবং শ্রান্তিতে ভরে গেছে তাঁর মন।

দশ

আইনের অধ্যাপকের দেরি হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের লেখকের সঙ্গে বিকেল তিনটেয় তাঁর দেখা করবার কথা ছিলো। তিনটে বেজে গেছে, অথচ প্রতি-রক্ষা কমিটির আপিসেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। ওরা বলেছিলো, লেখক হয়তো রাজ্যভবনের সামনে পিকেট লাইনে যোগ দিতে গেছেন, কিংবা গেছেন টেম্পল্ স্ট্রীটে। অধ্যাপক বেকন্ স্ট্রীট ধরে সেখানেই যাচ্ছিলেন তাঁর খোঁজে। আর যতই সময় কাটছিলো, ততই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন একটু দূরে বন্দীশালায় অপেক্ষমান মানুষ দুটি সম্পর্কে।

কত যে বিচিত্র মনোভাব, কত রকমের অভিজ্ঞতা যে হলো তাঁর

আজ এই একটিমাত্র দিনে। এর মধ্যেই এক কাণ্ড হয়ে গেলো, আর বাকি দিনটা ভরে আরো কত অভিজ্ঞতা হবে। যা নিশ্চিত, তা আজ অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে অনিশ্চিতের সঙ্গে,—এমনভাবে মিশে গেছে যে মনে হয় আজ এই অনন্য ভয়ানক দিনটিতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি মুহূর্তের নিজস্ব একটা বিশেষ অর্থ আছে। এ অর্থ খুব স্বচ্ছ নয়, আর তিনিও খুব স্বচ্ছভাবে ভাবতে পারছেন না। তাঁর অস্তিত্বই যেন এই দিনটির সঙ্গে মিশে গেছে। এই দিনটির গতি, তার উত্তাপ, তার হিংস্রতা, ক্রোধ আর অন্তর্বেদনা, সব মিলে তাঁর মনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে যে এই উত্তপ্ত অপরাহ্নে পথ চলতে চলতে কতগুলো তারিখ আর ঘটনা মনে মনে আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন তিনি। দ্রুত সংঘটিত কতগুলো ভয়ানক ঘটনা চোখে দেখলে যেমন হয় ঠিক তেমনি অনুভূতি এসেছে তাঁর মনে বিগত কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায়। সুদূর অতীতকে মনে হচ্ছে কালকের ঘটনা বলে, কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাসের সমস্ত ঘটনাকে মনে হচ্ছে একটি দিনের ঘটনা বলে। আজ এখন কেবল সোমবারের বিকেল, অথচ এত স্মৃতির ভিড়ে গতকাল রবিবারের চব্বিশটি ঘণ্টা যেন হারিয়ে গেছে সুদূর অতীতের অন্ধকারে।

তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির কাছে আজ দিনটি কিসের মতো লাগছে, তাদের মুহূর্তগুলো কেমন করে কাটছে, সময়কে আজ তাদের দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে কিনা। তিনি উপলব্ধি করলেন, আজ এই সোমবার বোস্টনের আরো অনেকের মতোই তিনি নিজেও যেন একাত্ম হয়ে গেছেন সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে। তাই যখনই ভাবলেন, ওদের সময় কেমন করে কাটছে, তখনই একটা হিমশীতল ভীতিবোধ অনুভব করলেন অন্তরে। মুহূর্তে ওদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গেলেন তিনি, ওদেরই চোখ দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। এ কথা কল্পনা করে তাঁর মনে হলো, হৃদপিণ্ডটা ধক্‌ধক্ করে উঠছে। তিনি বুঝতে পারলেন, প্রতি বছর গ্রীষ্মকালের এই দিনটিতে ওই জুতোর কারিগর আর মাছের ফেরিওয়ালার অন্তর্বেদনা উপলব্ধি করে আরো অনেকের মতো তাঁকেও বার বার মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করতে হবে।

নিঃসংশয়ভাবে লেখকেরও এই একই অবস্থা, ওদের অন্তর্বেদনা আর

তাঁর অন্তর্বেদনা এক হয়ে গেছে। নইলে কেন তিনি আজ বোস্টনে এসেছেন? আইনের অধ্যাপক এখন যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যস্ত-ভাবে চলেছেন, তিনি তাঁকে দেখেননি কোনদিন। তবু মনে হলো যেন ওর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অনেকদিন ধরে সংবাদপত্রে এই লেখকের লেখা পড়েছেন তিনি; তাঁর তীব্র বিদ্রূপ, অসীম সহজাত বুদ্ধি আর তাঁর সহৃদয় অন্তরের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়েছেন। অধ্যাপকের মতোই আবেগপূর্ণ হৃদয় লেখকেরও। বিদ্রূপে যেমন নিষ্ঠুর, ভাবপ্রবণতায় তেমনি কোমল হতে পারতেন বলেই দুয়ের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটু আশঙ্কা ছিলো আইনের অধ্যাপকের মনে। তিনি ভাবলেন, এইসব ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছেন আজ? পরক্ষণেই বুঝলেন, ক্ষুদ্র আর বৃহৎ সম্ভাবনার সমন্বয়েই সৃষ্ট আজ দিনটি। এর কিছুটা যেমন অলীক বাকিটা তেমনি গভীরভাবে বাস্তব। কারণ পৃথিবীর অস্তিত্ব যখন শেষ হয়ে আসবে, মানুষ তখনো হাসবে, খেলবে, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পথ খুঁজবে।

অধ্যাপক রাজ্যভবনের খুব কাছাকাছি এসে গেছেন। পিকেট লাইন থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিনি পথচারীদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। সেখান থেকেই দেখতে পেলেন, আগস্টের এই প্রখর রৌদ্রে দীর্ঘকায় স্থূলবপু লেখক ভালুকের মতো হেলে দুলে এগোচ্ছেন আর পেছোচ্ছেন। তাঁর চুল এলো-মেলো, পোশাক অগোছালো, যেন নিজের মধ্যেই ডুবে আছেন তিনি। ওঁকে দেখেই অধ্যাপকের স্থির বিশ্বাস হলো, এই লোকটি লেখক ছাড়া আর কেউ নন, ওঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এসেছেন তিনি। এগিয়ে এসে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। লেখক লাইনের বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলার ওপরে লেখা তাঁর প্রবন্ধটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

লেখক বললেন, 'এই কথা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বলবার জন্য দীর্ঘ-কাল অপেক্ষা করে আছি, কারণ আপনি আমার, বন্দীশালার ওই মানুষ দুটির আর আরো হাজার হাজার মানুষের এক বিরাট উপকার করেছেন। এই মামলার সমস্ত জটিলতার মধ্য থেকে নির্যাস করে সহজ সরল সত্যকে তুলে ধরেছেন আপনি। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার কাছে

চিরঋণী থাকবো।'

অধ্যাপক অপ্রস্তুত বোধ করলেন,—প্রশংসার জন্য নয়। অপ্রস্তুত হলেন এই ভেবে যে অন্তত আজকের দিনটিতে তাঁর কাজকে প্রশংসা করা সমীচীন নয়। রাজ্যভবনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, যে জগতে বাস করছেন তিনি, সেখানে যুক্তির অপমৃত্যু হয়েছে। লেখককে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'সত্যকে তবু প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি, ওরা যুক্তির ধার ধারে না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গবর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় উৎরে গেছে, না?'

'একটু দেরি হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আপত্তি করবেন না।'

'আমি বুঝতেই পারছি না, উনি কেন রাজি হলেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সব কিছুই তো আজ ওঁর বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগতভাবে ওঁরই বিরুদ্ধে।'

'কিন্তু দেখুন, আজ নিজেকে নিয়েই মুশকিলে পড়েছেন তিনি।' অধ্যাপক বুঝিয়ে বললেন, 'আমার বিশ্বাস সময় পেলে আজ সবার সঙ্গেই দেখা করবেন তিনি। ওই রাজ্যভবনে বসে তিনি সবার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবেন, সবার বক্তব্য শুনবেন, শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটু নড়বেনও না। আজ যেন তাঁর নিজেরই বিচার এবং মুক্তির অভিজ্ঞতা হচ্ছে। আমার মনে হয় তাঁর বিশ্বাস, আজ দিনটি কাটিয়ে দিতে পারলেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির সমকক্ষ হবেন, অবিশ্যি ভবিষ্যতে মনোনয়ন লাভ আর নির্বাচনের ব্যাপারটা বাদ দিলে।'

অধ্যাপকের কথা বলার সময় লেখক উৎসুকভাবে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন, অবাক হচ্ছিলেন তাঁর কোমল অথচ প্রত্যয়পূর্ণ কণ্ঠস্বরের তিক্ততায়। ওঁর কথা শুনে ওঁকে দেখে লেখক আর একবার আজকের এই গ্রীষ্মের দিনটিতে বোস্টন শহরের বিস্ময়কর জটিল রূপটির কথা ভাবলেন। নিজে লেখক বলে আজ তাঁর এখানে এসে সব চাক্ষুষ করার পশ্চাতে খানিকটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিলো। সব ঘটনা, সব মানুষগুলোকে মনে মনে গেঁথে

ফেললেন তিনি।

তিনি মনে মনে বললেন, 'এখন আমি ম্যাসাচুসেট্স্ সরকারের আওতার মধ্যে যাচ্ছি। এই বাড়িতে একটি সামান্য মানুষ আজ একদিনের জন্য দেবতা সেজে বসে আছে। ওকে করুণা করবো কিনা, তা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। ওর শয়তানি বুঝতে পেরেছি আমি। এ এক প্রাচীন ধরনের শয়তানি। পাষাণের মতো কঠিন হৃদয় নিয়ে ও বসে আছে অতীতের ফারাওর মতো। ওর মূল্য নাকি চার লক্ষ ডলারেরও বেশি। সেদিক থেকে ও ফারাওর সমকক্ষ, হয়তো তার চেয়েও বড়। সমস্ত মিশরের সম্পদের চেয়ে ওর নিজের সম্পত্তি কম নয়। ম্যাসাচুসেট্স্ কমনওয়েলথ শাসন করছে ও; প্রাণ দেওয়ার শক্তি না থাকলেও প্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে। অসংখ্য ফাঁদ পেতে বসে আছে ও, তাই মানুষটি বড় ভয়ানক। অনেক অন্যায় প্রশ্রয় পাচ্ছে এ দেশে, কিন্তু একটিমাত্র মানুষের হাতে অন্য সবার জীবনমৃত্যুর প্রশ্নকে ছেড়ে দেওয়ার মতো ভয়ানক অন্যায় বোধ করি আর কিছু হয় না।

এমনি করে লেখক সমস্ত দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশ জুড়ে জুড়ে এক সাহিত্যিক সমগ্রতার সৃষ্টি করলেন। এমনি করেই কাজ করতেন তিনি। এই সৃষ্টির প্রবাহকে রোধ করা তাঁর স্বেচ্ছায় শ্বাসবন্ধ করে থাকারই সামিল। আইনের অধ্যাপকের পক্ষে ব্যাপার অবিশ্যি অন্য রকম। তাঁর মনে সন্দেহ আর ভয় শ্রান্তির সঙ্গে মিশে গেছে। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগলো, তিনি জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, 'দয়া করে এখন আমাদের বাধা দেবেন না। গবর্নরের সঙ্গে তিনটের সময় সাক্ষাৎকারের কথা ছিলো আমাদের। এমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। আর ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে কিই বা বলতে পারবো আপনাদের?'

'ভাঞ্জেত্তির বোন এখানে আসছে, এ কথা কি সত্যি?' ওরা জানতে চাইলো।

'সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।' আইনের অধ্যাপক জবাব দিলেন। কিন্তু লেখক এরই মধ্যে তাঁর অন্তরের আলেখ্যটিতে একটি মেয়ের ছবি এঁকে ফেলেছেন, দূরদেশ থেকে মেয়েটি এসেছে তার ভাইয়ের জীবন

রক্ষার চেষ্টায়। মনে মনে তিনি উপলব্ধি করলেন এর সহজ অথচ বিস্ময়কর নাটকীয়তা, যে নাটক শুধু জীবনের স্পর্শ পেয়েই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

ওঁরা দুজনে গবর্নরের আপিসে এলেন। গবর্নরের সেক্রেটারি ওঁদের নম্রভাবে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ম্যাসাচুসেট্‌স্ কমনওয়েলথের গবর্নর ওদের অভ্যর্থনা করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখাবয়বে বন্ধুত্ব বা শত্রুতার কোন ভাবের প্রকাশ নেই। তিনি তার টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন যেমন বসে থাকে তাঁর জগতের অন্যান্য সামান্য মানুষেরা; ওঁদের দেখছিলেন তাঁদেরই মতো খানিক সন্দেহ, খানিক ভয় আর খানিক ঔৎসুক্য নিয়ে। এই মানুষ দুটি তাঁর কাছে আগন্তুক, অস্বস্তিকর। তাঁর প্রাচীন গৌরবের আসনের একাধিপত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা।

অনেক, অনেক দিন আগে এই দেশের পত্তন করতে এলেন "পিলগ্রিম ফাদারে"রা। তাঁরা এবড়োখেবড়ো তক্তা দিয়ে ঘর তৈরি করলেন, ছাদ করলেন নিচু। কিন্তু তবু এই সামান্য নিরলঙ্কার বাসগৃহগুলোর একটা গৌরবময় মর্যাদা ছিলো। কালে কালে জীবনধারার পরিবর্তন হলো, সাদা-সিধেভাবে জীবন যাপনের মধ্যে কোন গৌরব রইলো না আর। এই রাজ্যভবন প্রাচীন হলেও সেদিনের মতো প্রাচীন নয়। যে ঘরে আজ গবর্নর বসে আছেন তা এক অভিজাত সৌন্দর্য এবং স্বর্ণখচিত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন; তার দরজার কাঠামোয় সুন্দর খোদাইয়ের কাজ, ঘরের কাঠামোর কাঠ সাদা এনামেল দিয়ে মোড়া; ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব সুদক্ষ শিল্পীর হাতে তৈরি। এমন ঘরে চার লক্ষ ডলার মাইনের মানুষটির অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার কারণ নেই কিছু। কিন্তু আইনের অধ্যাপক এবং নিউ ইয়র্কের লেখক ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন আইনের চোখে তাঁরা অপরাধী, যেন আদালতের আসামী তাঁরা।

তাঁদের পোশাক কুঁচকে গেছে, ঘামের দাগ পড়েছে তাতে। গ্রীষ্মকালের উপযোগী আইভরি স্যুট পরেছেন লেখক, তাঁকে দেখাচ্ছে যেন মানুষের বাসস্থানে মানুষের পোশাক-পরা একটি ভালুকের মতো। আইনের

অধ্যাপকের পোশাকটাও কেমন বিশ্রী, তিনি শোলার টুপিটা ঘামে-ভেজা হাতে করে ঘোরাতে লাগলেন।

ওঁরা তদ্বির করতে এসেছেন : গভর্নর বুঝতে পারলেন, আজ তাঁর কাছে যত লোক এসেছে,—বড়, ছোট, বিখ্যাত, অখ্যাত, ধনী, দরিদ্র,—তাদের মতোই ওঁরাও এসেছেন তদ্বির করতে, দুটো নোংরা উত্তেজনা-সৃষ্টিকারীর জীবন ভিক্ষা করতে, যারা গবর্নরের জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে ভেঙেচুরে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন পণ করেছে। এই দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন ব্যাপারটাকে। এদের দুজনের দিকে তাকিয়েও তিনি এই কথাই ভাবছিলেন। তিনি মনে কোন আবেগ অনুভব করছেন না। আজ দিনটিতে তাঁর মনে আবেগের এতটুকু বাষ্পও নেই। তিনি তাঁর মনকে আজ এই ঘরের আওতায় আবেদন নিবেদন শোনার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেননি। মন তাঁর ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। যা কিছু করেন তিনি, তা নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর উদ্দেশ্য দিয়ে ; তিনি জানতেন, তিনি কি করছেন, কেন করছেন। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন সবার কথাই আজ শুনবেন। সবাই এসে দেখে যাক, তিনি চোখ কান বন্ধ করে বসে নেই।

সুতরাং সবার কথা শুনলেন তিনি। সবার বক্তব্যকে যাচাই করে দেখলেন। তিনি ধৈর্যশীল, ন্যায়নিষ্ঠ,—নিষ্ঠুর নন তিনি। যারা আগে এসেছিলো তাদের মতোই হয়তো এই লেখক আর অধ্যাপক তাঁকে নিষ্ঠুর বলেই মনে করবেন ; কিন্তু তা হলে অন্যায় করা হবে। ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া নিষ্ঠুরতা নয়। অন্যেরা যেমন চায় তেমন চোখ নিয়ে সব কিছু দেখলে তিনি কি করে তাঁর কর্তব্য পালন করতেন? এখন তিনি তাকিয়ে দেখছেন এই দুটি বিশ্রী মানুষকে, যাঁরা ছোটলোকের মতো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,—ওঁদের একজন ইহুদি অধ্যাপক, অন্যজন সংবাদপত্রের লেখক। প্রগতিশীল এবং একটু মাথা খারাপ বলে ওঁর খ্যাতি আছে। ওঁদের দেখতে দেখতে তিনি ভাবছিলেন, এই ভয়ানক ব্যাপারটা চরমে উঠতে শুরু করার পর থেকে তিনি নিজে কতটা নির্যাতিত হয়েছেন, কত মানুষের অভিশাপ কুড়িয়েছেন! ভাবতে ভাবতে নিজের প্রতিই করুণা হলো তাঁর।

সবাই তাঁকে বলতো "পন্টিয়াস্ পাইলেট"। অথচ "পাইলেটে"র কীইবা আছে তাঁর? সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর পেটের গণ্ডগোল হয়, হৃদ-রোগের ভয় আছে তাঁর, আর সাধারণ মানুষের মতোই তিনি চান সব কাজ সহজে করতে, চান বিরোধীদেরও সন্তুষ্ট রাখতে। ধনী বলেই তিনি খারাপ লোক হবেন তার কোন মানে নেই। এই তো মাত্র মাসখানেক আগে নদীর ওপারে বন্দীশালায় গিয়ে তিনি নিজে আলাপ করে এসেছেন সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে। ওদের বোঝা উচিত ছিলো, কমনওয়েলথের গবর্নরের পক্ষে সশরীরে এসে দুটো খুনের আসামীর কাছ থেকে তাদের বক্তব্য শোনার কী গুরুত্ব; এর জন্য ওদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখানো দূরের কথা, সাক্কো কথা না বলে ভয় এবং ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো। ভাঞ্জেত্তি ক্ষমা চাইবার মতো করে বলেছিলো, 'আপনার প্রতি ওর ঘৃণা নেই, কিন্তু যে শক্তিকে ও ঘৃণা করে আপনি তারই প্রতিনিধি।'

'কোন্ শক্তি?'

'সম্পদ আর ক্ষমতার।' ভাঞ্জেত্তি শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলো। ওরা দুজনে একটুকাল আলাপ করেছিলো। কিন্তু তারপরই সাক্কোর চোখের মতোই ভাঞ্জেত্তির চোখেও ক্রোধ আর ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলেন গবর্নর।

এ দৃষ্টিকে তিনি ভুলতে পারেননি, ক্ষমাও করতে পারেননি। মনে মনে বলেছিলেন, "বেশ, হতভাগা কম্যুনিস্টের দল, ইচ্ছে হয় তো এই রকমই ভাবিস!"

এখন ওই হতভাগা কম্যুনিস্টদের জন্য আবেদন করতে এসেছেন দুজন। সমস্ত পৃথিবীই আবেদন নিয়ে এসেছে গবর্নরের কাছে। এখন এসেছেন একজন অধ্যাপক, আরেকজন লেখক। এর আগে এসেছিলেন একজন পাদ্রী, আরেকজন কবি। এর পরে আসবে আরো দুজন, দুই মহিলার আসার কথা আছে।

অধ্যাপক বিলম্ব হওয়ার জন্য মার্জনা চাইলেন। বললেন, এমন কতগুলো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যার জন্য সময়মতো আসতে পারেননি তিনি। তার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ তাঁর জীবনের সমস্ত সাক্ষাৎকারের মধ্যে

এইটেই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

'ও কথা কেন বলছেন আপনি?' গবর্নর জানতে চাইলেন। তাঁর কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীটির মধ্যে ভান করা কিছু নেই। এ কথা বুঝতে একটু সময় লাগলো অধ্যাপকের। কিন্তু লেখক মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলেন লোকটি নির্বোধ। এমনি একটি নির্বোধ লোক, আবেগ বা যুক্তি যাকে স্পর্শ করে না, তার হাতে মৃত্যুদণ্ডের চরম ক্ষমতা রয়েছে, তা যেন বিশ্বাস হয় না, এ যেন সামঞ্জস্যহীন। আর এই অভিজ্ঞতা যেন আজকের এই অভিশপ্ত দিনটির সব অভিজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ। কিন্তু তবু যা চোখে দেখলেন তিনি, যা কানে শুনলেন, তা মেনে নিতে পারলো না তাঁর সভ্য মন। তাঁর মন বললো, নির্বোধ কেউ ক্ষমতার আসনে বসতে পারে না, নির্বোধকে নিশ্চয়ই চার লক্ষ ডলার মাইনে দেওয়া হয় না। তিনি মনে মনে বললেন, "একটা মামলার তদ্বির করতে এসেছি, একটা উদ্দেশ্যসাধন করতে এসেছি আমি। সুতরাং এই মানুষটির বুদ্ধিবৃত্তিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।"

আইনের অধ্যাপক ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন। বিনীতভাবে হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন তিনি। বলছেন, গবর্নরের সময় নষ্ট করতে তিনি আসেননি। তিনি এসেছেন কারণ সমস্ত পৃথিবী জানে, সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির এই মামলা সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল, অনেক বছর ধরে এর প্রত্যেকটি ঘটনাকে গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তিনি অনুধাবন করেছেন এবং সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে অনেক নতুন যুক্তি পেয়েছেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতেই অধ্যাপক প্রায় তিক্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছেন। লেখক ভেবে অবাক হচ্ছিলেন, মানুষ কেমন করে এমন বিনয়ী হয়েও এত আন্তরিক হয়ে উঠতে পারে। মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে সাহিত্য সৃষ্টি করাই লেখকের কাজ। সুতরাং কোন্ তীব্র প্রয়োজনবোধ তাড়িয়ে এনেছে অধ্যাপককে, আর কোন্ ভয়ানক অনু-প্রেরণায় দুটি প্রাণ নিতে যাচ্ছেন গবর্নর, তা জানার জন্য তীব্র কৌতূহল জাগলো তাঁর মনে।

গবর্নর বললেন, 'আমি অধৈর্য হতে চাই না, কিন্তু আপনারা উপলব্ধি করুন, আজ কদিন পর্যন্ত লোকের পর লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

বলছে, হয় তাদের হাতে নতুন কোন প্রমাণ আছে, কিংবা পুরাতন প্রমাণের নতুন কোন ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারবে তারা। আমি অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য শুনেছি, কিন্তু তারা এমন কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি যা নতুন, অথবা যার ফলে এই মামলার প্রতি আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্তিত হতে পারে। মামলার সমস্ত নথিপত্র ঘেঁটে, আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে এবং অসংখ্য সাক্ষীর সঙ্গে আলাপ করে জুরিদের মতোই আমারও বিশ্বাস হয়েছে, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি অপরাধী এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচারই করা হয়েছে। যে অপরাধের জন্য ওদের শাস্তি হচ্ছে তা সংঘটিত হয়েছিলো সাত বছর আগে। ছ বছর ধরে আপীলের পর আপীল করে দণ্ড বিলম্বিত করানোর সব পন্থাকেই ব্যবহার করা হয়েছে—'

আইনের অধ্যাপকের সমস্ত অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। একটু আগেও উত্তপ্ত বোধ করছিলেন তিনি, আর এখন হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে একটা শৈত্য অনুভব করলেন, ম্যালেরিয়ার রোগীর শৈত্যের মতো। বিগত কয়েকদিন ধরে তিনি শুনে আসছিলেন, ওদের মার্জনা করার জন্য কিংবা দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার অনুরোধ নিয়ে যে-কেউ গবর্নরের কাছে এসেছে, তাদের সবাইকেই তোতাপাখীর মতো তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বলে দিয়েছেন। তেসরা আগস্ট তিনি এই পুরনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। এবং সেটা প্রায় মুখস্থ করে রেখেছেন। এই সব কাহিনী সহজভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি আইনের অধ্যাপক। তিনি ভাবতেন, এগুলো নোংরা গুজব। অবশ্য এ ধরনের ঈর্ষামূলক দুর্নাম এমন শহরে গবর্নরের সত্যিকারের দোষগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখন এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজেরই সেই অভিজ্ঞতা হচ্ছিলো। তিনি শুনছিলেন, গবর্নর তাঁর সরকারী সিদ্ধান্তের খানিকটা মুখস্থ বলে যাচ্ছেন; আর এই শোনা যেন তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে ভয়াবহ। তিনি বুঝতে পারলেন গবর্নর তাঁর সরকারী সিদ্ধান্ত আবৃত্তি করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত কক্ষটির আবহাওয়া বদলে গেলো; সমস্ত পৃথিবী যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তাঁর মনে হলো, সামনে কমনওয়েলথের এক কঠিন হৃদয় প্রতিক্রিয়াশীল

নেতার পরিবর্তে বসে আছে এক শূন্যগর্ভ পাত্র, যার মানুষের মতো চেহারাটা অবস্থাটাকে শুধু আরো অলৌকিক করে তুলেছে। অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ছিলো বলেই অনেক চেষ্টা করে অধ্যাপক তাঁর চিন্তাধারাকে সুসংহত রেখে যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য বলে যেতে পারছিলেন।

তিনি বললেন, 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। যা আমি বলতে যাচ্ছি আগে থেকেই তার বিচার করে রাখা উচিত হবে না। এখানে আসার আগে আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমি আপনার কাছে মার্জনার অনুরোধ করবো, না সুবিচার প্রার্থনা করবো। খানিকটা সংশয় থাকলেও আমি স্থির করেছি, মার্জনার অনুরোধ করবো না আমি—'

গবর্নর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'গোড়াতেই আমার মনে হয়েছে, অনেক সৎবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই আসামীদের অপরাধ কিংবা নিরপরাধিতা নিয়ে এবং বিচারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। আমার মনে হয়েছে—'

আইনের অধ্যাপক বুঝতে পারলেন, গবর্নর আবার তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্বাভাবিক ভীতি আবার বাড়তে লাগলো। তাঁর হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে এলো, একটা অসুস্থতাবোধ, বমি-বমি ভাব এবং উত্তাপ, শৈত্য আর মস্তিষ্কবিকৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা অনুভূতি প্রাণপণ দাবিয়ে রেখে অতিকষ্টে তিনি গবর্নরের বক্তব্য শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। গবর্নর থামলে তিনি আবার বলতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হলো গবর্নর তাঁর কথা শুনছেন কিনা, কিংবা শুনলেও অনুধাবন করছেন কিনা। অধ্যাপক বলতে লাগলেন, তিনি মার্জনা ভিক্ষার জন্য আসেননি, এসেছেন সুবিচারের আশায়। ধীরে ধীরে সতর্কতার সঙ্গে তিনি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির পক্ষের মোট কিঞ্চিদধিক একশো সাক্ষীর বক্তব্য সংক্ষেপে বলে গেলেন। যারা শপথ করে বলেছিলো, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিতই থাকতে পারে না, তাদের বিবৃতির এক-একটি অংশ তিনি বার বার বললেন। সরকারী সাক্ষীদের বক্তব্যকে তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁর নখাগ্রে ছিলো, তাই ওদের নিরপরাধিতার পক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত, নিঃসন্দেহ, সুসংবদ্ধ বিবৃতি দিতে তাঁর পনেরো

মিনিটও লাগলো না। সাক্ষ্যপ্রমাণের বিশ্লেষণ শেষ করে আইনের অধ্যাপক বললেন, 'অদৃষ্টের সবচেয়ে তিক্ত পরিহাস হচ্ছে, ভাঞ্জেত্তি তার সারা জীবনেও একবার দক্ষিণ ব্রেনট্রিতে যায়নি। এ কথা ভাবলেও দুঃখ হয়,— আজ যদি ভাঞ্জেত্তির জীবনাবসান হয়, তবে সে তার তথাকথিত অপরাধের স্থানটি না দেখেই মরবে।'

অধ্যাপকের বক্তব্য শেষ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য গবর্নর ভদ্রতা করে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। যখন দেখলেন ওঁর বক্তব্য শেষ হয়েছে, তখন আবেগহীন স্বচ্ছন্দতায় বলতে লাগলেন, 'অন্যের চোখ নিয়ে ছ বছর পিছনে ফিরে তাকানো অত্যন্ত কঠিন। সাক্ষীদের অনেকেই এমনভাবে তাদের কাহিনী বলেছে যে আমার মনে হয়েছে, ওরা স্মৃতি থেকে বলছে না, বলছে আবৃত্তি করার মতো। কেউ কেউ বলছে, ছ বছরে সব ঘটনা ভুলে গেছে তারা, মনে করতেও পারছে না। বুঝতে পারলেন ? অস্বস্তিকর বলেই ঘটনাটাকে ভুলতে চেষ্টা করছে ওরা।'

গবর্নর কথা থামিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন অধ্যাপক আর লেখকের দিকে। অধ্যাপক আবার একটা শৈত্য, অসুস্থতা এবং অস্বস্তি অনুভব করলেন, কারণ গবর্নর আবার তাঁর মুখস্থ করা সিদ্ধান্ত থেকে খানিকটা আবৃত্তি করেছেন। অধ্যাপকের মনে হলো তিনি আর কথা বলতে পারবেন না। তিনি করুণ দৃষ্টিতে লেখকের দিকে তাকালেন, আর ভাবতে লাগলেন লেখক গবর্নরের চিন্তাশীল এবং সংযত বক্তৃতার উৎসটি বুঝতে পেরেছেন কিনা।

লেখক সোজাসুজি বললেন, 'আমি অবিশ্যি মার্জনাই ভিক্ষা করবো। নির্যাতিত যীশু খৃস্টের স্মৃতির নামে আমি খৃষ্টীয় করুণা ভিক্ষা করবো।'

গবর্নর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এ করুণার প্রশ্ন নয়। দক্ষিণ ব্রেনট্রির ঘটনাটা অত্যন্ত হিংস্র। লুণ্ঠনের জন্য ক্যাশিয়ার এবং রক্ষীকে খুন করার প্রয়োজন ছিলো না। করুণা চাওয়া এখানে অন্যায়। আদালতে ওদের বিচার হয়েছে। বিচারের সময়ে নানা উপায়ে ছ বছর ধরে ব্যাপারটাকে বিলম্বিত করে দেওয়া হয়েছে। আমার মতে এই বিলম্বের ক্ষমা নেই এবং একে আর বিলম্বিত করার পক্ষে আমি কোন যুক্তিই পাচ্ছি না।'

লেখকের গভীর গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, 'আমার বন্ধু দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখার জন্য অনেক যুক্তি দিয়েছেন। আমি খৃষ্টীয় করুণা চাইছি। অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে আপনাকে প্রতারণা করা হবে যদি আমি না বলি, যে এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়, প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাস ছাড়া ওদের আর কোন অপরাধই নেই। কিন্তু যদি মনেও করি যে ওরা অপরাধী, তবুও কি ওদের যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করা হয়নি? মানুষের মৃত্যু বিধাতারই দান। কিন্তু তাঁর দানের মহত্ত্ব হচ্ছে, মানুষ জানে না সে কখন মরবে। কিন্তু এই দুটি হতভাগ্য মানুষ সাত সাত বছর ধরে বারবার মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে। আজ দিনটিতে তাদের অনুভূতির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এ কথা ভেবে কি আপনার অন্তর একটুও বিচলিত হয় না? আমার বন্ধু এবং আমি, আমরা দুজনেই আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন মানুষ। তবু ক্রীতদাসের মতো আমাদের মর্যাদা, আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা আপনার কাছে ওদের জীবন ভিক্ষা করছি।'

গবর্নর একটিমাত্র কথা বললেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

তিনি যেন হঠাৎ আন্তরিক হয়ে উঠেছেন। এই একটিমাত্র কথায় যেন তাঁর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জানতে চাইছেন, ওরা কেন সাকো আর ভাঞ্জেত্তির জন্য লড়তে এসেছে। অন্যেরাই বা কেন এসেছিলো। তাঁর প্রশ্নটির ধরনে মনে হলো, এঁরা কেউ যদি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন কেন সাকো আর ভাঞ্জেত্তির প্রাণদণ্ড হবে না, তবে তাঁর প্রতি তিনি সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকবেন।

এখন নিউ ইয়র্কের লেখকও অধ্যাপকের মতোই ভীতি অনুভব করলেন। এই সরল অথচ ভয়ঙ্কর এক-কথার প্রশ্নটি তাঁদের নির্বাক করে দিলো। পরের ঘটনার জন্য নীরব হয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই। গবর্নরও অপেক্ষা করতে লাগলেন। কক্ষের বাতাস ভারী হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো; বাতাসে যেন প্রাণ নেই। এক কোণে অতি প্রাচীন একটা ঘড়ি তারস্বরে টক্‌টক্‌ করতে লাগলো। তবু তিনজনেই চুপচাপ অপেক্ষা করে রইলেন। কী হতো এর পরে, কেউ বলতে পারে না, কারণ এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি যখন সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলো, ঠিক তখন দরজা ঠেলে

ঢুকে গবর্নরের সেক্রেটারী বললেন, মিসেস সাকো এবং মিস লুইজিয়া ভাঞ্জেত্তি বাইরে অপেক্ষা করছে। ভাঞ্জেত্তির বোন লুইজিয়া, ভাইয়ের জীবনভিক্ষা করতে সে এসেছে সুদূর ইতালী থেকে। গবর্নর যদি অনুমতি করেন, ওরা এখনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারে। গবর্নর তখন মাপ চাইবার ভঙ্গীতে অধ্যাপক এবং লেখকের দিকে তাকালেন; ওঁরা আসতেই দেরি করেছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এই মহিলা দুটির তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিলো। আরো অনেক কাজ আছে তাঁর এবং আজকের দিনটি তাঁকে হিসেবমতোই চলতে হবে। অবিশ্যি ওঁরা যদি থাকতে চান তবে মিসেস সাকো এবং মিস ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে তাঁর কথা-বার্তা শুনতে পারেন।

আইনের অধ্যাপক আনন্দের সঙ্গেই চলে যেতে চাইতেন, কিন্তু দুয়ের পক্ষ হয়ে লেখকই জবাব দিলেন। বললেন, গবর্নর যদি কিছু মনে না করেন তবে তাঁরা উপস্থিত থাকবেন।

গবর্নর স্বচ্ছন্দভাবেই বললেন, তিনি কিছু মনে করবেন না। দেয়ালের পাশে সারিবদ্ধ চেয়ারগুলো দেখিয়ে তিনি ওঁদের বসতে বললেন, তাতে একটু আরাম পাবেন ওঁরা। গবর্নর বললেন, আজকের মতো গরম এবং অস্বস্তিকর দিনে নিজেকে যতটা আরামে রাখা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। অতিথিদের আদর আপ্যায়নে তিনি যেন বিগলিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আইনের অধ্যাপক বুঝতে পারলেন, তাঁর এই আদর আপ্যায়ন তাঁর সিদ্ধান্ত আবৃত্তি করার মতোই মুখস্থ করা, অভ্যাস করা একটা ব্যাপার, এ এমন একটি অনুষ্ঠান যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। তাঁরা বসলেন। একটু পরেই সেক্রেটারী দুজন স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। পুরুষটি নিঃসন্দেহে মহিলা দুটির বন্ধু এবং মিস ভাঞ্জেত্তির দোভাষী। মিস ভাঞ্জেত্তি ইংরেজী বোঝে না। মহিলা ক্ষুদ্রকায়, অবিশ্বাস্য রকমে ক্ষীণাঙ্গী। অধ্যাপক এবং লেখক দুজনেই গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে ওর দিকে তাকালেন। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সাকো আর ভাঞ্জেত্তি ছিলো যেন শুধু দুটো নাম। এই মহিলা দুটির আকস্মিক আবির্ভাবে ওরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। লেখক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি শুনে-

ছিলেন মিসেস সাক্কো সুন্দরী। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক সৌন্দর্যের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ সৌন্দর্য ওর নিজের কাছেই স্বীকৃতি পায়নি। যাকে তা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছে ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার কামনার লেশমাত্র নেই এ মহিলার মধ্যে। তবু তার এই আত্মপরশূন্যতার জন্যই তাকে দেখাচ্ছিলো রেনেসাঁর যুগে র‍্যাফায়েল বা লিওনার্দোর আঁকা নারীত্বের এক বিশেষ মুহূর্তের অভিব্যক্তির কোন ম্যাডোনার মতো। তার সৌন্দর্য যেন এক তীব্র প্রতিবাদ এই দেশের সস্তা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যে সংস্কৃতি নারীত্বের মর্যাদা না বাড়িয়ে তাকে খর্ব করে। তার দিকে তাকিয়ে লেখক ভাবতে লাগলেন, জীবনে তিনি অন্য কোন মেয়েকে সুন্দরী মনে করেছিলেন কি না। এই চিন্তা পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেললেন তিনি, কারণ তাঁর মনে হলো এতে গবর্নরের সম্মুখের ভীতা শোকাহতা ওই মহিলার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। ওর শোক একান্ত ব্যক্তিগত এবং ভাঞ্জেত্তির বোনের অদ্ভুত নীরব দোষারোপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কোন ভূমিকা না করেই নিকোলা সাক্কোর স্ত্রী বলতে আরম্ভ করলো। পাহাড়ী ঝরনার মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে তার কথাগুলো বেরিয়ে আসতে লাগলো। সে মৃদুস্বরে বলতে লাগলো, 'আপনাকে আমি চিনি, গবর্নর। আমি জানি আপনি সন্তানের পিতা। জানি, আপনার স্ত্রী বর্তমান। আপনার সন্তানদের দিকে, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কী মনে হয় আপনার? কোনদিন কি আপনি ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন, বিদায়, চির-দিনের জন্য বিদায়? তোমরা আর দেখবে না আমাকে, আমিও দেখবো না তোমাদের? এমন কথা কি কোনদিন ভাবেন আপনি? আমার স্বামী নিজের চেয়ে বেশি ভালবাসেন আমাকে। কী করে আপনাকে বোঝাই তিনি কেমন মানুষ? নিকোলা সাক্কো অত্যন্ত ভদ্র। কী বলবো আপনাকে, গবর্নর? ঘরের মধ্যে একটা পিঁপড়ে এলে আপনারা পায়ে মাড়িয়ে সেটাকে মেরে ফেলেন। পিঁপড়ে একটা পোকা, তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু নিকোলা সাক্কো পিঁপড়েটাকে তুলে বাইরে মাটিতে রেখে আসতেন। যদি আমি হাসতাম, আমাকে কী বলতেন জানেন? বলতেন,

ওরও প্রাণ আছে, প্রাণকে আমার সম্মান দিতেই হবে। জীবন অমূল্য। কথাগুলো ভেবে দেখুন, গবর্নর। আমি চাই, আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, কেমন করে তিনি চলতেন তাঁর সন্তানদের সঙ্গে,—কোনদিন একটি কটু কথা বলেননি, রাগ করেননি, ধৈর্য হারাননি, ব্যস্ততা দেখাননি। তাঁর দুখানা হাতের দশটি আঙুল ওদের সেবায় নিযুক্ত ছিলো। সন্তানরা কী চায়? তারা কি চায় নিকোলা গাধা হয়ে তাদের পিঠে চড়াবেন? তাহলে তিনি তাই করতেন। চারণ হয়ে ওদের গান শোনাতে হবে? তাও করতেন তিনি। ওদের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে হবে? তাও দিতেন। আর ওরা যদি অসুস্থ হতো, তখন শুশ্রূষাকারী হতেন তিনি, মুহূর্তের জন্যও ওদের বিছানা ছেড়ে যেতেন না। আমি "ওদের" বলছিলাম, না? দেখুন, কেমন ভুলো মন হয়েছে আমার। বলা উচিত ছিলো "ওর", আমাদের ছেলে দান্তের, কারণ ছোট মেয়েটিকে তো তিনি দেখেনইনি। ও যখন একটু একটু করে বড় হয়ে উঠেছে তখন তো তিনি বন্দীশালায়।

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, গবর্নর। আমি কি তেমন মেয়ে, খুনীর সঙ্গে যার বিয়ে হতে পারে? যাঁর কথা বললাম তিনি কি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারেন? তবে কেন তাঁর জীবন গ্রহণ করবেন? এই আহুতিতে কোন শয়তান পরিতুষ্ট হবে? আর আপনাকে কি বলতে পারি? আপনার কাছে যা বলবো, তা ভেবে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন শুধু একটি মানুষের কথাই আমার মনে পড়ছে। তাঁর অন্তর ভালবাসা, দাক্ষিণ্য আর সুমিষ্টতায় পরিপূর্ণ। তাঁর নিজের বাগানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন সেন্ট-ফ্রান্সিসের মতো। তিনি কি চাইতেন, জানেন? তাঁর যেটুকু ছিলো, পৃথিবীর সবার যেন অন্তত সেটুকু থাকে। সহানুভূতিশীলা স্ত্রী, সন্তান আর সাধারণ কাজ, যেখানে দিনভোর খেটে তিনি তাঁর খোরাক যোগাড় করতে পারেন। এই তিনি চাইতেন। এই জন্যই তিনি প্রগতিবাদী হয়েছিলেন। তিনি চাইতেন, সারা পৃথিবীর লোক তাঁর মতো সুখশান্তি লাভ করুক। কিন্তু খুনের কথা বলছেন? কোনদিন কোন জীবহত্যা করেননি তিনি। কোন মানুষের গায়ে হাত তোলেননি কোনদিন, কোনদিন না। আপনারা দয়া করে মুক্তি দিন ওঁকে, দয়া করুন। আমি আপনার পায়ে পড়ছি, ভিক্ষা চাইছি, আমার

দিকে চেয়ে, ওঁর সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে ওঁকে বাঁচতে দিন।'

নির্বিকারভাবে গভর্নর সব কথা শুনলেন। তাঁর নিখুঁতভাবে কামানো মুখের আত্মসন্তুটির অভিব্যক্তিতে আবেগের এতটুকু ছায়া পড়লো না। শান্ত হয়ে তিনি সব শুনলেন। ভান্‌জেত্তির বোন যখন ইতালীয় ভাষায় কথার বন্যায় ফেটে পড়লো, তখনো প্রতিবাদ করলেন না তিনি। ওদের সঙ্গের মানুষটি ওর কথাগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করে বললো। তার কথায় ওর কণ্ঠের আবেগ ছিলো না। কিন্তু কথাগুলোরই যেন অদ্ভুত এক অনিবার্য শক্তি রয়েছে। মেয়েটি বললো, কেমন করে সে ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কেমন করে সেখানকার শ্রমিকরা তাকে বাধ্য করেছে প্যারীর পথে হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করতে।

'ওরা আমায় বলেছিলো, মন খারাপ কোরো না। ও দেশের গবর্নরের কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে বার্তোলোমিউ ভান্‌জেত্তির সব কথা বলবে। তিনি সৎ মানুষ, তাঁর বিচারবুদ্ধি আছে, আছে স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং মহান আত্ম-মর্যাদা। এই কথা বলার জন্য আমি কি একা এসেছি? আমার বাবা আমায় পাঠিয়েছেন। তিনি বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ। বাইবেলের বৃদ্ধদের মতোই বৃদ্ধ তিনি। তিনি আমায় বললেন, "মিশরে চলে যাও তুমি। সেখানে বন্দী হয়ে আছে আমার ছেলে। সে দেশের ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তার জীবনরক্ষার চেষ্টা করো।" '

লেখক কেঁদে ফেললেন। তাই দেখে আইনের অধ্যাপক মনে তীব্র আঘাত পেলেন। নিউ ইয়র্কের লেখক লজ্জিত না হয়ে সরলভাবে কাঁদছিলেন। খানিক বাদে অনেক কষ্টে চোখ মুছে তিনি গবর্নরের দিকে তাকালেন। গভর্নরও তাঁর চোখে চোখ রাখলেন, এতটুকু বিচলিত হলেন না কমনওয়েলথের এই নেতা। অধ্যাপকের বক্তব্য বলার সময় যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি এই দুই মহিলার সব কথা তিনি শুনলেন। তারপর তেমনিভাবেই ওদের বক্তব্য শেষ হয়েছে কি না দেখবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শেষে আবেগহীন স্বচ্ছন্দভাবে তিনি বললেন, 'আপনাদের মনোকষ্ট দূর করার জন্য কিছুই করতে পারছি না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের দুঃখের উৎস আমি বুঝতে পারি, কিন্তু এ

অবস্থায় আইনের বিধানকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। অন্যের চোখ নিয়ে ছ বছর পিছনে ফিরে তাকানো অত্যন্ত কঠিন। সাক্ষীদের অনেকেই এমনভাবে তাদের কাহিনী বলেছে যে আমার মনে হয়েছে, ওরা স্মৃতি থেকে বলছে না; বলছে আবৃত্তি করার মতো—'

আইনের অধ্যাপক আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি লেখককে বললেন, 'আর থাকতে পারছি না আমি, বুঝলেন? আমাকে যেতেই হবে।'

লেখক মাথা দোলালেন। দুজনে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বাইরের বারান্দায় রিপোর্টাররা অপেক্ষা করছিলো।

'দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত মঞ্জুর হলো?' একজন চিৎকার করে প্রশ্ন করলো।

আইনের অধ্যাপক মাথা নাড়লেন। তিনি এবং লেখক বাইরে রোদে বেরিয়ে এলেন। সেখানে পিকেট লাইন তখনো নড়ছে। লেখক তাঁর সঙ্গীর করমর্দন করে বললেন, 'এই আমাদের দুনিয়া। আর পরলোকেও বিশ্বাস নেই আমার।...আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দ পেলাম। এ কথা আমার মনে থাকবে, আপনার সাহসের কথাও মনে থাকবে আমার।'

'আমার সাহস নেই।' অধ্যাপক দুঃখের সঙ্গে বললেন।

তারপর লেখক আবার পিকেট লাইনে ফিরে গেলেন। এ ছাড়া আর কীই বা করবার আছে তাঁর? অধ্যাপক ভারী পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে চললেন প্রতিরক্ষা কমিটির আপিসের দিকে।

এগারো

বাইশে আগস্ট বিকেল চারটের আগেই শত শত মানুষ জমায়েত হতে লাগলো নিউ ইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়ারে। কেউ বা ছোট ছোট দলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ বা ধীর পদক্ষেপে হেঁটে বেড়াতে লাগলো, আর অন্য সবাই খুঁজে বেড়াতে লাগলো এমন কিছু, যা সহজে দেখা যায় না। পুলিসও এসে গিয়েছিলো সেখানে। স্কোয়ারের চারপাশের বাড়ির ছাদে মেশিন-গান নিয়ে বসেছিলো পুলিসের একেকটি ছোট দল। স্কোয়ারের মানুষগুলো ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের গায়ে ওদের কালো মূর্তিগুলো দেখতে

পাচ্ছিলো, দেখতে পাচ্ছিলো বন্দুকের নলগুলো তাদের দিকেই ঘোরানো। ওপরের দিকে তাকিয়ে এরা অবাক হয়ে ভাবছিলো, "কি আশঙ্কা করছে ওরা?" সমস্ত জায়গাটা জুড়ে এর মধ্যেই রূপকথার নৈরাজ্য বিরাজ করছিলো। ওরা কি আশঙ্কা করছে, নিউ ইউর্কের এই ইউনিয়ন স্কোয়ার থেকে সাকো আর ভাঞ্জেত্তিকে মুক্ত করবার জন্য এক সেনাবাহিনী বোস্টনের দিকে মার্চ করে যাবে?

পুলিস যদি এরকম অসম্ভব কথা কল্পনাও করে থাকে, তবুও ওদের বোঝা উচিত ছিলো, তার সময় আর নেই। এখন তো সোমবারের বিকেল। মধ্যরাত্রির আগে বোস্টনে পৌঁছতে হলে মানুষের মনকেও দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে হবে।

চারটের একটু পরেই স্কোয়ার মানুষে ভরে উঠলো। আশ্চর্য, মেয়েরা এলো সবার আগে। কেন, কেউ বুঝলো না। ওরা মাতা, ওরা গৃহিণী। অধিকাংশই সাধারণ শ্রমিক মেয়ে, ওদের পরনে জীর্ণ পোশাক, হাত ছুটো কাজ করে করে শক্ত হয়ে গেছে। অনেকের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। দু-তিনটির হাত ধরে এসেছে কেউ। আরো ছোট যারা, তাদের এনেছে কোলে করে। আর শিশুরা বুঝতে পেরেছিলো, এই বিশেষ তীর্থযাত্রার কোন আনন্দ নেই। মেয়েরা এলে পরে ছুটো ছোটখাটো সভা শুরু হলো; বক্তারা বাক্সের ওপরে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু পুলিস তাড়াতাড়ি এসে পড়ে সভা দুটি ভেঙে দিলো।

চারটের আর খানিক পরে বিরাট বিরাট দলে শ্রমিকরা এসে স্কোয়ারে পৌঁছতে লাগলো। টুপি আর পশুলোমের পোশাকের কারখানার শ্রমিকরা আজ সহানুভূতিতে এবং প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিলো। তারা আগেই স্কোয়ারে এসে পৌঁছেছে। এবারে ইতালীয় শ্রমিকরা এসে তাদের সঙ্গে মিশে গেলো। ওরা ভোর সাতটায় কাজে গিয়েছিলো আর চারটেয় কাজ ছেড়ে সোজা ইউনিয়ন স্কোয়ারে চলে এসেছে। ওদের হাতে খাবার নেওয়ার কাঠের পাত্র। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, মলিন ওদের চেহারা। পাঁচ সাত-দশজনের একেকটি দলে ওরা আসতে লাগলো। সাড়ে চারটেয় আবার একটা সভা আরম্ভ হলো। পুলিস এগিয়ে এলো সেদিকে, কিন্তু অন্যান্য

শ্রমিকরাও এগিয়ে এলো। হঠাৎ যেন বিরাট আকার ধারণ করলো সভাটি। তখন পুলিস চলে গেলো।

বাণিজ্য-জাহাজের একদল নাবিক স্কোয়ারে এলো,—ওদের মধ্যে ছিলো আইরিশ, পোল, ইতালীয়, জনকয়েক নিগ্রো আর দুজন চীনা। ওরা ঘন-সংঘবদ্ধ হয়ে জনস্রোত ঠেলে এগোতে লাগলো। এক জায়গায় এসে দুজন স্ত্রীলোককে কাঁদতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে এক অকারণ শ্রদ্ধায় ওরা থমকে দাঁড়ালো। একটু দূরে এক পাদ্রী হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললেন, 'ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! আসুন আমরা প্রার্থনা করি।' অল্প কজন লোক তার চারপাশে ভিড় করে এলো। তখন সেন্টার স্ট্রীট স্টেশন থেকে গীর্জার বিরাট পিত্তল-নির্মিত স্মৃতিফলকখানি বহন করে ব্রডওয়ে ধরে ফোরটিন্থ্ স্ট্রীট দিয়ে তিনখানা খোলা পুলিসগাড়ির এক মিছিল এসে দাঁড়ালো স্কোয়ারের কাছে। সেখানে সবাই একসঙ্গে হয়ে কি সব পরামর্শ করলো ওরা। তারপর ওয়েস্ট সেভেনটিন্থ স্ট্রীটের দিকে গাড়ি চালালো। সেখানে দূরপাল্লার পরিচালনা ঘাঁটি বসালো ওরা। কয়েকজন পুলিস বন্দুক আর কাঁদুনে বোমা বোঝাই গাড়িগুলোর পাহারায় বসলো।

ছাদের ওপরের পুলিসরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো, একটু একটু করে স্কোয়ার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে নিচের দিকে তাকিয়ে তারা দেখেছিলো, বিচ্ছিন্ন মেয়ে-পুরুষরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরের পরিবর্তনগুলো ওপর থেকে ওদের মনে হলো যেন যান্ত্রিক, যেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মতোই অবশ্যম্ভাবী। অকস্মাৎ যেন বিচ্ছিন্ন মানুষ-গুলো একত্রিত হয়ে গেলো। কোন ইঙ্গিত করা হয়নি, কেউ নড়লো না, অথচ নিঃশব্দে পরিবর্তনটা ঘটে গেলো। তেমনি নিঃশব্দেই এই মেয়ে-পুরুষের দল তিন-চারটি সুসংবদ্ধ জনতায় ভাগ হয়ে গেলো। স্কোয়ারের চারপাশে ছিলো পোশাকের কারখানা; পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সেখান থেকে বন্যার মতো বেরিয়ে এলো শ্রমিকরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইউনিয়ন স্কোয়ার জনসমুদ্রে পরিণত হলো। কিন্তু তবু এই কেবল শুরু। নগরীর এক-দিক থেকে এলো মেয়েদের পোশাকের কারিগরেরা, অন্যদিক থেকে ফোরটিন্থ্ স্ট্রীট ধরে এলো আসবাব আর কাগজকলের শ্রমিকরা, আর ফোর্থ

এভিন্যুর ওপরে বইয়ের দোকান আর ছাপাখানা থেকে আরো জনস্রোত আসতে লাগলো স্কোয়ারের দিকে। শত শত সহস্রে সহস্রে পরিণত হলো। জনস্রোতের বিক্ষুব্ধ গতি স্তব্ধ হলো। আর তারপর এই জনসমুদ্র থেকে উত্থিত হলো এক মৃদু কোলাহল,—মূক, বাক্যহীন, প্রারম্ভিক কোলাহল,—যেন এক ক্রোধময় প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জনের শুরু।

ছাদের ওপরের পুলিসদের কেউ যদি হাজার হাজার মানুষদের এই একত্রিত হওয়ার কায়দা দেখে খানিক শঙ্কা অনুভব না করতো, ওই দুটি হতভাগ্য ফাঁসির আসামীর প্রতি এত মানুষের ভালবাসা, এত উদ্বেগ দেখে অবাক না হতো, তবে নিশ্চয়ই তাকে অনুভূতিহীন বলতে হবে। কিন্তু নিচের ওই মানুষগুলো আর তাদের মধ্যে এখন বিরাট এক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেছে। দুয়ের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র ওদের পাশে স্তূপ করে রাখা মেশিনগানের বুলেটগুলো। পুলিসদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহান্তে গীর্জায় যেতো, উপাসনা করতো। কিন্তু নিচে ওই জনসমুদ্রের মধ্যে একজন পাদ্রীর মতো ওদের কারোরই মনে পড়েনি, যখন পাইলটের সৈনিকরা যীশু খৃষ্টকে ধরে নিয়ে গেলো, তখন জেরুসালেমের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরাও এমনি করেই জমায়েত হয়েছিলো, শুধু এই আশা এবং এই প্রার্থনা করতে যে তাদের একতার শক্তি থেকে অন্তত কিছু ফল হোক।

পাদ্রী তাঁর জীবনে কোনদিন শ্রমিকদের এই ধরনের কোন শোভাযাত্রায় কিংবা প্রতিবাদ সভায় যাননি। তিনি কোনদিন পিকেট লাইনে যোগ দেননি, অশ্বারোহী পুলিসের লাঠিচালনার মুখোমুখি পড়েননি, মানুষের প্রাণ নেওয়ার জন্য মেশিনগানের আর্তনাদ শোনেননি, চোখে কাঁদুনে গ্যাসের কামড় অনুভব করেননি কিংবা ঘৃণায় উন্মত্ত পুলিসের লাঠির হাত থেকে তাঁকে মাথা বাঁচানোর চেষ্টাও করতে হয়নি। তাঁর জীবনযাত্রা ছিলো অত্যন্ত নিরাপদ, অন্যান্য সাধারণ মধ্যবিত্ত আমেরিকানের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিলো না সেদিক থেকে। কিন্তু তবু আমেরিকার অন্যান্য অনেক লোকের মতোই তিনিও ম্যাসাচুসেট্‌সের এই দুটি হতভাগ্য মানুষের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে লক্ষ লোকের নির্যাতনে অংশ গ্রহণ করেছেন, আর দিনের পর দিন ম্যাসাচুসেট্‌সের সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বোধ গভীরতর

হয়েছে। আজ আর একা থাকতে না পেরে, এত প্রতীক্ষা সহ্য করতে না পেরে তিনি চলে এসেছেন ইউনিয়ন স্কোয়ারে। এখানে এসে তিনি অনেক সঙ্গী পেলেন, যারা তাঁর সঙ্গে যাবে ক্যাল্‌ভারি পাহাড়ের তীর্থযাত্রায়।

তখনো দুঃখ তাঁর কমলো না, কিন্তু তিনি শান্তি পেলেন। তিনি জনস্রোত ঠেলে এগিয়ে চললেন; তাঁর পাদ্রীর পোশাক, তাঁর পাণ্ডুর শীর্ণদেহ, তাঁর ধূসর কেশ আর তাঁর অতি সন্তর্পণ গতি,—সব মিলিয়ে তিনি অন্য সবার থেকে এত আলাদা যে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগলো তাঁকে। কিন্তু তিনি কিছু মনে করলেন না এতে। ওদের দৃষ্টির সামনে বিচলিতও হলেন না। এই মানুষগুলোর মধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তিনি আশ্চর্য হলেন, আবার একটু ভয়ও পেলেন এই ভেবে যে ভগবানের দূত হলেও প্রায় ষাট বছর কাল এমন জায়গায় কাটিয়েছেন তিনি যেখানে এই মানুষগুলো যায়নি কোনদিন। কি করে যে এমন হলো, তিনি সত্যিই বুঝতে পারলেন না। হয়তো কালে কালে বুঝবেন।

চারিদিকের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি আন্দাজ করে নিলেন ওরা কি করে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তখন হাতকাটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে এক নিগ্রো তাঁকে তুলে দিলো। ওর শরীর থেকে রঙ আর বার্নিশের গন্ধ আসছিলো। তিনি দেখলেন, এক ছুতোর তার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। একটি মেয়ে এসেছে, তার গলায় ক্রুশচিহ্ন। তিনি যখন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর হাত স্পর্শ করলো। কজন মহিলা শান্তভাবে কাঁদছিলো এক জায়গায় বসে। যে ভাষায় ওরা কথা বলছিলো তা তিনি জানেন না। এখানে অনেক ভাষার কথা শুনলেন তিনি এবং এই জনসমুদ্রের অদ্ভুত বিস্ময়কর বিচিত্র ধরনের মানুষগুলোর কথা ভেবে অবাক হলেন। এদের সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না।

একজন এসে তাঁকে অনুরোধ করলো এক প্রার্থনা পরিচালনা করতে। ইউনিয়ন স্কোয়ারের দিকে আসার সময় প্রার্থনা পরিচালনার কথা তিনি ভাবেনইনি। কিন্তু কি করে প্রত্যাখ্যান করবেন ওকে? তিনি ভয় পেলেন মনে মনে, তবু রাজি হলেন। বললেন, তিনি এপিস্কোপালিয়ান্‌ এবং

এখানকার খুব কম লোকই তাঁর মতে বিশ্বাসী। কিন্তু তবু সবাই যদি চায়, তিনি প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারেন।

ওরা বললো, 'তাতে কিছু এসে যায় না, প্রার্থনা প্রার্থনাই।'

তাঁর হাত ধরে তাঁকে জনতার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে এক মঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে অবলোকন করলেন এক সীমাহীন জনসমুদ্রকে।

তিনি মনে মনে বললেন, 'ভগবান আমায় সাহায্য করুন এখন। এমন ঘটনার জন্য কোন প্রার্থনার সৃষ্টি হয়নি। এমন গীর্জায় কোনদিন আসিনি আমি, এমন মানুষ দেখিনি এর আগে। এদের কাছে কী বলবো আমি?'

বলতে আরম্ভ করার আগে তিনি সত্যিই জানতেন না, কী বলবেন। শেষে এক সময় তিনি বলতে লাগলেন, '...যাই শক্তি থাক না কেন আমাদের, তার খানিক অংশ নিয়ে তুমি চার্লসটাউন বন্দীশালার সৎ এবং বিনয়ী মানুষ দুটিকে দাও, যাতে তারা বাঁচতে পারে, আর যাতে মানবজাতি মুক্তিলাভ করে।...'

কিন্তু যখন তাঁর বলা শেষ হলো, তিনি বুঝলেন অন্যায় করেছেন। তিনি বিশ্বাস নিয়ে ছিলেন, এখন ভয় আর প্রশ্ন জেগেছে তাঁর মনে। যেমনটি ছিলেন তিনি, তেমনটি আর হতে পারবেন না কোনদিন।...

তখনো লোক আসছিলো স্কোয়ারে। কেরানী, গাড়ির কণ্ডাক্টর, শ্রান্ত-চোখ দরজি, রুটির কারিগর, অপারেটর, মেকানিক—এরা সবাই এক নীরব শোভাযাত্রায় আসতে লাগলো ইউনিয়ন স্কোয়ারে, যেন শেষ নেই এর। অনেকে চলে গেলো, তার চেয়ে আরো বেশি লোক এসে ওদের স্থান গ্রহণ করলো। আর মানুষের এই মহাসমুদ্র রইলো গতিহীন, অপরিবর্তিত।

এ খবর বোস্টনে পৌঁছে গেলো। নিউ ইয়র্কে সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি প্রতিরক্ষা কমিটির আপিস ছিলো ইউনিয়ন স্কোয়ারের কয়েকখানা বাড়ির পরেই। বিনিদ্র বিরামহীন এখানকার লোকেরা দিনরাত কাজ করে গেছে, আর এখন তাদের এই যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রান্তি নিয়েও তারা এই জনসমুদ্র দেখে উৎসাহিত এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলো। এ খবর তারা বোস্টনে পাঠিয়ে দিলো। টেলিফোনে তারা বললো, 'হাজার হাজার মানুষ বন্যার মতো

আসছে ইউনিয়ন স্কোয়ারে। এমন প্রতিবাদ আর কোনদিন হয়নি। নিশ্চয়ই এ কথা ওখানে সবাই উপলব্ধি করবে।'

ওরা একাই শুধু এ কথা ভাবছে না যে আর কোনদিন এমন প্রতিবাদ হয়নি। ইউনিয়ন স্কোয়ারের কাছে একটা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে একটি লোক ওই মানুষগুলোকে আসতে দেখছিলেন এবং তিনিও অবাক হয়ে ভাবছিলেন, এমন নতুন ভয়ানক এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর দেখেননি তিনি, আমেরিকান শ্রমিকদের কোন বিরাট শোভাযাত্রাও এর সমকক্ষ হতে পারেনি কোনদিন। এই লোকটি তাঁর আপিস থেকে গোটা ইউনিয়ন স্কোয়ারটাকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। আজ সারাটা বিকেল আর কয়েকজন লোকের অপেক্ষায় তিনিই আপিসে বসেছিলেন। তারাও তাঁরই মতো শ্রমিক নেতা। প্রথম তিনি জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন সাড়ে তিনটেয়। তখনই যাদের আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা, তাদের মধ্যে একজন সূচি-শ্রমিকনেতা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

জানলার লোকটি (ওঁকে আমরা চেয়ারম্যান বলবো) ঘুরে দাঁড়িয়ে খুশিতে হেসে ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওঁরা দুজনে অনেক দিনের বন্ধু। শিশুকাল থেকে চেয়ারম্যান তাঁর নিজের শিল্পেই কাজ করেছেন, প্রথমেই অতি তুচ্ছ কাজ করতেন তিনি, তারপর কাজ শিখতে শিখতে ওপরে উঠেছেন। এখন তিনি তাঁর ইউনিয়নের নেতা এবং নিউ ইয়র্কের শ্রমিক সংগঠনগুলোর ওপরে তাঁর এখন অসামান্য প্রভাব। এখন তাঁর সুন্দর একটি আপিস আছে এবং ব্যবসায়ও ভালোই চলছিলো। কিন্তু ইদানীং এইসব সৌভাগ্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আগের মতোই সরল, সহজ এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ। দীর্ঘাঙ্গ নন তিনি, কিন্তু তাঁকে দেখে দীর্ঘকায় মনে হয়। তাঁর দেহ সুগঠিত, মুখ চৌকস, মনোরম। তাঁর চাল-চলনে একটা সপ্রতিভ-তার ছাপ। চেয়ারম্যান সূচিশ্রমিক নেতার কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে জানলার কাছে নিয়ে এসে স্কোয়ারের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

'ওই দেখুন! একটা দেখার মতো জিনিস। তাই না?' তিনি চিৎকার করে বললেন।

'হ্যাঁ, তা বটে,' সূচিশ্রমিক নেতা বললেন, 'আজ আবার বাইশে আগস্টও।'

'তার মানে এই নয় যে সংগ্রাম শেষ হয়ে গেলো।'

'নয় কি? এই ক ঘণ্টায় কী করতে পারবো আমরা?'

'যেমন করে হোক দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করাতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেলেও যথেষ্ট। এই সময় হাতে পেলে আবার আমরা ফেডারেশনের নেতাদের কাছে আবেদন করবো। মাত্র একটি জিনিস সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে বাঁচাতে পারে, বাঁচাতে পারে আমাদেব, আর আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনকেও।'

'কী সে জিনিস?'

'সাধারণ ধর্মঘট।'

'আপনি স্বপ্ন দেখছেন।' সূচিশ্রমিক নেতা প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

'যদি তাই হয়, তবে এ স্বপ্ন সত্য হবে।'

'আর যদি দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত না রাখা হয়?'

'রাখতেই হবে।' চেয়ারম্যান জোর দিয়ে বললেন।

'আমি কাউকে সাধারণ ধর্মঘটের কথা বলতে পারবো না, তা স্বপ্নের সামিল। সাধারণ ধর্মঘট করানো সম্ভব হবে না। যদি তার আহ্বান জানাই, তবে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো।'

'তা হলে আপনি ওদের মরতে দিতে চান?'

'আমি ওদের মরতে দিতে চাইনি। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ওদের বাঁচাতে পারবে না।' তিনি ইউনিয়ন স্কোয়ারের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয় তা আমরা করেছি। এখন ফোন তুলে নিয়ে ম্যাসাচুসেট্সের গবর্নরের কাছে আবেদন জানান, কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের স্বপ্ন দেখবেন না। যারা সাধারণ ধর্মঘট করাতে পারতো, তারা আত্মবিক্রয় করেছে, নিজেদের এবং শ্রমিকদেরও বিক্রি করে দিয়েছে। যে ইউনিয়নগুলো সাধারণ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে পারতো, তাদের রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। আর স্বপ্ন দেখবেন না।'

'তবু আমার স্বপ্নের শেষ হবে না।' চেয়ারম্যান বললেন। তারপর নীরব হয়ে গেলেন তিনি, যেন নিজের চিন্তাধারার মধ্যে ডুবে গেলেন।

খানিক সময় দুজনে নিঃশব্দ মনোযোগের সঙ্গে নিচের গণবিক্ষোভ লক্ষ্য

করতে লাগলেন। এই সময়ে শহরের ইমারত শিল্পের একজন সাধারণ কর্মী এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলো। তারপর এলো একজন ইস্পাত শ্রমিক। দশ বছর ধরে ইণ্ডিয়ানার গ্যারীতে ইউনিয়ন সংগঠনের জন্য সে সংগ্রাম করে আসছে। আজ সকালেই সে শহরে এসেছে। মণ্টানার দুজন তাম্রখনির শ্রমিকও এলো। মাত্র দু ঘণ্টা আগে ওরা নিউ ইয়র্কে এসেছে। ওদের দুজনেরই অল্প বয়স। ওদের গায়ের চামড়া শুকনো, লম্বাটে কঠিন মুখে পোড়া কয়লার দাগ। বিউট্‌ থেকে সারাটা পথ ওরা রেলে চড়ে এসেছে, কখনো বক্স গাড়িতে, কখনো গোণ্ডোলা গাড়িতে বা গাড়ির নিচের রড ধরে। এমনি করে ওরা এসে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে। চেয়ারম্যানকে ওরা জানিয়েছিলো, ওরা আসবে। হয়তো সময়মতো আসতে পারেনি, কিন্তু বেশি দেরিও হয়নি। ওরা হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করলো, সরল ঔৎসুক্য নিয়ে ওঁকে দেখতে লাগলো। ওঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে ওরা, কিন্তু ওঁকে দেখেনি কোনদিন। চেয়ারম্যান অবিশ্যি ওদের খ্যাতির কথা শুনে ওদের চিনতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, পাঁচ বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলের তাম্র এবং রৌপ্যখনির শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে ওরা। কঠিন অবস্থার মধ্যে ওদের দীক্ষা হয়েছে, ফলে কঠিন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

এক এক করে অন্যান্য শ্রমিক নেতারাও ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। চেয়ারম্যানের আপিসে ওরা এখন মোট বারোজন এসেছেন। একজন জুতোর কারখানার শ্রমিক, রেলরোড ভ্রাদারহুডের একজন নিগ্রো এবং লণ্ড্রী-শ্রমিকদের ইউনিয়নের আরেকজন নিগ্রোও এসেছে। অলঙ্কারশিল্প, টুপি-শ্রমিক এবং রুটির কারিগরদের লোকও এসেছে। চেয়ারম্যান ভাবলেন, আজ উনিশশো সাতাশের বাইশে আগস্ট এত অল্প সময়ের মধ্যে সব শ্রমিকদের এমন প্রতিনিধিত্বমূলক একটি দলকে একত্রিত করতে পারবেন বলে আশাও করেননি তিনি।

চেয়ারম্যান বৈঠকে শৃঙ্খলা আনলেন। কিন্তু তিনি নিজেই কথা বলতে বলতে জানলার দিকে না তাকিয়ে পারছিলেন না। তাঁর ভাষা যেমন বিক্ষুব্ধ, তিনি নিজেও তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অস্বস্তিতে তিনি

এগোচ্ছেন আর পেছোচ্ছেন, আর বার বার বলছেন সময়ের স্বল্পতার কথা।

তিনি বললেন, 'হয়তো মনে হবে, আমাদের এক সপ্তাহ কিংবা এক মাস আগেই এই বৈঠক করা উচিত ছিলো। আমরা কয়েকজন তা করেও ছিলাম। আমাদের সাধ্যমতো সবই করেছি আমরা।' ভাষা নিয়ে অসুবিধায় পড়লেন তিনি, কারণ তাঁর উচ্চারণভঙ্গী অন্য দেশের, অন্য কালের। কিন্তু কক্ষের অন্য সবারও উচ্চারণভঙ্গীতে একই রকমের বিদেশীয়তার প্রভাব রয়েছে।

চেয়ারম্যান বলতে লাগলেন, 'যাই হোক, আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আমার মনে হয়, আজই শেষ দিন। অবস্থা এখন এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে, এর কোন পরিণতি সম্ভব নয়, কিন্তু সে পরিণতি এসেছে। আজ সারাটা সকাল আমি ভেবেছি, কী করতে পারি আমরা। তবু এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। আমাদের লোকেরা সবাই বেরিয়ে গেছে। তাদের অনেকেই আছে ইউনিয়ন স্কোয়ারে। ঠিক তেমনি করেই পোশাকের কারখানার শ্রমিকরাও বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এ-ই যথেষ্ট নয়, এতে কিছু পরিবর্তন আসবে না। তাই কাল সারারাত জেগে বসে আমি ভেবেছি, আমরা কী করতে পারি।'

'কী করতে পারি আমরা?' ইস্পাত শ্রমিক প্রশ্ন করলো, 'এখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। এই ক ঘণ্টায় তো আর দুনিয়াটা উলটে দেওয়া যায় না। ইউরোপের অনেক জায়গায় আন্দোলন যেমন জোরদার, আমাদের আন্দোলন তত শক্তিশালী নয়। ইস্পাতশিল্পে আমাদের মেরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন আর জোরে কথা বলার উপায় নেই। কী করতে পারি আমরা?'

রুটির কারিগরদের ইউনিয়নের লোকটি বললো, 'হতে পারে, অনেক-দিন ধরে প্রায় নীরব থাকতে হচ্ছে আপনাদের। কিন্তু হায় ভগবান! আমরা যে মাথাই তুলতে পারছি না, তার শেষ হবে কবে?'

চেয়ারম্যান বললেন, 'এক দিক থেকে দেখলে অবিশ্যি অবস্থাটা তাই দাঁড়িয়েছে। নিজেকে আমি বার বার প্রশ্ন করেছি, ওদের দুজনকে কেন মরতে হবে আজ? একটিমাত্র উত্তর আছে এর। ওরা মরবে আমাদের

জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য, পশুলোমের পোশাকের কারিগর, সূচি-শ্রমিক আর ইস্পাত শ্রমিকের জন্য। আমি সোজাসুজি সরলভাবে বললাম কথাটা। মালিকের দল ভীত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনার আমার ভয়ে নয়। ওরা যদি আমাদেরই ভয় করতো! না, তা নয়। সমস্ত পৃথিবীতে যে আন্দোলন, যে যুগান্তকারী আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, রাশিয়ার জনসাধারণ যা করেছে, তাকে ভয় করে ওরা। রাশিয়ার কোন কিছুকেই ওরা দেখতে পারে না। এবারে-ওরা ওদের শক্তির প্রদর্শনী দিচ্ছে আমাদের কাছে। ওরা আমাদের বলছে, "এবারে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে পেয়েছি আমরা। শ্রমিক সংগঠনের কথা, শ্রমিক সংগঠনের শক্তির কথা যতই বলো না কেন, যতই চিৎকার করো, প্রতিবাদ, তর্জন-গর্জন করো না কেন তোমরা, ওতে এতটুকুও লাভ হবে না। যত খুশি চিৎকার করো তোমরা। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে আজ মরতে হবে। মনে রাখবার মতো একটা শিক্ষা তোমাদের দেবো।" আমি ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিতে দেখছি।'

তাম্রখনির শ্রমিকদের একজন বললো, 'ব্যাপারটা ঠিক তাই। ভাইসব, ব্যাপার চিরদিনই এমনি ছিলো। ওরা ওদের মুখোস খুলে ফেলে এমনি করেই নিজেদের নগ্ন রূপ দেখায় আমাদের।'

ইতালীয়টি ইমারত শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলো এবং নিজেকে বিক্রি করতে রাজি হয়নি বলে মাস ছয়েক আগে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। মনে হলো, সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু চেয়ারম্যান যখন তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, তখন সে মাথা নেড়ে চুপ করে রইলো।

সূচিশ্রমিক নেতা তখন সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'ভাইসব, শুধু কথায় কোন কাজ হবে না, এ শিক্ষা গ্রহণ করার সময় এসেছে আজ। কথা বলা আমাদের বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ কথা বলে যে মিনিটটি নষ্ট করবো, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অবস্থার শেষে এসে পৌঁছেছি আমরা। কিছু আমাদের নিশ্চয়ই করতে হবে। আমি জানি না কেমন করে করবো, কী করবো। আপনারা আমায় বলে দিন। আমাদের মধ্যে অনেকে দূর দেশ থেকে এখানে এসেছেন। সেখানে তাঁদের

মতোই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আছেন। তাঁরা সাক্কো এবং ভাঞ্জেত্তির সম্পর্কে কী ভাবছেন, কী করতে চান তাঁরা?'

'কী তারা করতে পারে এখন?' ইস্পাতশ্রমিক জানতে চাইলো 'শ্রমিকদের কথা, তাদের কি জানা উচিত, সে কথা বলা খুবই সহজ। কিন্তু শ্রমিকদের মাথা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাদের পেটে চড়া পড়ে গেছে। আর যদি তারা মুখ খোলে, সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে তাদের বলা হয় রাশিয়ার গোয়েন্দা। ই সপ্তাহ আগে আমরা এক ধর্মঘট আহ্বান করেছিলাম। কেউ কেউ সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলো, কেউ বা দেয়নি। কিন্তু যারা সেদিন সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির জন্য ধর্মঘট করেছিলো, তাদের সবাইকেই এর জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। আজ তাদের কাজ নেই। তাদের অনেকে আজ বেকার বসে স্ত্রীর করুণ মুখ দেখছে আর ক্ষুধার্ত সন্তানের আর্তনাদ শুনছে। আজ রাত্রে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যু হবে। ক ঘণ্টা বাকি আছে আর? ফ্রান্সের মতো বড় শক্তিশালী সংগঠন যদি থাকতো আমাদের, তবে আমরা ওদের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু তা আমাদের নেই। সুতরাং আর বোকা বনে লাভ নেই। যেখানে ফেডারেশনের ভালো জোরদার ইউনিয়ন আছে, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসবে আর বলবে, হতভাগা ইতালীয়রা ন্যায্য প্রাপ্যই পাচ্ছে। ব্যাপার এখন এমনি দাঁড়িয়েছে।'

তাম্রখনির শ্রমিকদের একজন মরিয়া হয়ে অধৈর্যের মতো প্রশ্ন করলো, 'নিউ ইয়র্কের জাহাজী শ্রমিকদের খবর কি? ওরা যদি এখনো বেরিয়ে আসে তবেও হয়তো কিছু কাজ হতে পারে। যাই হোক, এখানে সব বড় শান্ত। সমস্ত নগরী স্তব্ধ হয়ে আছে। এমন কি স্কোয়ারেও মানুষগুলো পর্যন্ত স্থির হয়ে রয়েছে। ওরা এরকম নিশ্চল হয়ে থাকলে কিছুই হবে না। পঞ্চাশ হাজার শ্রমিককে বের করে আনুন, কিন্তু যতক্ষণ তারা এগোতে না থাকবে ততক্ষণ কোন পরিবর্তন আসবে না পৃথিবীতে। আমি বুঝতে পারি না, ওরা ও রকম নিশ্চল হয়ে আছে কেন? ওদের কি আপনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না? আপনারা বলছিলেন, এই মানুষ দুটি আজ রাত্রে আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছে। এ নগরীকে আমি চিনি

না। এখানকার অবস্থাও আমার জানা নেই। কিন্তু আমরা যেখানে থাকি সেখানকার সবাই ব্যাপারটাকে সহজ স্বচ্ছভাবে দেখেছি। তাই আমরা স্থির করেছিলাম, সব ফেলে রেখে এখানে এই নিউ ইয়র্কে ছুটে আসবো। হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে যুক্তি দিয়ে, আবেদন করে আমাদের বলতে হবে, কেমন করে কাজ করা উচিত। সময়ের স্বল্পতাকে যখন ঘণ্টায় মিনিটে গোনা যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এমনি চুপ করে থাকা যায় না।'

চেয়ারম্যান দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'সময় আমি পরিমাপ করে দেখেছি। আমার মনোভাবও আপনারই মতো, বন্ধু। এখানকার সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, কিন্তু আমরা জানি-না কেমন করে ওখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের একটা শোভাযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। ওদের নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা দরকার। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে ওরা বুঝতে পারে, ওরা এগিয়ে যেতে শুরু করলে বাড়ির ছাদের উপরের ওই মেশিনগানগুলো গর্জন করে উঠবে না, ওদের মেরে ফেলবে না। আপনারা অতি ধীরে শিক্ষা লাভ করছেন, এত ধীর গতিতে যে লজ্জায় মাথা নুইয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের। যা আপনারা বন্ধ করতে পারবেন না, তা বন্ধ করতেই হবে বলে চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না। আমার মনে হয়, হয়তো কিছু করতে পারি আমরা, কিন্তু তা পারি শুধু যদি দণ্ডাজ্ঞা বিলম্বিত হয়।'

ইতালীয়টি এতক্ষণে মুখ খুললো। সে সবার মতোই স্বীকার করলো, এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো কিছুই করা যাবে না। চেয়ারম্যানের মতো ধীরে সে বলতে লাগলো। অন্য ভাষা, অন্য সংস্কৃতি থেকে শব্দ চয়ন করে তাকে কথা বলতে হচ্ছে। সে বললো, যা করা সম্ভব সবই অবিশ্যি করবে তারা, ম্যাসাচুসেট্‌সের গভর্নরের কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির কাছে তার করবে, যেখানে টেলিফোন করা যায় সেখানে টেলিফোন করবে আর এই শেষ মুহূর্তেও তারা যাবে শ্রমিকদের কাছে। সে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আমাদের সব কিছু করার পরেও যদি মরতে হয় সাকো আর ভাঞ্জেত্তিকে, অন্তরে আঘাত পাবো আমি। হয়তো সাকোর স্ত্রী বা তার সন্তানদের মতো কষ্ট হবে না আমার, তবু, আপনারা বিশ্বাস করুন, ভয়ানক কষ্ট পাবো

আমি। তবে এই কি শেষ? ওরা কি নিষ্ফলভাবে মরবে? এ কি পরাজয়? আমরা কি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো? আমি বলছি, সংগ্রাম চলতে থাকবে। হয়তো কাল আবার আমরা মিলিত হবো, কাল আবার এ নিয়ে আলোচনা করবো এবং ওরা যদি মৃত্যু বরণ করে তবে ওদের জন্য অন্তরের গভীরে এক উত্তপ্ত স্মৃতি বহন করবো। তাই নয় কি?'

অন্যেরা ওর দিকে তাকালো। কাজে ভেঙেপড়া সূচীশিল্পের একটি মেয়েশ্রমিক ছিলো ওদের মধ্যে। ইতালীয়টির দিকে তাকিয়ে তার চোখ জলে ভরে এলো, আর তার গাল বেয়ে নামলো তপ্ত অশ্রুধারা।

'আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন আপনি।' মেয়েটি বললো।

খানিকক্ষণ ওরা নীরবে বসে রইলো। তারপর তাম্রখনির শ্রমিক দুজন উঠে জানলা দিয়ে ইউনিয়ন স্কোয়ারের দিকে তাকালো। তারা নীরব প্রণতি জানালো ওই সীমাহীন জনসমুদ্রকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ওরা শুনছিলো চেয়ারম্যানের সুপারিশ,—সবাই মিলে অবিলম্বে নগরীর শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হোক, জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হোক, এবং ইউনিয়ন স্কোয়ার থেকে সিটি হলে এক মার্চ সংগঠিত করা হোক,—অবশ্য দণ্ডাজ্ঞা যদি বিলম্বিত করানো যায়। তাদের পরিকল্পনা, তাদের স্বপ্ন, আশা এমনি করেই ভাষায় রূপ পেলো। তাম্রখনির শ্রমিক দুটি এত দূর পথ এসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো অতীতের দীর্ঘ সংগ্রামে, যে সংগ্রামে তারা মার খেয়েছে, নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। তবু ইউনিয়ন স্কোয়ারের ওই জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আবার যেন শক্তি স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলো তারা, চেয়ারম্যানের প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতিতে যেন আশার আলো দেখতে পেলো। তাদের নিজেদের এবং অন্য সবার শক্তি যেন এক হয়ে তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। তারা কল্পনায় দেখতে পেলো ওই সুবিশাল জনসমুদ্রে এক প্রচণ্ড আলোড়ন জেগেছে। সে আলোড়নকে যদি সংগঠিত করা যায়, যদি ঠিক পথে পরিচালনা করা যায়, তবে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

বারো

তখন বেলা পাঁচটা। বিচারক বিরক্তির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনো আসেননি তিনি? কেন যে এলেন না, অথচ বলেছিলেন ঠিক পাঁচটায় আসবেন।'

স্ত্রী বললেন, 'তা নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ধরো, তাঁর কয়েক মিনিট দেরি হচ্ছে আসতে। দেরি হওয়ার তো অনেক কারণ থাকতে পারে।'

'তাই হয়েছে। যখন ওঁকে আমাদের দরকার তখন নানা কারণে ওঁর আসতে দেরি হয়। আর যখন আমাদের দরকার নেই, তখন ঠিক এসে হাজির হবেন। ঠিক তাই, দরকার না থাকলে তিনি এসে হাজির হতেন, এ তুমি নিশ্চিত জেনে রাখো।'

স্ত্রী বললেন, 'আজ অবিশ্যি একটা অসাধারণ দিন, আর এখানে গরমও বড় বেশি। তা তুমি বাইরের ঢাকা বারান্দায় গিয়ে বসো না। উনি এলেই তুমি দেখতে পাবে তাহলে। এখন যে কোন মুহূর্তে উনি এসে পড়তে পারেন।'

বিচারক ভাবলেন, তাই করবেন তিনি। ব্যাপারটা মন্দ হবে না। বাইরের ঢাকা বারান্দাটা একটু ঠাণ্ডাও হবে, সেখানে আরামও পাওয়া যাবে একটু। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি ঠাণ্ডা সরবত আর বাদাম-কেক নিয়ে বাইরে আসছেন। পাদ্রী বাদাম-কেক খুব ভালবাসেন। তারপর পাদ্রী এসে পড়লে ওদের দুজনকে আলাপ করতে দিয়ে তিনি চলে আসবেন।

বিচারক বাইরে এসে প্রশস্ত পুরনো ঢঙের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার নিয়ে বসলেন। বারান্দাটা বেশ ঠাণ্ডা, ছায়াচ্ছন্ন এবং চারদিক থেকে আড়াল করা। এর চারদিকে ঘন বুনটের চেরা-বাঁশের বেড়া। তার মধ্য দিয়ে সূর্যালোক আসতে পারে চুইয়ে চুইয়ে, কিন্তু বাইরের কেউ তার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে পায় না। বিচারক বেতের চেয়ারটিতে ঠেস দিয়ে পৌরুষের সঙ্গে নিজেকে সংহত করবার চেষ্টা করলেন। আজই একবার বুকের বাঁ দিকে হঠাৎ একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিলেন তিনি, আর

তখন প্রথমেই তিনি ভেবেছিলেন, "এই শেষ আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত যন্ত্রণার এই শেষ।" তখনই ডাক্তার ডাকা হয়েছিলো। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ওটা বায়ু থেকে হয়েছে; প্রাতরাশের সময় এমন কিছু খেয়েছেন তিনি যা তাঁর শরীর বরদাস্ত করতে পারেনি।

তখন তিনি ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'কেমন দিন আজ বুঝতে পারছেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'মনে হচ্ছে, ভয়ানক দিন।'

'ভয়ানক, বড় ভয়ানক,' বিচারক বললেন, 'বয়স আমার কম হয়নি। দেখুন, সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করার পুরস্কার কী পাচ্ছি, এ যেন কুকুরকে এক টুকরো শুকনো হাড় দেওয়ার মতো। বিচারক না হয়ে আপনি যে চিকিৎসক হয়েছেন, সে জন্য ভগবানের কাছে আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

ডাক্তার বললেন, 'সব পেশারই সমস্যা আছে। যার সমস্যা তার কাছে।'

এখন এই বেতের চেয়ারে বসে বিচারক মনে মনে আশ্বস্ত হলেন, দিনের আর বেশি দেরি নেই, আর ক ঘণ্টার মধ্যেই বাইশে আগস্ট শেষ হয়ে যাবে। সব কথা সব কাজের শেষে এই কঠিন সময়টিতে তিনি অন্য সবার চেয়ে শান্ত রয়েছেন। অবিশ্যি বাইরের ফটকে দুজন পুলিস থাকায় খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। কিন্তু যে ভয়ানক শাসানি তিনি আজ পেয়েছেন, তার প্রতিক্রিয়া যতটা হয়েছে দেহের ওপরে, মনের ওপরে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ সকালের ডাকে বেশ কয়েকশো চিঠি এসেছে তাঁর নামে। তাতে তাঁর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে মানসিক শান্তির বিপদ বেশি। তার মাত্র খানকয়েক পড়েছেন তিনি, আর আশ্চর্য হয়েছেন সব চিঠির বক্তব্যের সাদৃশ্য দেখে। যেমন করে ওঁকে তিরস্কার করা হয়েছে, ওই অসহনীয় মানুষ দুটির প্রাণরক্ষার দাবি জানানো হয়েছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, পত্রলেখকরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেছিলো। চিঠিগুলোর চেয়েও দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে কতগুলো মাসিক

সাপ্তাহিক পত্রিকা। কারা যেন পাঠিয়েছে ওগুলো। হয়তো একটা কাগজে এই মামলা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তাতে বিচারকেরও উল্লেখ আছে। সে কাগজটা এমনভাবে ভাঁজ করে পাঠানো হয়েছে যাতে প্রবন্ধটা একেবারে ওপরে থাকে। উল্লেখের জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে রঙীন পেন্সিলে একটা বৃত্ত এঁকে, কিংবা পৃষ্ঠাটির ওপরে একটা মোটা তীর এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা। বৃত্ত আর তীর আঁকা এমন একটা কাগজ আজ সকালেই এসেছে। এই ধরনের কাগজকে বিচারক সাধারণত বলতেন, "কসাইখানার কাগজ"। কিন্তু তবু এ কাগজটির এক জায়গার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেইটুকু দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে তিনি গোটা প্রবন্ধটাই পড়ে ফেলেছেন। প্রবন্ধটায় লেখা হয়েছে :

'বাইশে আগস্ট দিনটি বিচারক কেমন করে কাটাবেন আমরা তাই ভাবছি। তিনি কি সেদিন উৎসব করবেন? এক জুতোর কারিগর আর এক মাছের ফেরিওয়ালার মৃত্যু উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ কজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এই পবিত্র দেশের মাটিতে পুঁতে রাখা একশো বছরের পুরনো নিউ ইংল্যাণ্ড মদ পান করবেন? কিংবা বিবেক পরিচালিত হয়ে যাঁরা কর্তব্য করেন, তাঁদের মতো নির্জনে বসে সারাদিন আত্মানুসন্ধান করবেন? অথবা ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের মতো সারাদিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বাঁধাধরা কাজকর্ম করে যাবেন, স্বীকারই করবেন না, এ দিনটির সঙ্গে কোন পার্থক্য আছে অন্য দিনের?

'যেমন খুশি বিচারক কাটান গিয়ে দিনটি, আমরা তাঁকে ঈর্ষা করবো না। কবি ঠিকই বলেছেন, "যশ মান সবই সমাধিতে হবে শেষ।" বাইশে আগস্ট সোমবারটি যেমন করেই কাটান না কেন বিচারক, সব সময়েই তাঁর স্মরণে থাকবে, অন্যান্য সবার মতোই তিনিও মরণশীল। তাঁর মনের অন্তস্তলে সেই পবিত্র বাণী বাজতে থাকবে, "তোমারও বিচার হবে একদিন, বিচারক!"'

এইটুকু পড়েই বিচারক বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ক্রোধের সঙ্গে তিনি কাগজটার পাতা উলটে যেতে লাগলেন। খুঁজে দেখতে লাগলেন কোন্

সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী কিংবা অতিবিপ্লবী কাগজ এই বিরক্তিকর পন্থা অবলম্বন করেছে। দেখে আশ্চর্য হলেন, এই অংশটি এক প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের জাতীয় মুখপত্র থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তিনি নিজেই প্রায় এই সম্প্রদায়ের সমধর্মী। যেমন করেই হোক, এ আবিষ্কার তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে রইলো, অনবরত তাঁর মনে খোঁচা দিতে লাগলো, শেষে অসহ্য হয়ে উঠলো। তখন তিনি ফোনে পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি খানিকক্ষণের জন্য তাঁর বাড়িতে আসতে পারবেন কিনা। পাদ্রীর আজ অনেক কাজ। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, সন্ধ্যায় এলে চলবে কিনা। বিচারক তাঁকে পাঁচটায় আসতে বলেছিলেন। ডিনারেরও নেমন্তন্ন করে দিয়েছিলেন তাঁকে। তখনো দুপুর হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, বাকি ক ঘণ্টায় এমন কোন অসুবিধে কিংবা বিপদ হবে না, যা তিনি নিজে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না।

অথচ বাস্তবিকপক্ষে যেমনটি তিনি ভেবেছিলেন, অপরাহ্ণটা এলো একেবারে অন্য রকম। বাইরের দুনিয়া তাঁকে একাকী নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়নি। সারাদিন ধরে খবর, টেলিগ্রাম, বিশেষ জরুরী চিঠি আর টেলিফোন এসেছে একের পর এক। যতই ন্যায়পরায়ণতার বর্মে নিজেকে আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করুন না কেন, তিনি যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিলেন মনে মনে। এখন এই বিকেল পাঁচটায় তিনি প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। এখন কোন বন্ধু, কোন পাদ্রীর উপদেশ তাঁর বড় প্রয়োজন। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন এবং পাদ্রীকে যত ঔৎসুক্যের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁদের অতীত সম্পর্কের ফলে ততটা করা স্বাভাবিক নয়। পাদ্রী বুঝতে পেরেছিলেন, আজ বিচারকের জীবনের একটা অসাধারণ দিন। তাই ওঁর যে-কোন অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত ব্যবহার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত রইলেন তিনি।

বিচারক হৃদ্যতার সঙ্গে পাদ্রীর করমর্দন করে তাঁকে একটা বড় বেতের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। পাদ্রী বিনীতভাবে আসন গ্রহণ করলেন; শোলার টুপি আর লাঠিটা সন্তর্পণে নিচু টেবিলটার ওপরে রাখলেন। সেটার ওপরে ছিলো কতগুলো খবরের কাগজ আর মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঝি এলো ঠাণ্ডা সরবত আর কেক নিয়ে। বিচারক দু গ্লাস সরবত ঢেলে

নিলেন। পাদ্রী কপালের ঘাম মুছে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঠাণ্ডা সরবত পান করলেন। তারপর একটা বাদাম-কেক তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে প্রশংসা করতে করতে একটু হাসলেন তিনি।

তিনি বললেন, 'আপনার স্ত্রীর তৈরি এই সরবতও চমৎকার লাগছে। বেশ টাটকা, এমন নয় যে সাতদিন আগে তৈরি করে তুলে রেখেছিলেন। গরমের দিনে সরবত অনেকেই করে, কিন্তু এমন টাটকা চমৎকার স্বাদ আর এমন তাজা লেবুর গন্ধ তাতে কমই পাওয়া যায়। কথায় বলে না, সরবত খেলে বেশ রসিকতার মেজাজ আসে? আর আমার বিশ্বাস, সরবত খেলে গরমের দিনের বিশ্রী লাগা একদম কেটে যায়। আমি শুনেছি শোথ আর ঝিমুনি রোগেও সরবতে নাকি খুব উপকার হয়—'

সরবত পান করতে করতে কেক খেতে খেতে পাদ্রী এই ধরনের কথা বলতে লাগলেন। স্ফূর্তিবাজ বলে তাঁর সুখ্যাতি আছে; তিনি নাকি সব জিনিসের সুন্দর দিকটাই দেখেন। বিচারকের গম্ভীর, পাতলা চেহারার ঠিক উলটো ছিলেন তিনি। ভুঁড়িওয়ালা গোলগাল তাঁর শরীরটি আর তাঁর গাল দুটো তাজা আপেলের মতো ফোলা আর চকচকে।

বিচারক খানিকক্ষণ ধৈর্য সহকারে ওঁর কথা শুনলেন। শেষে আর এই অর্থহীন বকবকানি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, ওঁর সঙ্গে তাঁর কতগুলো গভীর দুশ্চিন্তার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

'দুশ্চিন্তার ব্যাপার?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন পাদ্রী, 'দেখুন, আমার মনে হয়, সবার আগে কতগুলো ভুল ধারণাকে দূর করা দরকার। দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ সবচেয়ে কম। পাদ্রীর কাজের মতোই বিচারকের কাজও ভগবানেরই কাজের অংশ। বিচার না থাকলে আসবে অরাজকতা, ধর্মযাজনা না থাকলে আসবে নাস্তিকতা। আমরা দুজনেই ভগবানের দাস। আর ফলতঃ আমাদের দুজনেরই কাজ যেন একই মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ। আপনার কি তাই মনে হয় না?'

বিচারক বললেন, 'ওরকম আমি ভাবিনি কোনদিন।'

'এখন ভাবুন, চেষ্টা করুন ভাবতে।' সরবতে চুমুক দিতে দিতে পাদ্রী বললেন।

বিচারক বললেন, 'যাই হোক, আপনি আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করে দেখুন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই মামলাটা চলেছে। এতদিনে বৃদ্ধ হয়েছি আমি। আমার মনের শান্তি পালিয়ে গেছে। এখন যেখানে যাই লোকে আমায় দেখিয়ে বলে, "ওই লোকটা? ওই লোকটাই তো সেই দুজন বিপ্লবীকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছে।" '

পাদ্রী সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'তবু এ কি অবশ্যম্ভাবী নয়? আপনি না করলে অন্য কাউকে তো করতে হতো এ কাজ। সর্বশক্তিমান ভগবানের নির্দেশে এ কাজ করতে হয়েছে আপনাকে। কাউকে বিচার করতেই হতো, ভগবান আপনাকে বেছে নিয়েছেন। আপনি নন, জুরীরা ওদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আর তারপরে ওদের দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে আপনি শুধু আপনার পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন।'

বলতে বলতে আর একটা কেক তুলে নিলেন পাদ্রী, আর এক গ্লাস সরবৎ ঢেলে দেওয়ার জন্য মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালেন বিচারককে। তারপর বলতে লাগলেন, 'এই বস্তুবাদের যুগে এমন অনেক বস্তুবাদী মানুষ আছেন যাঁরা বলবেন, আপনার বিচারের পরে আর বিচার নেই। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার এখনো বাকি রয়েছে। আর এক আদালতে হাজির হতে হবে ওদের; সেখানে আর এক বিচারক ওদের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করবেন। আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন। আর কেউ কি এর বেশি কিছু···করতে পারতো?'

'আপনার কথা শুনে বেশ স্বস্তি পাচ্ছি। আচ্ছা, এইটে দেখুন তো আপনি।' বিচারক রঙীন বৃত্ত আঁকা ধর্মীয় পত্রিকাটা ওঁর হাতে দিলেন।

পাদ্রী সেটা পড়ে ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, 'যে লোকটা এটা লিখেছে তাকে পেলে একবার দেখে নিতাম আমি। ওর সম্পর্কে কিছু খবরও নিতাম। জানতে চাইতাম সে কেমন খৃস্টান। বলছে, বিচার করো না, আবার নিজেই বিচার করছে। তার উদ্দেশ্য, তার সততা সম্পর্কেই আমার সন্দেহ জাগছে।'

'তবে এটা ওদের সরকারী মত বলে আপনি মনে করেন না?'

'সরকারী মত? কখ্খনো না, মোটেই না।'

বিচারক বললেন, 'জানেন, ভালো করে ঘুম হয় না আমার, বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখি, ভয়ানক সব স্বপ্ন। এ বিবেকের দংশন নয়। তা অসম্ভব।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি। বিবেকের দংশন কেন হবে?' পাদ্রী আর একটি কেক তুলে নিতে নিতে বললেন।

'আমার বিবেক স্বচ্ছ। যা করেছি তার জন্য অনুশোচনা নেই আমার। আমি সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেছি, তারপর ধীরভাবে তাকে যাচাই করেছি। সাক্ষ্যপ্রমাণের সোজা সমস্যাটি ছাড়িয়ে আরো গভীরে তলিয়ে দেখেছি। আপনাকে বলছি আমি, ওদের প্রথম যখন দেখলাম তখনই আমার প্রত্যয় হয়েছে ওরা দোষী। এ যেন ওদের কথার ভঙ্গীতে, ওদের দাঁড়াবার ভঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিলো। ওদের সর্বাঙ্গে যেন অপরাধের ছাপ। এই সাত বছর ধরে ওদের পক্ষের উকিলরা পৃথিবীতে যত রকমের সম্ভব, সব যুক্তি সব পথ ব্যবহার করেছে। আর কেউ কি আমার মতো ধৈর্যসহকারে ওদের যুক্তিতর্ক শুনতে পারতো, ওদের প্রস্তাব অনুধাবন করতে পারতো? প্রত্যেকটি প্রস্তাব আমি মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি। কিন্তু কেমন করে ওদের সম্পর্কে আমার মূল ধারণার পরিবর্তন করবো?'

'যদি তেমন কোন প্রমাণ না পেয়ে থাকেন, তবে কেন পরিবর্তন করবেন?'

এবারে বিচারক উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকটা উত্তেজনার সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, 'এ ছাড়া অবিশ্যি অন্য কথাও আছে। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে ওরা দুজন ওদের অসৎ মতলবের জন্যই মৃত্যুকে আহ্বান করছে। প্রথমে ওদের একমাত্র চিন্তা, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আমরা যা গড়ে তুলেছি, তাকে ধ্বংস করবে, তাকে উলটে ফেলবে, আর তারপর সমস্ত সম্পদ ওরা উপভোগ করবে। যখন আমাদের এই নিউ ইংল্যাণ্ডের দিকে তাকাই আমি, এর বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন গৃহ, এর শ্যামল মাঠ, আমাদের সুন্দর শিশুদের দিকে তাকাই, তখন এসব আগুনে পুড়ে ছাই হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। আমাদের এই প্রাচীন দেশে কোথায় যেন কি ঘটে গেছে। শয়তান, বদমায়েস একদল কালো চামড়ার মানুষ এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে, নিজেদের শয়তানি মতলবের জন্য ভয়ে ওরা চোখে

চোখে তাকাতে পারে না। এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে ওরা, নোংরা বস্তিতে বাস করে। সমস্ত দেশের ওপরে ওরা এক অমঙ্গলের অন্ধকারকে নামিয়ে আনছে। কী ঘৃণা হয় আমার! আমার এ ঘৃণা কি অন্যায়?'

'হয়তো এ রকম ঘৃণা করা অন্যায়।' পাদ্রী প্রায় দুঃখিত হয়ে বললেন।

'আপনার দৃষ্টিকোণ আমি বুঝতে পারছি।' পায়চারি করতে করতেই বিচারক মাথা দোলালেন, 'কিন্তু কম্যুনিস্ট স্যোসালিস্ট কিংবা আনার্কিস্টদের সম্পর্কে কী ভাবেন আপনি? মনে করুন, আদালতের সব ক্ষমতা ওদের হাতে গেলো। তখন আপনার আমার মতো প্রাচীন মতাবলম্বীদের প্রতি কোন্ সুবিচারটা করবে ওরা? সহজ কণ্ঠ আর নির্ভীক নীল চোখ দেখলেই ওরা মৃত্যুতাণ্ডব শুরু করে দেবে। ওরা ওদের অভিশপ্ত উত্তেজনা সৃষ্টির কায়দা নিয়ে এ দেশে এসেছে, নিয়ে এসেছে ওদের প্রচারের কাগজপত্র। ওরা বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে, সাধারণ শ্রমিকদের উত্তেজিত করে তুলছে, ভাইকে লেলিয়ে দিচ্ছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আর সবার কানে কানে বলে বেড়াচ্ছে, "আরো মাইনে চাও, আরো মজুরীর দাবি করো। মালিকরা সব শয়তান। তোমার মালিকও শয়তান। ওর যা আছে তা কেন তোমার হবে না?" যে দেশে আগে ছিলো শান্তি, ছিলো সন্তুষ্টি, সেখানে এখন আছে শুধু ঘৃণা আর দ্বন্দ্ব। ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত ছিলো যে উদ্যান, তা আজ মরুভূমিতে পর্যবসিত। যখন ভাবি, আমাদের এই সোনার নিউ ইংল্যাণ্ডে আসবে অজ্ঞতা আর ঘৃণার অভিশাপ, আসবে রাশিয়ার মতো দাস-শিবির, দুর্ভিক্ষ আর বাধ্যতামূলক শ্রম, তখন আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসে। যারা আমার দেশকে জানে না, যারা আমেরিকার নাম, আমেরিকার গৌরবময় অতীতকে ঘৃণা করে, তাদের ঘৃণা করা কি আমার অন্যায়?'

'শয়তানের দাস যারা তাদের ঘৃণা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। নইলে আর কেমন করে স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে লড়াই করবো আমরা?' কথাটা বলে একটু স্বস্তি পেলেন পাদ্রী। বিচারক এ কথায় অন্তত খানিকটা সান্ত্বনা পাবেন।

হঠাৎ পাদ্রীর দিকে তীরবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন বিচারক। প্রায় চিৎকার

করে বললেন, 'আমি নির্দোষ, এ কথা আমি বলছি না। কখনো কখনো আমি নির্বোধের মতো চিন্তা না করে কাজ করেছি। কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্য আমি কি সারা জীবন দগ্ধে মরবো? এ কথা সত্য, ওই দুটো বেজন্মা বিপ্লবীর যে বিচার আমি করেছি, সে সম্পর্কে দু-একটা কথা ক্রোধের সঙ্গেই বলেছি আমি, আপনারা যাকে বলবেন কঠোর ভাষা। কিন্তু এ কথা যখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন আমার মনে প্রচণ্ড রাগ। ভেবেছিলাম, যাদের কাছে বলেছি, তারা ভদ্রলোক। কিন্তু পরে টের পেলাম, আমার ধারণা ভুল, আমার শ্রোতারা মোটেই ভদ্রলোক নয়। ঠিক পরদিনই আমার সেই কথাগুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ওরা বলছে, আমি আমার ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং কুমতলব নিয়ে বিচার করেছি। এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর হয় না। আমি বলছি, এত বড় মিথ্যা আর হয় না। এ মামলার জন্য অনেকখানি মাশুল দিতে হয়েছে আমাকে। আমার জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মনের শান্তি আবার কবে ফিরে পাবো আমি?'

মুখের কেকটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে মাথা দোলালেন পাদ্রী। 'ও নিয়ে কারো হতাশ হওয়া উচিত নয়। সময় সবার বড় বৈদ্য। সর্বশক্তিমান ভগবান ছাড়া আর সব কিছুই কালে কালে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা আমাদের আজকের কথা ভাবছি, এই মুহূর্তের দুঃখদুর্দশা অসহ্য হয়ে উঠতেই ভাবছি এর শেষ নেই, এ দুঃসময় আর কাটবে না। কিন্তু এ তো মানুষের দৃষ্টির ভুল, আর ভুল করা মানুষের স্বভাব। ভগবান তাঁর নিজের পথে সব কিছু সারিয়ে দেন। সময় ভগবানের যাদুদণ্ড। সময়ে সব সেরে যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিচারক পদচারণা থামিয়ে আবার বেতের চেয়ারে বসলেন, বললেন, 'আপনার কথা শুনে বড় ভালো লাগছে। সত্যি, অনেক আশ্বস্ত বোধ করছি। কেউ ধারণাই করতে পারবে না, কী দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছি আমরা—আমি, জিলা অ্যাটর্নি, জুরিরা আর সরকার পক্ষের কজন সাক্ষী। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, আমরা নাকি বিদেশীদের ঘৃণা করি, ইতালীয়দের বিরুদ্ধে নাকি আমাদের বিদ্বেষপূর্ণ

মনোভাব ছিলো। ওরা আমাদের দেশে এসে ওদের লালসা চরিতার্থ করবে, দেশকে নরক বানিয়ে তুলবে, লুণ্ঠন করবে, অবাধে হত্যা করবে, আর যদি এর বিরুদ্ধে কিছু বলি আমরা, তখন ওরা বলবে, ওদের আমরা ঘৃণা করি, ওদের প্রতি বিদ্বেষ আছে আমাদের। আমায় বিশ্বাস করুন, এ যেন বোঝার মতো চেপে আছে আমার মনের ওপরে। দেশের সব ধ্বংসকামীর দল, আমেরিকাবিরোধী সব শয়তান এসে আঁকড়ে ধরেছে এই মামলাটাকে। ওরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে, সম্মানিত গবর্নরের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করছে মানুষের মনে। যাঁর অনুসন্ধানের ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হয়েছে, যিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ওদের শাস্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে, সেই বহু সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির বিরুদ্ধে পর্যন্ত ওরা কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

পাদ্রী বললেন, 'যিনি সাহসী তাঁকে খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আপনার কর্তব্য আপনি ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন, এ সান্ত্বনা তো আছে আপনার।'

পাদ্রী পকেটে হাত দিয়ে তাঁর সুন্দর সোনার ঘড়িটি বের করে সময় দেখে বলে উঠলেন, 'ওঃ, ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে!'

বিচারক বললেন, 'কিন্তু আপনার তো ডিনারে থাকবার কথা ছিলো।'

পাদ্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাকে মাপ করুন। অবিশ্যি থাকবো বলেই বলেছিলাম আপনাকে। কিন্তু আমার অনেক কাজ, অনেক পড়াশুনা বাকি রয়েছে। আমাকে যেতেই হবে।'

আসলে পাদ্রী অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। কারণ বিচারকের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে একটা পুরো বক্তৃতা তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছে। ভুলে যাওয়ার আগে সেটা লিখে রাখার জন্য একটা তাগিদ অনুভব করছিলেন তিনি। বিচারক দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে অনেক আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি। তিনি বাইরের গেট পর্যন্ত পাদ্রীকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তারপর আবার গিয়ে বসলেন ছায়াচ্ছন্ন বারান্দায়।

তেরো

পাদ্রী চলে যাওয়ার পর বিচারক তাঁর বেতের চেয়ারে বেশ আরাম করে বসলেন, পা দুটো রাখলেন একটা পা-দানির ওপরে। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য তিনি একখানা রহস্য সিরিজের উপন্যাস তুলে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারান্দায় আলো বড় কম। কয়েক লাইন পড়েই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সত্য কথা বলতে কি, সারা দিনের পুঞ্জীভূত দুশ্চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাদ্রীর কথায় খানিক সান্ত্বনা পেয়ে তাই তিনি সহজেই ঘুমিয়ে পড়লেন অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু যেমন সহজে যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, নিদ্রাটাও ততই অস্বস্তিকর, ততই ক্ষণস্থায়ী হলো। যেমন হচ্ছে ইদানীং, তেমনি স্বপ্নের পর স্বপ্ন দেখলেন তিনি। অতীতের সব ঘটনা নতুন করে স্বপ্নে দেখলেন আবার।

এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি কিছুদিন আগেকার একটি দিনের স্বপ্ন দেখলেন। সেদিন এ বছরেরই নয়ই এপ্রিল শনিবার, যেদিন তিনি এই মামলার আসামী ওই দুটো বিপ্লবীর শাস্তিদণ্ড বিধান করেছিলেন। প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেছে, কিন্তু ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে গভীর হয়ে গেঁথে আছে। তাঁর এই অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় তিনি যেন আবার জনপূর্ণ আদালতে তাঁর আসনে এসে বসলেন। মামলার নথিপত্র সব খোলা রয়েছে তাঁর সামনে। সাত বছর আগে অনুষ্ঠিত এক অপরাধের জন্য তিনি শাস্তি বিধান করতে যাচ্ছেন যে মানুষ দুটির ওপরে, তারা এই দীর্ঘ সাতটি বছর বন্দীশালায় কাটিয়েছে। ওরা যখন এসে আদালতকক্ষে ঢুকলো, তখন কেমন অদ্ভুতভাবে তিনি তাকালেন ওদের দিকে। কী অদ্ভুত লাগছে ওদের। ওরা কারা, ওরা কেমন দেখতে, সব যেন তিনি ভুলে গেছেন। যে কোন কারণেই হোক, যেমন তিনি ভাবতেন, এই ক বছর বাদে ওদের আর তেমন বদমায়েস, তেমন ভয়ানক মনে হচ্ছে না, যদিও ওদের আজ নিউ ইংল্যাণ্ডের বিচারালয়ের বিস্ময়কর বর্বরতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এ বিচারালয় যেন একটা পিঞ্জর, বিচার চলার সময় আসামীরা যেখানে

আবদ্ধ থাকে।

বিচারক তাঁর দণ্ড দিয়ে টেবিলে শব্দ করলেন। জিলা অ্যাটর্নি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'মাননীয় বিচারপতি, এখন ৫৫৪৫ এবং ৫৫৪৬ নম্বর মামলার বিচার হবে। বাদী কমনওয়েলথ সরকার এবং বিবাদী নিকোলা সাক্কো এবং বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি।

'আদালতের কাগজপত্র দৃষ্টে কমনওয়েলথ বনাম নিকোলা সাক্কো এবং বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির ৫৫৪৫ নম্বর মামলায় প্রতিবাদীরা হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। সমস্ত প্রমাণ এখন পরিষ্কার এবং সেই জন্যই আমি মাননীয় বিচারপতিকে শাস্তি বিধান করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। সংবিধানে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করার সময় স্থির করা সম্পর্কে আদালতকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদী পক্ষের উকিলদের অনুরোধ কমনওয়েলথ সরকার অগ্রাহ্য করেন না। তাঁদের অনুরোধক্রমেই আমি প্রস্তাব করছি, যে দণ্ড ওদের প্রতি বিধান করা হবে তা যেন আগামী দশই জুলাই রবিবার যে সপ্তাহ শুরু হবে, সেই সপ্তাহে কার্যকরী করা হয়।'

বিচারক মাথা দুলিয়ে জানালেন, তিনি জিলা অ্যাটর্নির সঙ্গে মোটামুটি একমত। আদালতের পেশকার আসামীদের প্রথম জনকে বললেন, 'নিকোলা সাক্কো, তোমায় কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, সে সম্পর্কে কিছু বলার আছে তোমার ?'

সাক্কো উঠে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে সোজা তাকিয়ে রইলো বিচারকের চোখে চোখে, বিচারক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হলেন চোখ নামিয়ে নিতে। অত্যন্ত শান্ত কোমল স্বরে সাক্কো বলতে শুরু করলো। বলতে বলতে তার কণ্ঠে জোর এলো, কিন্তু স্বর উঁচু করলো না সে। তার বর্তমান পারি-পার্শ্বিকতা থেকে প্রায় বিযুক্ত হয়ে সে বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ স্যার। আমি ভালো বক্তা নই, ইংরেজী ভাষার সঙ্গেও আমি খুব পরিচিত নই। আমি জানি এবং আমার বন্ধুরাও বলেছেন, ভাঞ্জেত্তি দীর্ঘ সময় ধরে বলবে। আমি ভাবছি, সে-ই বলুক তবে।

'এই আদালতের মতো নিষ্ঠুর কিছুর কথা আমি কোনদিন শুনিনি,

ইতিহাসেও পড়িনি। সাত বছর ধরে নির্যাতন করার পরেও বলা হচ্ছে আমরা অপরাধী, আর সেই সব ভদ্র মানুষেরা আজ আমাদের সামনে বসে আছেন।

'আমি জানি, এ শাস্তি এক শ্রেণী দিচ্ছে অপর শ্রেণীকে। আমরা বই দিয়ে নানা রকমের লেখা দিয়ে মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলি। আর আপনারা মানুষের ওপরে অত্যাচার করেন, তাদের হত্যা করেন। আমরা চাই মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে। আপনারা চেষ্টা করেন আমাদের সঙ্গে অন্য জাতির ব্যবধান গড়ে তুলতে, যাতে আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি। সেই নির্যাতিত শ্রেণীর একজন বলে আজ আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আর আপনারা হচ্ছেন নির্যাতক।

'এ কথা আপনি জানেন, বিচারক। আপনি আমার সমস্ত জীবনের ইতিহাস জানেন, জানেন কেন আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তবু এই সাত বছর ধরে আমাকে, আমার অসহায় স্ত্রীকে নির্যাতন করার পরেও আজ আপনারা আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেবেন। আমার সমস্ত জীবনের ইতিহাস বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী লাভ হবে তাতে? যা বলছি, তার সব কথাই আপনি জানেন। আমার বন্ধু. আমার কমরেড বলবে এখন। সে আমার চেয়ে এ ভাষা ভালো জানে। আমি এখন তাকে বলবার সুযোগ দেবো। আমার কমরেড সব শিশুদের প্রতি স্নেহশীল। এই সাত বছর ধরে যাঁরা তাঁদের সহানুভূতি, তাঁদের ভালবাসা, তাঁদের সমস্ত অন্তর নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনারা। তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামান না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে, আমাদের কমরেডদের মধ্যে, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এমন অসংখ্য চিন্তাশীল ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা এই সাত বছর ধরে আমাদের পক্ষ সমর্থন করছেন, কিন্তু তবু আদালতের কাজ এগিয়েই চলেছে। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাঁরা এই সাত বছর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, সেই সমস্ত জাতি, সমস্ত সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারে আমার বন্ধু ভাঞ্জেত্তিকে বলার সুযোগ দেবো আমি।

'একটা কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার কমরেড আমাকে

স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিচারক আমার সমস্ত জীবনের ইতিহাস জানেন। তিনি জানেন আমি কোনদিন কোন অপরাধ করিনি, অতীতে নয়, বর্তমানে নয়, কোনদিনই না।'

সে থামলো, আর এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা নেমে এলো বিচারশালায়। আজ সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে বিচারকের মনে হলো, এ স্তব্ধতা যেন অনন্তকাল ধরে চলবে। অথচ আসলে স্তব্ধতা ছিলো কয়েক মুহূর্ত মাত্র। পেশকার এই স্তব্ধতা ভাঙলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কাজের লোকের মতো তিনি দ্বিতীয় আসামীর দিকে নির্দেশ করে সংক্ষেপে বললেন, 'বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি, তোমায় কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না সে সম্পর্কে কিছু বলার আছে তোমার?'

এই পশুসুলভ প্রশ্নের পরে যতক্ষণ না ভাঞ্জেত্তি কথা বললো, ততক্ষণ এক কঠিন নৈঃশব্দ বিরাজ করতে লাগলো সেখানে। প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে সে কিছু বললো না, শুধু আদালতের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তাকালো বিচারকের দিকে, জিলা অ্যাটর্নির দিকে, পেশকারের দিকে এবং দর্শকদের দিকেও। তার নীরবতা প্রায় অমানুষিক। তারপর ধীরে, আবেগহীনভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে সে বলতে শুরু করলো, 'হ্যাঁ, আমি শুধু বলতে চাই, আমি নিরপরাধ। শুধু নিরপরাধই নই, আমার সমস্ত জীবনে আমি কখনো চুরি করিনি, জীবহত্যা করিনি, রক্তপাত ঘটাইনি কখনো। শুধু এই কথাই বলতে চাই আমি। শুধু তাই নয়। আমি যে এই দুটো অপরাধে অপরাধী নই, কখনো চুরি করিনি, জীবহত্যা করিনি, রক্তপাত ঘটাইনি কখনো, শুধু তাই নয়। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সারা জীবন ধরে পৃথিবীতে যাতে কোন অপরাধ না ঘটে তার জন্য সংগ্রাম করে এসেছি আমি।

'আমি বলছি, এই দুটি অপরাধে আমি অপরাধী নই। হয়তো দু-একটা পাপ করেছি জীবনে, কিন্তু কোন অপরাধ করিনি। আইন এবং নৈতিকতার চোখে যা অপরাধ, আইনে বা নীতিবোধে যা আটকায় না এমন অপরাধ, মানুষকে মানুষের শোষণ নির্যাতন করার অপরাধ,—সব কিছুকেই পৃথিবীর বুক থেকে নির্বাসিত করার জন্য সংগ্রাম করে এসেছি আমি। আর শুধু

এর জন্যই আজ আপনারা আমার মৃত্যুদণ্ড বিধান করবেন।'

ভাঞ্জেত্তি একটু থামলো। মনে হলো যেন ভাষার জন্য, অতীতের সব ঘটনার জন্য সে তার স্মৃতির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। যখন আবার সে বলতে আরম্ভ করলো তখন প্রথমে বিচারক বুঝতে পারলেন না ও কিসের কথা বলছে। ক্রমে ক্রমে যেন ওর কথার মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসে সূক্ষ্ম দেহ বৃদ্ধ ইউজিন্ ডেব্ স্ আদালতকক্ষে প্রবেশ করলেন।

এবারে বিনীত হয়ে বলতে লাগলো ভাঞ্জেত্তি, 'আপনারা আমাকে মাপ করুন। আমার সারা জীবনে একজন সবার সেরা সৎ মানুষকে আমি দেখেছি। তাঁর স্মৃতি জনগণের একান্ত ভালবাসার, একান্ত আপনার হয়ে উঠবে দিনের পর দিন। সে স্মৃতি বেঁচে থাকবে যতদিন মানুষ সততা এবং আত্মাহুতিকে শ্রদ্ধা করবে। আমি ইউজিন্ ডেব্‌সের কথা বলছি।

'আদালত, জুরি এবং বন্দীশালা সম্পর্কে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা ছিলো এই মানুষটির। পৃথিবীকে শুধু একটু সুন্দরতর করতে চেয়েছিলেন বলে কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি, হাজার রকমের দুর্নাম সহ্য করেছেন, শেষে বন্দীদশাই হত্যা করলো তাঁকে। আমাদের. নির্দোষিতার কথা তিনি জানেন, জানেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ, শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্বদেশে। তাঁরা সবাই আমাদের পক্ষে আছেন, ইউরোপের সমস্ত সৎ মানুষ, শক্তিশালী লেখকেরা, মহত্তম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সবাই আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। বিদেশের জনসাধারণ আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

'এ কি সম্ভব, জুরিদের মধ্যে এই দু-একজন মানুষ পার্থিব সম্পদ, পার্থিব সম্মানের জন্য নিজেদের মায়ের অবমাননা করবে? আর সমস্ত পৃথিবী যখন বলছে এ অন্যায়, যখন আমি জানি এ অন্যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর মতের বিরুদ্ধে ওরা যা করছে তাই কি ন্যায় হতে পারে? এটা ন্যায় কি অন্যায় তা যদি কেউ জানে, তো জানেন ওই মানুষটি, আর জানি আমি। সাত বছর ধরে বন্দী হয়ে আছি আমি। এই সাত বছর কী নির্যাতন ভোগ করেছি তা কেউ ভাবতেও পারে না। কিন্তু তবু দেখুন আমি কাঁপছি না, তাকিয়ে আছি সোজা আপনাদের চোখে, লজ্জায় বা ভয়ে ফ্যাকাশে

হয়ে যাচ্ছি না।

'ইউজিন্ ডেব্স্ বলেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ দাখিল করেছেন আপনারা, তাতে আমেরিকান জুরিরা মুরগী হত্যার অপরাধে একটা কুকুরকেও অভিযুক্ত করতে পারতো না।'

ভাঞ্জেত্তি আবার থামলো। নতুন করে বক্তব্য শুরু করবার আগে একবার বিচারকের চোখে চোখ রাখলো। স্বপ্নের এই অংশটাই দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ হয়ে উঠলো। বিচারক তবু অচঞ্চল অবিচল রইলেন। ভাঞ্জেত্তি চিৎকার করে উঠলো, 'আমাদের প্রতি যত নিষ্ঠুর, যত বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার আপনি করেছেন, তা পৃথিবীতে অন্য কোন বিচারক করতে পারতেন না, এ কথা আমরা প্রমাণ করেছি। হাঁ্যা, এ কথা প্রমাণ করেছি আমরা। তবু নতুন করে আমাদের বিচার করতে রাজী হয়নি ওরা। আমরা জানি এবং আপনিও মনে মনে জানেন, আমাদের দেখার আগেই আপনি জানতেন আমরা প্রগতিবাদী, সুতরাং কুকুরেরও অধম।

'আমরা জানি আপনি আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, আমাদের প্রতি আপনার বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। আপনারই দলীয় বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন বোস্টনের ইউনিভার্সিটি ক্লাবে, ম্যাসাচুসেট্সের ওরচেস্টারে গল্ফ ক্লাবে। মাননীয় বিচারপতি, দুঃখের সঙ্গে হলেও আপনাকে এই সম্বোধন করছি আমি, কারণ আপনি আমার বাবার মতোই বৃদ্ধ। আমি নিশ্চিত জানি, আপনার সমস্ত বক্তব্য যাঁরা জানেন তাঁদের যদি সৎসাহস থাকতো, যদি তাঁরা সব কথা প্রকাশ করতে পারতেন, তবে হয়তো আপনাকে সুবিচার নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হতো।

'যে সময়ে আমাদের বিচার করেছেন আপনি, তার কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে। আমি বলছি, সে সময়ে সমস্ত দেশ আমাদের মতাবলম্বী মানুষদের বিরুদ্ধে, সমস্ত বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। আর আমার মনে হয়েছে, শুধু মনেই হয়নি, এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আপনি এবং জিলা অ্যাটর্নি জুরিদের মনে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ক্রোধের উদ্রেক করতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেছেন।

'জুরিরা আমাদের ঘৃণা করেন, কারণ আমরা যুদ্ধবিরোধী। কেউ যদি বিশ্বাস করে যুদ্ধ অন্যায়, যদি সব দেশকে ভালবাসে সে এবং সে জন্যই যুদ্ধের বিরোধিতা করে, তবে তার কী অর্থ জুরিরা তা জানেন না। কিন্তু জানেন, যে লোক যুদ্ধে প্রতিপক্ষের লোককে ভালবাসে, সে গোয়েন্দা। আমরা সে ধরনের মানুষ নই। জিলা অ্যাটর্নি জানেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করি না বলেই আমরা যুদ্ধবিরোধী। আমরা বিশ্বাস করি, যুদ্ধ করা অন্যায়, আর বিগত দশ বছরে আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে, কারণ দিনের পর দিন যুদ্ধের ভয়াবহ ফল প্রত্যক্ষ করছি আমরা। যুদ্ধ অন্যায়, এ কথা আজ আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে বিশ্বাস করি। ফাঁসির মঞ্চে যেতেও আমার আপত্তি নেই, যদি আমি সারা পৃথিবীর মানুষকে বলতে পারতাম, "তাকিয়ে দেখুন, মানবসভ্যতার ধ্বংসের আর দেরি নেই। কিন্তু কেন? ওরা যা বলেছে আপনাদের, যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সব মিথ্যা, সব ধাপ্পা, সব জোচ্চুরি, কঠিন অপরাধ। ওরা আপনাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু কোথায় মুক্তি? সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কোথায় সমৃদ্ধি? ওরা উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কোথায় উন্নতি?"

'যেদিন আমি প্রথম চার্লসটাউন বন্দীশালায় যাই, সেদিন থেকে আজকের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছে। এ যুদ্ধ পৃথিবীতে কোন নৈতিক মঙ্গল এনেছে? কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে এই যুদ্ধের ফলে? আমাদের জীবনের, আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরাপত্তা কোথায়? জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা কোথায়? মানবমনের সৎপ্রবৃত্তির প্রতি কোথায় শ্রদ্ধা, কোথায় সম্মান? যুদ্ধের আগে আজকের মতো এত অপরাধ, এত দুর্নীতি, এত নৈতিক অধঃপতন আর কোনদিন ছিলো না।'

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আবার একটু থামলো সে। স্বপ্নের ঘোরে বিচারক যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে এপাশ ওপাশ করলেন, আর্তনাদ করে উঠলেন। তবু বার বার তাঁকে শুনতে হলো ওর কথা।

ভান্জেত্তির কণ্ঠ যেন আর আসামীর কণ্ঠ নয়, এ যেন বিচারকের কণ্ঠ। সে বলে চললো, 'আপনারা বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে বিচারে বিলম্ব

ঘটানোর জন্য নানা রকমের বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি মনে করি এ কথা ক্ষতিকর, কারণ এ সত্য নয়। বিবেচনা করে দেখুন, সরকার-পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ দাখিল করতে এক বছর সময় লাগিয়েছেন। যে পাঁচ বছর ধরে আমাদের মামলা চলেছে তার প্রথম বছর কেটেছে বিচার শুরু করতেই। তখন আমাদের পক্ষ থেকে আপীল করা হলো, আপনারা আরও কিছু সময় কাটিয়ে দিলেন। আমি মনে করি, আমাদের সব আপীল আপনারা বাতিল করবেন বলে আগে থাকতেই কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। মাসখানেক মাস দেড়েক অপেক্ষা করে বড়দিনের ঠিক আগে, ঠিক বড়দিনের দিন সন্ধ্যায় আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত জানালেন। বড়দিনের সন্ধ্যার রূপকথায় আমরা বিশ্বাস করি না, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও না, ধর্মীয় দৃষ্টিতেও না। আপনারা জানেন, কেউ কেউ এ রূপকথায় এখনো বিশ্বাস করে। আমরা বিশ্বাস করি না বলে আমরা মানুষ নই, তা তো ঠিক নয়। আমরা মানুষ, আর বড়দিন সবার কাছে, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে মধুর। আমার বিশ্বাস, বড়দিনের সন্ধ্যায় আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আপনারা আমার পরিবার, আমার আত্মীয়দের হৃদয় বিষাক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন।

'আমি আগেই বলেছি, আমি যে ওই দুটো অপরাধে অপরাধী নই, তাই শুধু নয়, আমার সমস্ত জীবনে কোন অপরাধ করিনি আমি,—চুরি করিনি, জীবহত্যা করিনি, রক্তপাত ঘটাইনি। বরঞ্চ অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি আমি। আইন এবং ধর্ম যে অপরাধকে সমর্থন করে, পবিত্র বলে মনে করে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আজ আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছি আমি।'

বিচারকের স্বপ্নে ভাঞ্জেত্তির কণ্ঠস্বর এবারে উচ্চগ্রামে উঠলো, ক্রমশ ভয়াবহ, হিংস্র হয়ে উঠলো, আর উত্তপ্ত লৌহ শলাকার মতো বিঁধতে লাগলো নিদ্রিত মানুষটিকে।

'এই কথাই বলছি আমি: যে অপরাধ আমি করিনি তার জন্য কী নির্যাতন আমাকে ভোগ করতে হয়েছে, তা আমি কুকুর কিংবা সাপের মতো নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবদের কাছে বলবো না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার

অপরাধের জন্যই আমি নির্যাতিত হয়েছি। আমি প্রগতিবাদী বলেই আমার এ নির্যাতন, হ্যাঁ, আমি প্রগতিবাদী। আমি ইতালীয় বলে আমার এ নির্যাতন, তবু আমি ইতালীয়। কিন্তু আমার মতবাদে আমার বিশ্বাস এত দৃঢ় যে আপনারা যদি দু-দুবার আমাকে হত্যা করেন, আর আমি যদি দু-দুবার পুনর্জন্ম লাভ করি, তবে আমি এই জন্মে যা করেছি, তাই আবার করবো।

'নিজের কথা অনেক বললাম আমি। সাক্কোর নাম করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই সাক্কোও ছিলো একজন সৎ শ্রমিক, দক্ষ কারিগর। কাজ ভালবাসতো সে। তার কাজে ভালো মাইনে পেতো সে। তার ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিলো। সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর দুটি সন্তান ছিলো তার। আর তার ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাড়িখানি ছিলো বনের শেষে পাহাড়ি ঝরনার কাছটিতে। তার অন্তর, তার বিশ্বাস, তার চরিত্রে সাক্কো একজন খাঁটি মানুষ। সে প্রকৃতিপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক। মানবপ্রেম আর মানুষের মুক্তির জন্য সে তার সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে, বিসর্জন দিয়েছে তার অর্থ, তার উচ্চাশা, তার স্ত্রী, পুত্র, তার নিজের জীবন পর্যন্ত। চুরি করার কথা, হত্যা করার কথা সাক্কো কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত নিজের পরিশ্রমে অর্জিত নয় এমন এক টুকরো রুটিও আমরা মুখে তুলিনি, কখনো না।

'হ্যাঁ, ওর চাইতে ভালভাবে কথা বলতে পারি আমি। কিন্তু ওর হৃদ্যতা-পূর্ণ কণ্ঠে ওর মহান বিশ্বাসের কথা শুনে, ওর চরম আত্মত্যাগের কথা ভেবে, ওর বীর্যের কথা স্মরণ করে কতবার ওর মহত্ত্বের কাছে আমার নিজেকে মনে হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে। তখন এই মানুষটি, যাকে তস্কর, হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে আজ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তার মনে আঘাত না দেওয়ার জন্য কতবার আমার অশ্রুকে জোর করে শুকিয়ে ফেলেছি, অন্তরের কান্নাকে অবদমিত করে রেখেছি। কিন্তু মানুষের অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার আসন নিয়ে বেঁচে থাকবে সাক্কোর নাম, বেঁচে থাকবে তখনো, যখন জিলা অ্যাটর্নি আর আপনার স্মৃতি মিলিয়ে যাবে কালের গর্ভে, যখন আপনাদের নাম, এই আইনকানুন, আপনাদের দেবতারা, সব

পরিণত হবে অভিশপ্ত অতীতের অবলুপ্ত স্মৃতিতে, যে অতীতে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার ছিলো নেকড়ের মতো হিংস্র…'

এই কথা বলে ভাঞ্জেত্তি তার বক্তব্য শেষ করলো। তার শেষ কথাটি যেন নিঃশব্দ আদালতকক্ষের কেন্দ্রস্থলে এসে পড়লো একটা হাতুড়ির আঘাতের মতো। এবারে ভাঞ্জেত্তি সোজাসুজি তাকালো বিচারকের চোখের দিকে, আর তার বড় বড় ভয়ঙ্কর দুটো চোখ বিচারকের আজকের দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে রইলো।

ভাঞ্জেত্তি বললো, 'আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনাদের ধন্যবাদ।'

বিচারক হঠাৎ তাঁর হাতের দণ্ড দিয়ে টেবিলে শব্দ করলেন, কিন্তু তখন আদালতকক্ষে কোন বিশৃঙ্খলা, কোন শব্দই ছিলো না, যা তিনি শান্ত করবেন। দণ্ডটা রেখে দিলেন তিনি, আর তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো। নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'ম্যাসাচুসেট্সের আইন অনুসারে জুরিরা স্থির করেন, আসামী অপরাধী কি নিরপরাধ। সে সম্পর্কে আদালতের কিছুই করণীয় নেই। ম্যাসাচুসেট্সের আইনে ঘটনা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার কোন ক্ষমতা বিচারকের নেই। আইনে তাঁর ক্ষমতা আছে শুধু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবৃত করার।

'বিচার চলাকালীন অনেক আপত্তি তোলা হয়েছিলো। সব আপত্তিই সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা হয়েছে। সমস্ত আপত্তি বিবেচনা করে সেই আদালত চরম সিদ্ধান্তে বলেছেন, "জুরিদের রায়ই বলবৎ থাকবে। সমস্ত আপত্তি নাকচ করা হলো।" এ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন আইনানুগ কর্তব্যের। সুতরাং এই আদালতের ওপরে একটিমাত্র দায়িত্ব বর্তায়, সে দায়িত্ব শাস্তি বিধানের।

'প্রথমে নিকোলা সাকোর শাস্তি বিধান করা হচ্ছে। নিকোলা সাকো, পূর্ণ বিবেচনার পর এই আদালত তোমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন। উনিশশো সাতাশ সালের দশই জুলাই রবিবার যে সপ্তাহ শুরু হবে, তারই মধ্যে একদিন তোমার দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এই দণ্ড কার্যকরী করা হবে। আইনানুসারে এই তোমার দণ্ড।

'বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি, পূর্ণ বিবেচনার পর এই আদালত—'

এই মুহূর্তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভাঞ্জেত্তি চিৎকার করে উঠলো, 'মাননীয় বিচারপতি, এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আমার উকিলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।'

'আমি মনে করি, আগে রায় দেওয়া প্রয়োজন।' বিচারপতি বললেন, 'বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি, তোমার প্রতি এই আদালত মৃত্যুদণ্ডের—'

সাক্কো হঠাৎ ওকে বাধা দিয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলো, 'আপনি জানেন আমি নিরপরাধ। এই কথাই আমি দীর্ঘ সাত বছর আগে বলেছিলাম। দুজন নিরপরাধ মানুষকে দণ্ডিত করলেন আপনারা।'

কিন্তু বিচারক নিজেকে শক্ত করে ফেললেন। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সংযত করে শান্ত স্বরে তিনি বলে চললেন, '—আদেশ দিচ্ছেন। উনিশশো সাতাশ সালের দশই জুলাই রবিবার যে সপ্তাহ শুরু হবে, তারই মধ্যে একদিন তোমার দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এই দণ্ড কার্যকরী করা হবে। আইনানুসারে এই তোমার দণ্ড।'

এর পরেই বিচারক বললেন, 'আদালতের কাজ এখন স্থগিত থাকবে।'

আর আজ, অনেক বিলম্বিত হওয়ার পর এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য যে দিনটি চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়েছে, সেই বাইশে আগস্টের সন্ধ্যায় বিচারক ঘুম থেকে জাগলেন। তখনো তাঁর কানের কাছে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁর শেষ কথাটি, "আদালতের কাজ এখন স্থগিত থাকবে।" তিনি জেগে উঠলেন, শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডিনারের জন্য ডাকছে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে এত কম বিচলিত হয়েছিলেন, তা লক্ষ্য করার মতো। হঠাৎ তীব্র ক্ষুধা অনুভব করলেন তিনি। আর এই ভেবে তিনি আনন্দ এবং স্বস্তি পেলেন যে দিনটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ ব্যাপারটা শীগগিরই চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে, আর সবাই ভুলেও যাবে শীগগিরই। অন্তত এই ভেবে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন।

দীর্ঘতম নিঃসঙ্গতম তীর্থযাত্রারও শেষ আছে। আইনের অধ্যাপক আজ যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রে এলেন। যেন বিশ্বলোকের শেষ প্রান্তে এসে কয়েক মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন জীবনের গভীরতম সত্যের দিকে; যা দেখলেন, তা বেদনাদায়ক, বিচলিত করার মতো। গৃহ, সন্তান,—সবার কথা বিস্মৃত হয়েছেন তিনি; যখন খেলেন, খাদ্য তাঁর মুখে লাগলো বিস্বাদ। আসামীপক্ষের অ্যাটর্নির সঙ্গে আজ আহার করেছেন তিনি। অ্যাটর্নি আজ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান মানুষ দুটির সঙ্গে দু-চারটে শেষ কথা বলার জন্যই শহরে এসেছেন। কিছুদিন আগে এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আশা করেছিলেন, নতুন কোন আইনজীবী হয়তো গবর্নরকে প্রভাবিত করতে পারবেন। আজ তিনি বোস্টনে এসেছেন আর একবার বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে আলাপ করার জন্য। আইনের অধ্যাপককে তাঁর সঙ্গে বন্দীশালার মৃত্যুকুঠুরিতে যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন।

আজ সারাদিন ভাঞ্জেত্তির ছায়া রয়েছে অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে, এখনো যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তাঁর পাশে পাশেই। তিনি তাঁর কৃষ্ণকায় সহগামীকে মনে মনে নমস্কার করে বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, ভাঞ্জেত্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো না আমি।'

অ্যাটর্নি বললেন, 'কেন? আপনি তো আর ওকে মৃত্যুদণ্ড দেননি।'

'কিন্তু তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বিচারক রায় দেওয়ার পরে নয়ই এপ্রিল ভাঞ্জেত্তি যে বিবৃতি দিয়েছিলো তা আপনার মনে আছে?'

অ্যাটর্নি মাথা নাড়লেন। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে অধ্যাপক বললেন, 'তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি শোনাচ্ছি আপনাকে। সে বিবৃতি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, তাকে আমি অন্তরে সংরক্ষিত করে রেখেছি এক পবিত্র প্রস্তরখণ্ডের মতো। আবেগোচ্ছল হতে চাই না আমি। কিন্তু আজ

সকালে আমি এক মহান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি,—কার কথা বলছি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তারপরে দেখেছি এক নিগ্রো শ্রমিককে,—রাজ্যভবনের সামনে পিকেট লাইনে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে নৃশংসভাবে প্রহার করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। স্বচ্ছভাবে ব্যাপারটাকে বুঝতে চাই আমি। নিজেকে প্রশ্ন করেছি ভাঞ্জেত্তির বিবৃতির কী অর্থ। সে বলেছে, "যদি এমনটি না ঘটতো, তবে সারা জীবন আমাকে কাটাতে হতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা দিয়ে। শ্রোতারাই আবার ঘৃণা করতো আমাকে। কেউ আমাকে চিনতো না, জানতো না, ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই মরতে হতো আমাকে। এখন আর আমাদের জীবন ব্যর্থ নয়। এ আমাদের জয়, আমাদের গৌরবময় সাফল্য। দৈবাৎ এ যোগাযোগ না হলে সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের সপক্ষে সারা জীবনেও এত কাজ করার কথা আমরা আশাও করতে পারতাম না। আমাদের সব কথা, জীবন, সব যন্ত্রণা দিয়েও না,—একজন সৎ জুতোর কারিগর, আর একজন গরীব মাছের ফেরিওয়ালার জীবনের বিনিময়েও না। শেষ মুহূর্তটিতে জয়ী হয়েছি আমরা,—এ যন্ত্রণা আমাদের জয়গৌরব।"

'কী অদ্ভুত. কী আন্তরিক এই কথাগুলো! কতবার আমি এর অর্থ খুঁজে দেখেছি আমার অন্তরের গভীরে! তবু হয়তো বুঝতে পারিনি ভালো করে। দুজন মানুষ মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে, অথচ তার বিরুদ্ধে হাত তুলবার শক্তি নেই আমার।'

অ্যাটর্নি বললেন, 'আপনি তো রোধ করতে পারবেন না একে। এ কথা আপনার বোঝা দরকার, আপনি বা আমি এখন আর কিছুই করতে পারবো না।'

'আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ফল কি এই?' অধ্যাপক অবাক হয়ে বললেন, 'তবে বলবো, সে ফল শুভ হয়নি। আমি তো ইহুদি, এ দেশের মানুষও নই আমি; কিন্তু কই আমাকে তো ধরে থানায় নিয়ে মেরে রক্তের বন্যায় অন্ধ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। নিগ্রো শ্রমিকটি তো শুধু পিকেট লাইনে গিয়েছিলো। আমি তো তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছি। এই

দেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে মুখের ওপরে গালাগাল করেছি। বলেছি, সে মিথ্যাবাদী। বলেছি, তার হাত ছুটো খুনের রক্তে রাঙানো। কিন্তু আমার তো শাস্তি হলো না। এখন অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারছি, শাস্তি শুধু নির্যাতিত শ্রেণীর জন্যই, যেমন ভাঞ্জেত্তি বলেছে। আর আমরা শুধু ওর বক্তব্যের ভাষা শুনে আনন্দ পাচ্ছি। অথচ আমরাই ওদের ছুজনকে হত্যা করছি, কারণ ওরা প্রগতিবাদী, অন্য কোন কারণে নয়। ক্ষমতাশালীদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আর সে চ্যালেঞ্জের জন্য জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হবে একজন জুতোর কারিগর আর একজন মাছের ফেরিওয়ালাকে। কিন্তু এ নিয়ে এত আলোড়ন কেন, কেন এর প্রতিবাদে এত গর্জন? কত লোক নীরবে মৃত্যু বরণ করেছে, আপনি আর আমি তো কখনো তার প্রতিবাদ করিনি। আজ সেই বিবেকের দংশন শান্ত করার চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু এক মাস বাদে ধনী এবং ক্ষমতাশালীদের মধ্যে আমরা আবার স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করবো। হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে বিতাড়িত করা হবে, কিন্তু সে ক্ষতি আমি সুদে আসলে পুষিয়ে নেবো আমার ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে ওর দ্বিগুণ টাকা উপার্জন করে,—আর আমার মক্কেল হবে তারাই, যারা সাকো আর ভাঞ্জেত্তির হত্যার জন্য দায়ী। অথচ তবুও বলতে চাইছি, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ—'

অ্যাটর্নি নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। তিনি একজন মধ্যবয়সী ইয়াংকি, সৎ, আন্তরিক। অর্থ বা যশের লিপ্সায় তিনি এই মামলার ভার নেননি, তিনি এসেছিলেন বিবেকের প্রচণ্ড তাড়নায়। সুতরাং অধ্যাপকের এই আবেগপূর্ণ কথায় খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। চিন্তিত হয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে তিনি শুনতে লাগলেন। পরে বললেন, 'আমি কখনও ওদের মত গ্রহণ করিনি। কিন্তু রক্তের গন্ধে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। ওদের হত্যা করা হচ্ছে, আর এ যে ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য লজ্জায় আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু তবু হয়তো আশা আছে এখনো, আপনি আমার সঙ্গে বন্দীশালায় চলুন, চলুন আপনি।'

আরো যুক্তি-তর্কের পর আইনের অধ্যাপক শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ছুজনে হেঁটে চললেন রাজ্যভবনের পাশ দিয়ে। সেখানে

তখনো পিকেট লাইন নড়াচড়া করছে। তার কাছাকাছি আসতেই পিকেট লাইনের অনেকেই ওঁদের অভ্যর্থনা জানালো, কিন্তু সে অভ্যর্থনা দুঃখার্ত। অল্পবয়সী দীর্ঘকায়া মহিলা কবিটি, যাঁর কাব্য সমস্ত পৃথিবীতে পরিচিত, তিনি অ্যাটর্নির হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'কিছু একটা করুন আপনারা, এখনো সময় আছে।'

'আমার ক্ষমতায় যা কুলোয় তা নিশ্চয়ই আমি করবো, বোন।'

দুজনের সারিতে ছজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। তাদের হাতের ফেস্টুনে লেখা রয়েছে, "আমরা ম্যাসাচুসেট্‌সের ফল নদী এলাকার কাপড়ের কলের শ্রমিক। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যু হলে ভগবান যেন নিউ ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতাপন্নদের মার্জনা করেন!" পাশের গলিতে পক্বকেশ এক বৃদ্ধ একটি ছোট ছেলের হাত ধরে পিকেট লাইনের সঙ্গে এগোচ্ছেন আর পেছোচ্ছেন। হয়তো ছেলেটি তাঁর নাতি হবে। তার কানে কানে কী যেন বুঝিয়ে বলছেন তিনি। কিন্তু শেষে ছেলেটি কেঁদে ফেললো। তখন বৃদ্ধ বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'না, না, তোমার কান্নায় কোন লাভ হবে না।'

অ্যাটর্নি বললেন, 'এখানে আর দাঁড়াবো না আমরা। দেরি করলে চলবে না।' তিনি অধ্যাপককে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

'না, আজ রাত্রে এতটুকু দেরি করা চলবে না। আপনি জানেন, এমনটি আর কখনো হয়নি। কিন্তু কেন? আমার তো মনে হয়, যীশু খৃষ্ট যখন তাঁর ভারী ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও মানুষ শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েনি। এদের দুজনের মৃত্যু হলে আমাদের কী হারাবো আমরা?'

'আমি জানি না।' অ্যাটর্নি দুঃখিত কণ্ঠে বললেন।

'আশা, তাই নয় কি?'

'জানি না। ভাঞ্জেত্তিকে জিজ্ঞেস করবো?'

'না, তা বড় নিষ্ঠুর হবে।'

'আমার মনে হয়, এতে নিষ্ঠুরতার কিছু নেই।'

চার্লসটাউনে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করলেন ওঁরা। সহজ কণ্ঠে অ্যাটর্নি অধ্যাপককে বললেন, 'আমাদের ডাইনে কখানা বাড়ির পরেই

উইনথ্‌রপ স্কোয়ার—অস্টিন্‌ স্ট্রীট, লরেন্স স্ট্রীট, রাদারফোর্ড এভিন্যু—কত নামের ছড়াছড়ি। ওয়ারেন্‌ থেকে হেন্‌লি। মাঝে মাঝে ভাবি এই সেই ওয়ারেন্‌ কিনা। আপনার মনে আছে ?

"ভাড়াটে হত্যাকারীকে তোমরা ভয় করো ?
যাবে কি পালিয়ে আতঙ্কে হয়ে জড়োসড়ো ?
ফিরে দেখো ওরা কাঁপছে আগুনে থরোথরো।"

ঠিক বলছি তো আমি ? তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলাম লেখাটা। আর ওই দিকে মনুমেণ্টটা—'

অধ্যাপকের মনের একটা অংশমাত্র ছিলো অ্যাটর্নির কথার দিকে। আকাশের ধূসর মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অস্তমুখী সূর্যের আলো। নৌকো ভাসছে জলের ওপরে। কত শব্দ, কত গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে। বাতাসে ভেসে আসছে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার গন্ধ, ট্রেনের শব্দ আর নৌকোর বাঁশী। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গেরা উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। সমস্ত সৌন্দর্য মিলে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যেখানে মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই। আর এই মুহূর্তে অধ্যাপক বাস্তবতা থেকে যেন অনেক দূরে চলে গেলেন। অ্যাটর্নির নীরস স্মৃতি রোমন্থনে আহত হয়ে তিনি ফিরে এলেন বাস্তবে।

অ্যাটর্নি মনুমেণ্ট সম্পর্কে বলছিলেন, 'একটু আগে আপনি পলকের জন্য দেখতে পেতেন ওটা, কিন্তু ঠিক জায়গামতো নয়। তাই নয় কি ? আমার চিরদিন ধারণা ছিলো, মনুমেণ্টটা রয়েছে বাঙ্কার পাহাড়ের ওপরে, অথচ যুদ্ধটা হয়েছিলো ব্রীড্‌স্‌ পাহাড়ে। সেখানেই তো গরীব কৃষক আর শ্রমিকেরা ট্রেঞ্চ কেটে আশ্রয় নিয়ে লড়াই করেছিলো ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত সেনাবাহিনীর সঙ্গে।'

'ভাঞ্জেত্তির মতো মানুষেরা ?' অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

'ওতে আমি বিচলিত হই না। সত্যিই না। অতীত এখন মৃত। আমি জানি না ওরা কেমন লোক ছিলো,—আমার ধারণা, কেউই জানে না সে কথা। একটা কথাই আমি জানি, ওরা একা সাকো আর ভাঞ্জেত্তির মতোই ছিলো না—'

'একা? নিশ্চয়ই ওরা একা নয়।' কয়েক ঘণ্টা পরে এই প্রথম হাসির রেখা ফুটলো অধ্যাপকের মুখে, 'না, ওরা নিঃসঙ্গ নয়।'

'আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি অন্য কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম। আপনি বলছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা, যারা ওদের জন্য কাঁদছে। আমি উপলব্ধি করেছি, চোখের জলে যদি সমুদ্রেরও সৃষ্টি হয়, তবু একটু পাথরও নড়বে না। আড়াই লক্ষ লোক সই করে এক আবেদন পাঠিয়েছিলো। কিন্তু কী ফল হয়েছে তাতে?'

'জানি না।' অধ্যাপক জবাব দিলেন।

'তা হলে দেখুন। অথচ ওখানে ওই বাঙ্কার পাহাড়ে বন্দুকের মুখে ওরা ওদের বক্তব্য বলেছিলো।'

'কিন্তু তবু নাথান্ হেলের ফাঁসির সময় ওরা কি কাঁদেনি?'

অ্যাটর্নি মনে মনে বললেন, "স্কুলের ছেলের মতো মনে হচ্ছে আমার। কেন যে অতীত নিয়ে এত ঘাঁটছি! এই তো এই ইহুদি,—হয়তো ওরা নির্যাতনের আভাস পাচ্ছে, হয়তো বাতাসে তার গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মনে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছেন ইনি। কিন্তু অতীত তো মৃত। অনেক খেটেছেন ইনি, আর আজ যে পৃথিবীতে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে, তা ওরা নিজেরা সৃষ্টি করেনি। আমরা এসেছি দর্শক হয়ে, আর কী করতে পারি আমরা?"

'ওই তো বন্দীশালা।' অধ্যাপক বললেন। সোনালী সন্ধ্যা, তবু তাঁর মন ভয়ে পরিপূর্ণ। আর জর্জ ইনীসের আঁকা উজ্জ্বল একখানি আলেখ্যের মতো এই সন্ধ্যার সৌন্দর্য তাঁর মনের ভয়কে বাড়িয়ে তুলছে। আকাশে আজ বজ্রবিদ্যুতের গর্জন থাকা উচিত ছিলো, অথচ ছলনাময়ী নায়িকার মতো পৃথিবী আজ অপরূপ সুন্দরী সেজে রয়েছে। ওঁরা বন্দীশালার ভয়ঙ্কর অষ্টভুজ প্রাচীরের কাছে এসে পড়লেন। আর অধ্যাপক এই প্রথম যেন উপলব্ধি করতে পারলেন জন ডনের সতর্কবাণীর গভীর অর্থ, "কার মৃত্যুঘণ্টা বাজে জানতে চেয়ো না, হয়তো সে তোমারই মৃত্যুঘণ্টা।" তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুরই কাছাকাছি যাচ্ছেন, কারণ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষ দুটির সঙ্গে সংযুক্ত তিনি, তাঁর আত্মা জড়িয়ে আছে ওদের আত্মার সঙ্গে, তাঁর স্মৃতি ওদের

স্মৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁর প্রয়োজন আর ওদের প্রয়োজন এক। কয়েক বছর বাদে তিনি ভুলে যাবেন এ রাত্রির কথা, ভুলে যাবেন আজকের মৃত্যুযন্ত্রণা, কারণ সময় অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারে। কিন্তু তবু যখনই সোনালী সূর্যালোক দেখবেন তিনি, যখনই মৃত্যুর শীতল ছায়া অনুভব করবেন, তখনই এই পূর্বস্মৃতি জেগে উঠবে তাঁর মনে।

ওয়ার্ডেন এখন কবর দেওয়ার ডিরেক্টরের মতো পেশাদারী গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। আর ঠিক তখন বন্দীশালার অভ্যন্তরে দিনের সুন্দর আলো মিলিয়ে গেলো। ওঁরা মাটির নিচের অন্ধকার গলিপথ বেয়ে মৃত্যুকুঠুরির দিকে এগিয়ে চললেন।

ওয়ার্ডেন বললেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন এমন দিনকে স্বাগত জানাই না আমরা। বন্দীশালার পক্ষেও এ দিনগুলো বড় বিশ্রী। আমি বলছি, যারা মরে তাদের সঙ্গে বন্দীশালার সব মানুষই একবার মৃত্যুর স্বাদ পায়। কথাটা যত আজগুবি শোনাচ্ছে তত আজগুবি নয়। বন্দীশালার সব মানুষের জীবন একই সূত্রে গ্রথিত।'

অধ্যাপক বললেন, 'এই চোখে দেখছো তুমি বন্দীশালাকে!'

'ওরা কেমন আছে?'

'ভালোই।' ওয়ার্ডেন বললেন, 'অবিশ্যি পরিস্থিতির তুলনায়। কিন্তু মৃত্যুর আগমুহূর্তে কী করে ভালো থাকে মানুষ? আমায় বিশ্বাস করুন, ওরা কিন্তু ভয়ানক সাহসী।'

ওয়ার্ডেনের মুখে এ কথা শুনে অধ্যাপক অবাক হলেন। তিনি অনিশ্চিত-ভাবে তাকালেন ওর দিকে। অ্যাটর্নি ইতিমধ্যেই আত্মরক্ষার জন্য যুক্তি স্থির করে ফেলেছেন। ধীর পায়ে চলতে চলতে তিনি এই মামলার স্মৃতি মন্থন করতে লাগলেন। যে কোন জটিল মামলার মতোই এই মামলাও প্রথমে তাঁর কাছে ছিলো একটা খেলার মতো, একটা ধাঁধা, একটা সমস্যা, একটা চ্যালেঞ্জ। আর শেষ পর্যন্ত এই মামলাই হলো তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এখন অবিশ্যি আবার সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সবকিছু বক্তব্যের, সব কর্তব্যের শেষে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মতো মানুষকে মরতেই হয়, এ কারণে, নয় ও কারণে। এক মহাশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো ওরা, ধর্ম-

বিশ্বাসকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো। সমস্ত অপরাধ হয়তো ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস এবং তাঁর প্রভুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান যারা, তাদের তো আর ভগবান মার্জনা করতে পারেন না। এ তো অবশ্যম্ভাবী। তবে কেন সমস্ত জগৎ প্রতিবাদ করছে এর ?

ওয়ার্ডেনের কথায় তাঁর চিন্তাস্রোত ব্যাহত হলো। ওয়ার্ডেন বললেন আজকের দিনে ম্যাসাচুসেট্স কমনওয়েলথের কাছ থেকে মৃত্যুকুঠুরিতে প্রবেশের অধিকার পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মুষ্টিমেয় কজন মাত্র এই অধিকার পেয়েছেন, কিন্তু শুধু এঁরা দুজনেই এসেছেন এখানে।

আইনের অধ্যাপক অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন, ওদের কাউকেই আমি আর দেখিনি। এই-ই প্রথম দেখতে পাচ্ছি।'

ওয়ার্ডেন যেন আত্মরক্ষার সুরে বললেন, 'আপনি দেখবেন, ওরা দুজনেই খুব সাধারণ মানুষ।'

'হ্যাঁ, সে কথা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু আমার কাছে ওরা রূপকথার মানুষের মতো।'

'তা আমি বুঝতে পারছি।' অ্যাটর্নি বললেন।

মৃত্যুশিবিরের কাছাকাছি আসতেই ওয়ার্ডেন বললেন, 'মৃত্যুশিবিরে তিনটি কুঠুরি। আপনারা জানেন, তিনটিতেই লোক রয়েছে এখন। আমাদের পক্ষে এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ওদের তিনজনেরই মৃত্যু হবে আজ, অবিশ্যি যদি দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত না থাকে। আপনার কি মনে হয় দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকবে ?' অ্যাটর্নিকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই আশাই করছি আমি।'

ওয়ার্ডেন বললেন, 'আমি ওদের আশা করতে বলেছি, কিন্তু খুব আশা আছে বলে মনে হয় না আমার। ঘটনা যখন এতদূর এগিয়ে গেছে, তখন সাধারণত আর এর শেষ না হয়ে যায় না। দেখুন, আমি আপনাদের সঙ্গে ওখানে যাবো না, ওখানে না গিয়ে পারলে আমি আর যাই না কখনো। মৃত্যুকুঠুরি তিনটি পাশাপাশি। তারপর একটা পথ চলে গেছে যে কক্ষটিতে, সেখানে রয়েছে বৈদ্যুতিক চেয়ার। এসব ব্যাপারের অবিশ্যি লিখিত কোন বিবরণ থাকবে না। সুতরাং অপ্রিয় কাজ যখন করতেই হবে, তখন তা

অন্তত একটা পদ্ধতি মাফিক করা যায়। যদি একজনের বেশি লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়, তবে যার মৃত্যু আগে হবে তাকে রাখা হয় বৈদ্যুতিক চেয়ারের কক্ষের পাশের কুঠুরিতে। স্থির হয়েছে, আজ যদি এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতেই হয়, তবে প্রথমে মৃত্যু হবে মাদীরোর, তারপরে সাক্কোর, আর সবার শেষে ভাঞ্জেত্তির। সেই অনুসারেই পর পর কুঠুরিতে রয়েছে ওরা। দয়া করে সাক্কো বা ভাঞ্জেত্তি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলবেন না আপনারা। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গেই কথা বলার অনুমতি পাওয়া গেছে, আর আপনারা যাতে তা মেনে চলেন তা আমার দেখা কর্তব্য।'

প্রথমে শুনতে শুনতে আইনের অধ্যাপক মনে মনে একটা শীতল ভীতি অনুভব করলেন, কারণ তাঁর মনে হলো এত শান্তভাবে এত শীতলভাবে এই সব ঘটনার কথা এমন ভাষায় কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাঁর মনে হলো, মানুষের প্রাণ নেওয়ার মতো কাজ এত নীচ, যে তা নিয়ে কথা বলা যায় না, তার উল্লেখ পর্যন্ত করা উচিত নয়, যেমন উচিত নয় মানব জীবনেরই গোপন কোন নোংরা ঘটনার কথা উল্লেখ করা। প্রথমে তাঁর মনে এই প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনে হলো, যদি এমন ঘটনা ঘটেই তবে তাকে বর্ণনা করার জন্য উপযুক্ত ভাষাও থাকবে। আর যারা এমন সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তারা এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্য ভাষা না পেয়ে সেই ভাষাতেই বর্ণনা দেবে। নিজের অবস্থার ভয়ঙ্করতাকে গোপন করার জন্য সাঙ্কেতিক ভাষা সৃষ্টি করেনি পৃথিবী। যা ভয়ঙ্কর, তা প্রকাশ্যেই ভয়ঙ্কর। আর সাধারণ কথ্য ভাষায় সহজেই তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। শুধু ভাষাই নয়, মানুষও এ সব ঘটনার উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে, যেমন আজ তিনি আর তাঁর সহকর্মী সহগামী সম্মানিত ব্যক্তি হয়েও এই গ্রানাইট পাথরের দেয়াল আর লোহার ফটকে ঘেরা এই পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের, যে ঘরের দিকে যাচ্ছেন দুজনে তার সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে, সে উদ্দেশ্য আইনানুগভাবে মানুষের প্রাণ নেওয়া। আর তার জন্য এই খৃষ্টীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা ধাতু এবং কাঠ দিয়ে তৈরি এমন একখানা চেয়ার উদ্ভাবন করেছে, যাতে একজন মানুষকে বসিয়ে বেঁধে রেখে তার দেহের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে

দেওয়া যায়। তবু তিনি বা তাঁর সহগামী ভয়ে দুঃখে চিৎকার করে উঠলেন না। তাঁরা শান্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের মতোই আচরণ করলেন। তাঁর বন্ধু বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওয়ার্ডেন। আপনার নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।'

ওয়ার্ডেন চলে গেলেন। বন্দীশালার রক্ষী ওদের নিয়ে এলো মৃত্যুশিবিরে। কুঠুরি তিনটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আইনের অধ্যাপক কৌতূহলী হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন। কারণ মানুষ যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, যেমন খেতে হয় তাকে, ঠিক তেমনি মানুষের কৌতূহল থাকাও স্বাভাবিক। প্রথমে তিনি দেখলেন, মাদীরো তার কুঠুরির মাঝখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক ঘণ্টা বাদে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে একটি চোর, এক খুনে। তারপর সাক্কোর কুঠুরি। সাক্কো তার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার চোখ দুটি ছাদের দিকে নিবদ্ধ। সবার শেষে ভাঞ্জেত্তির কুঠুরি। সে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। ভাঞ্জেত্তি তার কুঠুরির দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে হৃদ্যতার সঙ্গে ওদের অভ্যর্থনা করলো। অধ্যাপকের মনে হলো ওর শান্তভাব আজকের এই ভয়ানক দিনের সব কিছুর চেয়ে ভয়ঙ্কর।

কুঠুরির দরজা থেকে একটু দূরে দুটো কাঠের চেয়ার দেখিয়ে রক্ষী বললো, 'আপনারা দয়া করে বসুন।' ওঁরা বসলেন। অধ্যাপক বুঝতে পারলেন, মাথাটা একটু ঘোরালেই হত্যাকুঠুরি এবং সেই চেয়ারটার একটা অংশ তাঁর চোখে পড়বে। যতই তিনি চেষ্টা করলেন সেদিকে না তাকাতে, ততই যেন তাঁর চোখ দুটো ওদিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত ফিরে তাকাতেই হলো। বৈদ্যুতিক চেয়ারে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইলো এবং এত আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন তিনি যে ওদের কথাবার্তা কিছুই তাঁর কানে গেলো না। পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টা করেও প্রথম দিনের আলোচনা বিস্তৃতভাবে স্মরণ করতে পারেননি তিনি। শুধু মনে পড়েছিলো, ওরা বলছিলো, সব অ্যাটর্নিদের এখন নীরবতা ভঙ্গ করা প্রয়োজন, যাতে পরে কেউ বলতে না পারেন যে সাক্কো-ভাঞ্জেত্তির মামলা সম্পর্কে তিনি কোন কথা গোপন করে রেখেছেন। সব কিছুই এখন সব লোকের

জানা দরকার। এই সাধারণ কথাটাই শুধু মনে পড়েছিলো তাঁর। বৈদ্যুতিক চেয়ারটা সম্পর্কে বিস্ময়ে এবং অসংখ্য প্রশ্নে প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দেহের একটি প্রধান শিরা কেটে দেওয়া কিংবা সক্রেটিসের মতো বিষ পান করা যখন এত সহজ তখন মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কেন দিনের পর দিন নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করবে মৃত্যু ঘটানোর জন্য? কেন উদ্ভাবন করবে গিলেটিন, স্বয়ংক্রিয় ফাঁসিকাঠ, গ্যাস-প্রকোষ্ঠ কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ার?

ভাঞ্জেত্তি বলছিলো, 'আমার সমস্ত জীবনেও এমন কোন অপরাধ আমি করেছি বলে আমার মনে পড়ছে না, যার জন্য লজ্জিত হতে হয়, কিংবা এমন কাজ, যা অন্যায়। আমি যে অন্য কারো চেয়ে ভালো মানুষ তা নয়, আমি সাধারণ মানুষ, আর সাধারণ মানুষ সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। সুতরাং আমার নিরপরাধিতা নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই। আমি নিরপরাধ।'

এখন অ্যাটর্নির সব কথা মনে পড়লো অধ্যাপকের। তিনি ভাবলেন, যদিও তিনি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির নিরাপরাধিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, তবু এই শেষ মুহূর্তে তেমনি একটা বিবৃতি তাঁর পাওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনি এই দুটি মানুষের হত্যাকারীদের সব অভিযোগ খণ্ডন করতে পারেন।

"কী ভয়ঙ্কর প্রশ্ন!" অধ্যাপক ভাবলেন। তবু ভাঞ্জেত্তি এমন শান্ত এমন বিনয়ীর মতো এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে যে মনে হয় এই দার্শনিক আলোচনা করছে এমন একটি লোক, যার সামনে এখনো জীবনের অনেকগুলো বছর পড়ে রয়েছে।

দুঃখাহত ঔৎসুক্যের সঙ্গে অধ্যাপক দেখতে লাগলেন ভাঞ্জেত্তিকে। তার অপূর্ব ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক উচ্চ কেশবিরল ললাট, তার সূক্ষ্ম ভুরু, তার গভীর দুটি চোখ, দীর্ঘ উন্নত নাক, তার মোটা ঝুলন্ত গোঁফ আর তার ঠিক নিচেই বিস্তৃত সংবেদনশীল মুখ আর সুন্দরাকৃতি চিবুক। অধ্যাপক ভাবলেন, "কী সুন্দর মানুষটি! ওর হাবভাবে চেহারায় কী মহিম ভাব! সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষটি, গৌরবময়তা ছড়িয়ে আছে ওর সমস্ত অস্তিত্বে। কী

দিয়ে গড়া এ মানুষ ? কোথা থেকে এসেছে ও, এত বড় আত্মগৌরব নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ?”

যেন তাঁর প্রশ্নেরই জবাব দিতে ভাঞ্জেত্তি তাঁকে সম্বোধন করে বললো, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে সে খুব আনন্দিত হয়েছে। তিনি এই মামলার জন্য যা করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালো সে।

'আমি যা করেছি, সে তো কিছুই নয়।'

'কিছু নয় না, অনেক। যখন আমি ভাবি আপনাদের মতো মানুষেরা এসে সাক্কোর আর আমার পিছনে দাঁড়িয়েছেন, তখন আমার অন্তর কান্নায় কানায় ভরে ওঠে। আমায় বিশ্বাস করুন।'

অ্যাটর্নির দিকে ফিরে আবার সে বললো, 'আমায় বিশ্বাস করুন। আমার জন্য আপনারা যা করেছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা যদি প্রকাশ করতে পারতাম আমি ! সম্পূর্ণভাবে তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনারা আমাদের আশা রাখতে বলবেন, কিন্তু আমি ভালো করেই জানি। সাক্কোও জানে ভালো করে। আজ রাত্রে আমাদের মৃত্যু হবে। মরতে আমার ভয় করে, কিন্তু তবু আমি মরতে প্রস্তুত। একবার নয়, সাক্কো আর আমি ইতিমধ্যেই হাজার বার মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছি। সুতরাং আমরা প্রস্তুত। আমরা মরছি মানব জাতির জন্য, অন্য মানুষের ওপরে নির্যাতনের অবসান করার জন্য। আমার অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ, কারণ আমার বোন, আমার পরিবারের লোক বা অন্য যাদের ভালবাসি আমি, তাদের আর দেখতে পাবো না। কিন্তু শুধু দুঃখই নয়। জয়গৌরবও আছে আমার মনে, কারণ মানুষ স্মরণ করে রাখবে আমাদের নির্যাতনকে এবং তারা সুন্দরতর পৃথিবীর জন্য আরো কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।'

অ্যাটর্নি বললেন, 'তোমার বিশ্বাসে যদি বিশ্বাস করতে পারতাম, বার্তোলোমিও !'

'আপনি কেন বিশ্বাস করবেন ? কি করে বিশ্বাস করবেন ? এই যে দেখছেন আমাকে, ভাঞ্জেত্তিকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান, এ মানুষটির শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু কিসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিলো এই মানুষটি ? আমি এখন নিজেকে মনে করি শ্রেণীসচেতন মানুষ বলে। কিন্তু এই

সচেতনতা নিয়ে তো জন্মাইনি আমি। জন্মেছিলাম আপনাদের মতোই, তারপর যখন বড় হয়ে উঠলাম, তখনো বিশেষ কিছু শিখলাম না। যতদিন পর্যন্ত আমেরিকায় আছি আমি, তিনজনের সমান কাজ করেছি, কিন্তু তার প্রতিদানে কিছুই পাইনি। কিন্তু একটু একটু করে আমার সহকর্মীদের প্রতি এক গভীর ভালবাসা জন্মেছে আমার অন্তরে। তখন আমি আর শুধু ইতালীয়ই রইলাম না। মনে হলো এরা সবাই আমারই জাতের লোক। তারপর কনেক্টিকাটে ইঁটের কারখানায় কাজ করলাম, তারপরে মেরিডনে পাথরের খাদে। সেখানে দু বছর কাজ করতে করতে চমৎকার টাস্কানির ভাষা শিখলাম, ওখানে টাস্কানরা কাজ করতো। কিন্তু যে ভাষায়ই কথা বলি না কেন আমরা, মালিক আমাদের সবাইকেই ঘৃণা করতো, বলতো, "কাজ করো, হতভাগা জানোয়ারের দল।" আমার পাশেই একজন আমেরিকান কাজ করতো। সে একদিন বললো, "হেই বার্তো! দুনিয়ায় ভাষা আছে দুটো, একটা মালিকদের জন্য, আর একটা তোমার আমার জন্য।" সে একটু হাসলো আমার দিকে চেয়ে, আর আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি ওকে ভালবাসলাম। এমনি করে শিখতে পেরেছি, শ্রেণীসচেতনতা শুধু প্রচারকদের একটা মুখের কথাই নয়, এ একটা প্রচণ্ড শক্তি। এই সচেতনতা এলো আমার মনে, আমার পশুত্ব ঘুচে গেলো। আর শ্রমের পশু রইলাম না, আমি মানুষ হয়ে উঠলাম। সেই আমেরিকানটি বলতো, "বার্তো, তোমার হাত দুখানা দেখো। ওই হাত দিয়ে দুনিয়ার সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার ফল ভোগ করছে অন্য লোক। বন্দুকটি পর্যন্ত তুমি বানাচ্ছো তোমারই ভাইকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তোমার হাতের তৈরি রুটি যে কেড়ে নিচ্ছে, সে তো কোন কাজই করে না, কোন কাজ নয়। তোমার হাত দুখানার দিকে তাকিয়ে দেখো, বার্তো। কী অসীম শক্তি রয়েছে ওই হাতে!" একবারেই ওর সব কথা বুঝলাম না, কিন্তু একটু একটু করে বুঝতে আরম্ভ করলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি, মানুষেরা একদিন পরস্পর ভাইয়ের মতো দিন যাপন করবে। আর এই জন্যই ওরা আমাকে হত্যা করছে। কিন্তু এই জন্য শুধু আমি একাই তো মরছি না। আপনারা তো এই পরিস্থিতির বাইরে আছেন, বন্ধু। সুতরাং আমার বিশ্বাসে আপনার

বিশ্বাস কেন আসবে? আমি তো শ্রমিক,—চিরদিন।'

'আমি তোমাদের বিরোধী নই, বার্তোলোমিউ।' অ্যাটর্নি বললেন, 'এ কথা তোমার বোঝা দরকার, আমি তোমাদের বিরোধী নই। কিন্তু শুধু তিক্ততা আর ঘৃণার সৃষ্টি করে এ সমস্যার কোন সমাধান দেখতে পাই না আমি।'

ভাঞ্জেত্তি বললো, 'আপনি আমার মনে তিক্ততা না রাখতে বলছেন। কিন্তু যে শক্র আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে টেনে নিয়ে এসেছে, তার প্রতি ভালবাসায় কি আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে?'

'এর পরে আসতে পারে শুধু ঘৃণা আর হিংস্রতা, আর মৃত্যুর তাণ্ডব। তুমি কি তাই চাও, বার্তোলোমিউ?'

'কোনদিন কি তা চেয়েছি?' ভাঞ্জেত্তি প্রশ্ন করলো, মুখে তার মৃদু হাসি, 'আমাদের আদালতে আনা হলো। বিচারক বললেন, আমরা হিংস্র মানুষ। জিলা অ্যাটর্নি জুরিদের বললেন, আমরা ভয়ঙ্কর লোক, খারাপ, হিংস্র। কিন্তু সাক্কো বা আমি কি কোন হিংসার কাজ করেছি? কোনদিন কাউকে আঘাত করেছি আমরা? আমাদেরই মতো শ্রমিক ভাইদের কাছে গিয়ে আমরা বলেছি, "গোটা রুটিটাই যখন তোমার তৈরি, তখন শুধু তার শক্ত অংশটা খাওয়া তোমার অন্যায়।" এ কি হিংসার কাজ? না। আসলে হিংস্র ব্যবহার করা হয়েছে আমার প্রতি। সাত বছর ধরে বন্দীশালায় আটকে রেখে নির্যাতন করেছে ওরা, কয়েদীর মতো ব্যবহার করেছে,—সাত বছর নরকে কাটিয়েছি আমি। এ কি হিংস্রতা নয়? শান্ত সাক্কো এবং আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর হিংস্র ব্যবহার আপনারা করেছেন কোনদিন কোন মানুষের প্রতি তা করা হয়নি। বেছে বেছে আমাদের দুজনকে ধরে এনে বলা হলো, আমরা ভয়ানক সব অপরাধ করেছি এমন এক জায়গায়, যেখানে কোনদিন যাইনি আমরা, যে জায়গা চোখেও দেখিনি কোনদিন, তারপর আমাদের সেই মিথ্যা অভিযোগে বিচার করা হলো, আর বছরের পর বছর ধরে আমাদের এক ছোট্ট কুঠুরিতে আটকে রাখা হলো। এই না হিংস্রতা! অন্য সব মানুষ একবারই মরবে, কিন্তু সাক্কো আর আমাকে হাজারবার মরতে হয়েছে, তবু ওরা সন্তুষ্ট নয়।

দিনের পর দিন আমাদের বার বার মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করাতে চায় ওরা। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বন্ধু বলে, সৎমানুষ বলে। কিন্তু আপনি কি করে এখানে এসে আমাকে হিংসা করতে বারণ করছেন? আমি কখনো হিংসার আশ্রয় নিইনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সময় কি গেছে কখনো যখন সৌভ্রাতৃত্ব এবং উন্নততর জীবনযাত্রার সপক্ষে কেউ দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ আনা হয়নি? যীশু খৃষ্টের বেলাও এমনি হয়েছিলো। অবিশ্যি সাক্কোকে আর আমাকে আমি যীশু খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করছি না, আমি ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নই। কিন্তু আপনারা যারা যীশু খৃষ্টের নাম নেন, খৃষ্টান বলে পরিচয় দেন নিজেদের, তাঁরা তো ক্রুশবিদ্ধ করা বন্ধ করলেন না!'

কথা বলতে গিয়ে এবারে অ্যাটর্নির গলা কেঁপে গেলো। নিচু গলায় তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কি আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছো, বার্তোলোমিউ? এ কাজ কি আমি করেছি? তোমাদের নিরপরাধিতা প্রমাণ করে তোমাদের মুক্তি আদায় করার চেষ্টা করতে আমি কি এতটুকুও ত্রুটি করেছি?'

'না, আমি আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছি না। আমার বন্ধু আর কমরেডদের বিরুদ্ধে কোনদিনই যাবো না আমি, এ কথা আপনি জেনে রাখুন। কিন্তু আমাদের হিংস্রতা সম্পর্কে এই কুৎসা কেন ধাওয়া করে এসেছে এই মৃত্যুকুঠুরি পর্যন্ত? আপনি কি মনে করেন, মৃত্যু কামনা করি আমি? তবে শুনুন। এখানে এক শ্রমিক পত্রিকার রিপোর্টার এসেছিলেন। ভালো মানুষ। তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম আমি। তাঁকে আমি বলেছিলাম একটা রিভলবার নিয়ে ফিরে আসতে, যাতে ভেড়ার মতো, গরুর মতো আমাকে জবাই করতে নিয়ে যেতে না পারে ওরা, যাতে আমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা নিয়ে লড়াই করে মরতে পারি আমি। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি, হয়তো ইচ্ছে করেই আসেননি। শুধু এইটুকু হিংস্রতার কথা চিন্তা করেছিলাম আমি। কিন্তু সৎ আর মহৎ নাগরিকের দল সব সময়েই চিৎকার করে বলেছে, "ওরা হিংস্র হয়ে উঠেছিলো আমাদের প্রতি, ওদের মরতেই হবে।" যীশু খৃষ্ট হিংসা ছড়াচ্ছিলেন, তাই তাঁকে মরতে হয়েছে। গ্যালিলিও হিংস্র ছিলেন, তাঁকে মরতে হয়েছে। ওরা বলে

গিয়োর্দানো ব্রুনো আর লেনিনও নাকি হিংসা ছড়িয়েছেন। যা ন্যায্য, যা আইনসঙ্গত তাকে ভাঙতে চেয়েছেন ওঁরা। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কোন্‌টা ন্যায্য, কোন্‌টা আইনসঙ্গত ? সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে হত্যা করছে ওরা, এ কি ন্যায্য, এ কি আইনসঙ্গত ?'

'কোনদিন কি আমি তা বলেছি, বার্তোলোমিউ ? ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে শেষ কথা এখনো কেউ বলতে পারেনি ; আমি সর্বশক্তিমান ভগবানে বিশ্বাসী। তিনি সব কিছুকেই নিজের মতো করে বিচার করে দেখেন। ম্যাসাচুসেট্‌সের গবর্নরের পরে আর কারো কাছে আপীল করার নেই, এ কথা কোনদিন আমি বিশ্বাস করি না।'

ভাঞ্জেত্তির কণ্ঠ এখন নেমে এলো, সে কণ্ঠ যেন প্রায় নীরব, যেন নিঃসঙ্গতায় পরিপূর্ণ। 'আপনি তা বিশ্বাস করেন ? আমার সে বিশ্বাস নেই। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, এত সৎ মানুষ কেন আপনাদের ভগবানে, তাঁর বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না ? আর যারা বিশ্বাস করেও, তারাও তো মৃত্যুকে অন্য সবার মতোই ভয় করে।'

অ্যাটর্নি বললেন, 'কিন্তু তবু আমার স্থির দৃঢ় বিশ্বাস, এই জীবনের পরেও আর এক জীবন আছে আমাদের।'

আইনের অধ্যাপক তাঁর সহগামীর দিকে তাকালেন। অ্যাটর্নির কণ্ঠস্বরে, ভাঞ্জেত্তির প্রতি তাঁর উন্মীলিত দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ছায়াও নেই। অ্যাটর্নি ন্যায়পরায়ণ মানুষ, তাঁর চেহারায় ধৈর্য এবং গর্বের সুস্পষ্ট ছাপ। এই মামলার চূড়ান্ত অধ্যায়ে তিনি কঠোর লড়াই করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর স্থৈর্য এতটুকুও নষ্ট হয়নি। নিজের ওপরে, বন্ধুদের ওপরে, তাঁর জাতি, তাঁর শ্রেণী, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন, তাঁর জমানো পুঁজি, সব কিছুর ওপরে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস তাঁর এতটুকু নড়েনি। এখন তিনি অনন্ত জীবনে তাঁর বিশ্বাসের কথা বললেন। আইনের অধ্যাপক একদিক থেকে ওঁকে আজ ঈর্ষা করতে লাগলেন, কারণ তাঁর নিজের আর এমন কোন বিশ্বাস ছিলো না যার ভিত্তি আজ নড়ে ওঠেনি। নিজেকে তিনি ওঁর মতো আত্মগৌরব এবং নিরাপত্তাবোধ দিয়ে দৃঢ় করে রাখতে পারছিলেন না। অ্যাটর্নির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যখন বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির

দিকে তাকালেন, তখন দেখলেন দুজনের কারো বিশ্বাসের দৃঢ়তাই কম নয়। কথার শেষে এসেও ভাঞ্জেত্তির কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়নি, কাঁপেনি এতটুকু। তার স্থিরতা তখনো অক্ষুণ্ণ, তার ভাস্করের হাতে তৈরি মূর্তির মতো মুখে এক অবর্ণনীয় শান্তি বিরাজ করছে। এই সাক্ষাৎকারের সমস্ত সময় ধরে এই শান্তি অধ্যাপকের স্মৃতিকে মথিত করে তুলেছে, দূর অতীতের প্রায়বিস্মৃত কী যেন জাগিয়ে তুলেছে তাঁর মনে। এই আশ্চর্য শান্তি প্রায় গিয়ে নাড়া দিয়েছে অধ্যাপকের চেতনায়, সব কথা প্রায় ঠোঁটের কাছে এসেছে এক-একবার, তারপর আবার বার বার তাঁর স্মৃতি তলিয়ে গেছে, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আইনের অধ্যাপকের তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিলো কিছু বলতে, অ্যাটর্নি যা বলেছেন, তার থেকে আলাদা কিছু কথা। বাইরের জগতের সঙ্গে মৃত্যু-প্রত্যাশী মানুষ দুটির এই যে শেষ যোগাযোগ নয়, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তাই যে আলাপ-আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে, তাতেই শেষ হয়ে যাবে এই সাক্ষাৎকার, এ কথা কল্পনা করেও তাঁর মনে একটা গভীর হতাশাবোধ জাগছিলো। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণতা তাঁর অজানা নয়। এও তিনি বুঝছিলেন, এই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর মনে কোন মহান বক্তব্য উপস্থিত হতে পারে না। কিন্তু তবু তিনি ভাবতে লাগলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে, যাতে যে কথা মনে পড়তে পড়তে হারিয়ে যাচ্ছে তাকে স্মরণ করতে পারেন, যাতে এমন ভাষা তিনি খুঁজে পান, যা দিয়ে তিনি ওদের প্রাণকে সঞ্জীবিত করতে পারেন, ওদের আশ্বস্ত করতে পারেন অমরত্ব সম্পর্কে, যে অমরত্বে ভাঞ্জেত্তি বিশ্বাস করে বলে তাঁর প্রত্যয়।

ভাঞ্জেত্তি তখনো হিংসার কথাই ভাবছে। সে বলছিলো, 'ভাবতেও অবাক হচ্ছি আমি, আপনারা এসে আমাকে হিংসা সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। আমি এই ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছি, আর আপনারা এসেছেন আমাকে অহিংসা শেখাতে। শূন্যের মধ্য থেকে হিংস্রতা সৃষ্টি করার মতো অলৌকিক ক্ষমতা কি আছে আমার? সে ক্ষমতা আমার নেই। হিংসা আসে তখনই যখন মানুষের পিঠে অসহনীয় বোঝা

চাপিয়ে দেওয়া হয়। কেমন পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন আপনারা? সে কি অহিংস পৃথিবী? যে যুদ্ধে দু কোটি লোক নিহত হয়েছে, সেই যুদ্ধে যোগ দিতে চাই না বলে বিচারের সময় জিলা অ্যাটর্নি সাক্কোকে আর আমাকে শাপান্ত করেছেন। তবু হিংসার অভিযোগ এসেছে আমাদেরই বিরুদ্ধে। এ কোন্ পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন আপনারা, যেখানে কজন মুষ্টিমেয় মানুষ অগণিত মানুষের শ্রম আর দুর্দশার বিনিময়ে বেঁচে আছে? আপনাদের এই পৃথিবীই তো হিংসার প্রতিমূর্তি। আপনারা আমার বন্ধু। আমায় বিশ্বাস করুন, আপনারা আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনাদের আমি ভালবাসি,শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এ কথাও জানি আমি, যে এই জগৎ আপনাদের জগৎ, সাক্কোর আর আমার জগৎ নয়। একদিন এর পরিবর্তন হবে। কিন্তু জানি না, পৃথিবী অহিংস হবে কিনা। একবার নয়, বার বার আপনারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছেন। যতবার তিনি পৃথিবীতে এসেছেন ততবার। আমার সব কথা সাক্কো শোনে। সে সাধারণ মানুষ, ভালো ইংরেজী বলতেও পারে না। কিন্তু পবিত্রতায় সততায় সে স্বয়ং যীশু খৃষ্টেরই মতো, আর কিছুক্ষণ বাদেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে—'

আইনের অধ্যাপক আর শুনতে পারছিলেন না, আর সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। সব কথা তাঁর কানে যাচ্ছিলো, কিন্তু চেষ্টা করে এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি, যে কোন কথাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছিলো না। যে স্মৃতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তার মধ্যেই তন্ময় হয়ে গেছেন তিনি। তারপর এক সময়ে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি, দেখলেন সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হয়ে গেছে। তিনি ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে করমর্দন করলেন, আর দেখে আশ্চর্য হলেন ওর হাত উত্তপ্ত, ওর মুষ্টি দৃঢ়। ওর পাশটিতে দাঁড়িয়ে ওর পিঙ্গল চোখের দিকে তাকালেন তিনি।

'বিদায় বন্ধু, আপনাকে ধন্যবাদ।' ভাঞ্জেত্তি বললো। কিন্তু কথা বলবার শক্তি নেই অধ্যাপকের। বন্দীশালার দেয়াল পেরিয়ে এসে অ্যাটর্নি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি সারাটা সময় নীরব ছিলেন। শুনে অবাক হলেন অধ্যাপক, কিন্তু যে স্মৃতিকে খুঁজছিলেন, তাকে এতক্ষণে উদ্ধার

করেছেন তিনি এত সময় বাদে তিনি বললেন, 'এ কথা যখন শুনলাম আমরা, তখন লজ্জায় চোখের জল গোপন করেছিলাম।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।' অ্যাটর্নি বললেন। সাক্ষাৎ-কারের ফলে পরিশ্রান্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

'পারছেন না ? আমায় মাপ করুন। আমি একটা কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলাম, এখন মনে পড়েছে।'

'কথাটা যেন জানা-জানা লাগছে।' অ্যাটর্নি যন্ত্রের মতো বললেন।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে আপনার ? "এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অনেকেই অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করতে পেরেছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম তিনি পান করছেন, তাঁর পান করা শেষ হয়েছে, তখন আর আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। আমার সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দু চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো। দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলাম আমি। ওঁর জন্যে তো কাঁদিনি, কেঁদেছি ওঁর মতো বন্ধু হারানোর দুর্ভাগ্যের জন্য।"'

অ্যাটর্নি তাঁর ভারাক্রান্ত মাথাটা দোলালেন। ওঁরা দুজন বাইরের অস্পষ্ট আলোয় দাঁড়িয়ে রইলেন গাড়ির অপেক্ষায়। ওয়ার্ডেন বলেছেন, নদী পার করে ওঁদের শহরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করবেন। আইনের অধ্যাপকের কথাগুলো অ্যাটর্নির স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করতে লাগলো। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সক্রেটিস্ তখন কি বলেছিলেন মনে আছে আপনার ?'

'"আমি শুনেছি মঙ্গলের জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। সুতরাং কান্না থামাও, আত্মসংবরণ করো।"'

অ্যাটর্নি দেখলেন, অধ্যাপকের দু গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে, এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা বিরাটকায়, কুৎসিত, আহত পশুর মতো। অ্যাটর্নি আত্মসংবরণ করলেন। আর কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি, কোন কথা বললেন না আর।

পনেরো

ভাঞ্জেত্তি তার কুঠুরির দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো চিন্তায় মগ্ন হয়ে। একটু আগে বলা কথাগুলো নীরব প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো তার অন্তরে। অন্য দুজন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে যার যার বিছানায় বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টি মেলে, ভাবছে অতি নিকট ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর রহস্যের কথা।

কুঠুরির দরজার ফাঁকে আঙুলগুলো বাঁকিয়ে ভাঞ্জেত্তি তার হাত দুখানা তুলে ধরলো। তাকিয়ে দেখলো হাত দুখানির দিকে। তার মনে জাগলো সেই চিরন্তন প্রশ্ন—কেমন হবে তখন, যখন তার সমস্ত দেহ, তার অস্তিত্ব, তার চেতনা সব শেষ হয়ে যাবে, কোন স্মৃতি থাকবে না আর? ঠাণ্ডা প্রচণ্ড বাতাসের মতো ভয়ের ঝড় বইলো তার মনের ওপর দিয়ে। বৃথাই সে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো। এখন আর দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখতে বা বিলম্ব করাতে চায় না সে। তার হতাশা এত গভীর হয়ে উঠেছে যে যদি ইচ্ছামৃত্যু লাভ করার ক্ষমতা থাকতো তার, তবে নিজের জীবনের ওপরে নিজেই যবনিকা টেনে দিতো সে। কিন্তু নিজের সম্পর্কে এমনি কথা ভাবতে গিয়ে তার সাক্কোকে মনে পড়লো। সাক্কোও তো তারই মতো যন্ত্রণা বোধ করছে। সাক্কোর প্রতি করুণায় তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। সে তাকে ডাকলো. 'নিকোলা, আমার কথা শুনছো, নিকোলা?'

বিস্ফারিত চোখে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলো সাক্কো। দুঃখের সমুদ্রের নৌকোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো তার মন। সব যেন উলটে যাচ্ছে, যদি সে ভাবে হাস্যমুখর আনন্দের কথা, তার মন ভরে ওঠে অশ্রুসিক্ত দুঃখ-ময়তায়। হয়তো একটা বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু যে মুহূর্তে ঘটনাটি স্মরণে এলো, তখনই আবার সে স্মৃতিকে তাড়িয়ে দিতে চাইলো সে-ই। তার মনে পড়লো স্ত্রী রোজাকে নিয়ে অভিনয় করার দিনগুলো। সুন্দরী রোজা, করুণাময়ী রোজা, মনীষার অধিকারিণী রোজা। সাক্কোর সব সময় মনে হতো, রোজা উঁচুদরের অভিনেত্রী হতে পারতো। আশ্চর্য মেয়ে রোজা। কেন যে সে সাক্কোকে বিয়ে করলো, সে রহস্য আজও

ভেদ করতে পারেনি সাঙ্কো। সাঙ্কোর দৃঢ় ধারণা, অন্য কেউও বুঝতে পারেনি এ রহস্য। সবাই বলতো,"সুন্দরী রোজা বিয়ে করলো নিক্ সাঙ্কোকে। ভেবে দেখো তো। কী যে দেখলো মেয়েটা ওর মধ্যে!" এর জবাবে আবার কেউ হয়তো বলতো, "সাধারণ মেয়েরা বিয়ে করে সুন্দর ছেলেদের আর সাধারণতম ছেলেরা বিয়ে করে সবার সেরা সুন্দরীদের। এর কখনো ব্যত্যয় হতে দেখেছো? এমনটি হতেই হবে, এমনি করেই জীবনের ভারসাম্য বজায় থাকে। এ যদি না হতো, প্রকৃতি যদি এ ব্যবস্থা না করতো, তবে তো পৃথিবীতে থাকতো শুধু খুব সুন্দর আর খুব কুৎসিতের দল।"

যাই হোক, মেয়েটি তো ওকে বিয়ে করেছে। প্রতি রাত্রে সাঙ্কো এ রহস্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতো, আর তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠতো।

"এই আমার রোজা। ও আমায় বিয়ে করেছে, এ তো সহজ কথা, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।" মনে মনে বললো সাঙ্কো। কথাটা বার বার আউড়ে গেলো সে, আর এ যেন তার ভেঙেপড়া হৃদয়ে ধারালো ছুরির মতো বিঁধতে লাগলো। এ বেদনা অনেক কষ্টে মন থেকে মুছে ফেললো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো তার মানসনেত্রে। সে আর রোজা একবার সাধারণভাবে "ডিভাইন কমেডি" সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলো। তাদের নিজেদের মতো করেই করেছিলো ব্যাপারটা, তবু তা হয়েছিলো চমৎকার। যখন রোজা বলতো:

"উত্তপ্ত সূর্যের তাপে আইকেরাস্ যবে
দগ্ধপ্রায় পালকের স্পর্শ অনুভবে,
পিতার আহ্বান তার পশিল শ্রবণে,
হা পুত্র! উড়েছো এত সু-উচ্চ গগনে!"

সাঙ্কো তখন বলতো:

"বুঝিলাম অনুভবে মহাব্যোম হতে
ঘূর্ণিয়া পড়িতেছিনু বায়ুস্তর স্রোতে,
আলো নাই, দৃষ্টি নাই, নাই অন্য কিছু,
পশ্চাতে ধাইছে এক ভয়ঙ্কর পশু।"

আবার সাকো এই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা বিদূরিত করলো মন থেকে। ভেবে অবাক হলো, কেন এই মধুর কাব্যের ওই কটি পংক্তিই তার মন বেছে নিলো। ভাবতে ভাবতে আর সে সইতে পারলো না। উপুড় হয়ে শুয়ে অশ্রুসিক্ত হাত দুখানির মধ্যে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, "রোজা রোজা রোজা!" তারপর শোক আর ভয়ের যন্ত্রণা এক সময়ে কাটিয়ে উঠলো। আবার তার স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবারে মনে পড়তে লাগলো ধর্মঘটের কথা, পিকেট লাইনের কথা। মনে পড়তে লাগলো, কোথায় সে বলেছিলো ইউনিয়ন বা একতা ছাড়াও কয়েকজন মানুষ কত কি করতে পারে। সব স্মৃতিকে আলাদা করে ফেলবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু এত বেশি ধর্মঘট, এত পিকেট লাইন ভিড় করে এলো তার স্মৃতিতে,—হোপডেলের কারখানার শ্রমিকরা, মিল্‌ফোর্ডের জুতোর কারিগররা, লরেন্সের কাপড়ের কলের মজুররা, কাগজকলের পাংশুটে মুখ স্ত্রীপুরুষের দল। সে দেখতে পেলো এই সব ছোট মিটিংয়ের শেষের ঘটনা। সেখানে তার টুপিটা খুলে সে ছেড়ে দিতো শ্রোতাদের হাতে ঘুরে আসার জন্য। তারই মধ্যে পয়সা সংগৃহীত হয়ে আসতো। হাতের পাতার মধ্যে দুমড়ে একটা পাঁচ ডলারের নোট রাখতো সে টুপিটার মধ্যে যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেটা কত ডলারের নোট, আর যাতে ওরা লজ্জা না পায়, দুঃখ না পায় অতি অল্প পয়সা দিতে হচ্ছে বলে।

তখন দক্ষ কারিগর হিসাবে বাঁধা সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করে সে দিনে ষোল থেকে বাইশ ডলার উপার্জন করতো। তাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা অতিরিক্ত। রোজাও বলতো, "ওদের সাহায্য করো, যত পারো সাহায্য করো। ওরা তোমার বন্ধু, তোমার কমরেড।" দিনে বাইশ ডলার পেয়েও যুদ্ধ লাগার পরই সে চাকরি ছেড়ে ছিলো। একদিন সারাটি রাত সে এ নিয়ে আলোচনা করলো রোজার সঙ্গে। মনের কথাও বললো তাকে। বললো, জার্মানই হোক, হাঙ্গেরীয়ই হোক, অস্ট্রীয় বা অন্য যে কোন জাতেরই হোক না কেন, তারই মতো কোন শ্রমিককে গুলি করার আগে সে নিজে প্রাণ দেবে, আত্মহত্যা করবে।

রোজা ওর কথা বুঝেছিলো। ওদের দাম্পত্যজীবনের প্রথম থেকেই

ওরা পরস্পরের সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতো। ওর বন্ধুরা অনেক বলতো, "ও, সাক্কো? সে তো সরল স্বচ্ছন্দ মানুষ।" হয়তো সে তাই, আর এই জন্যই তার উপলব্ধি হালকা না হয়ে হতো গভীরতর। এই অর্থে, তার স্ত্রীও ছিলো তারই মতো সরল সহজ। দুয়ে মিলে ওরা এক হয়ে গিয়েছিলো। যখনই সাক্কো দেখতো কোন স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে চলতে পারছে না, ঝগড়া বিবাদ করছে পরস্পরের সঙ্গে, তখনই করুণায় তার অন্তর ভরে উঠতো, যেন একজন খঞ্জ আতুরকে দেখছে সে। ব্যভিচারী মানুষ অনেককেই সে চিনতো। কিন্তু সে ভাবতো ওরা উন্মত্ত পশুরই মতো তাড়িত হচ্ছে বিবেকের দংশনে।

রোজার দিকে তাকালেই সে ওকে বুঝতে পারতো। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে সব সময় রোমান্টিক প্রেমের হাতে বয়ে চলতো, তা তো নয়। তারা একে অন্যের ওপরে রাগ করতো, হাতাহাতি করতো, কথা বন্ধ করে থাকতো পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু বেশিদিন টিকতো না এ সব। তখন মনের সমস্ত ক্ষোভ উজাড় করে দিয়ে আবার স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতো ওরা। এমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সমমর্যাদা বোধ থেকে, খোলাখুলি মনোভাব থেকে; একে অন্যকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবতো না ওরা। ওদের বন্ধুরা মনে করতো, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় ওরা যেন দুটি শিশু, আবার ওরা একই সংগ্রামের দুটি কমরেডও।

তার দেখা সব মানুষের মধ্যে ওদের দুজনের এই সম্পর্ক সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগতো ভাঞ্জেত্তির কাছে। বিশেষ করে সে অবাক হতো রোজার প্রতি সাক্কোর সহজ সুন্দর ব্যবহার দেখে। একদিন ভাঞ্জেত্তি ওদের বাড়িতে এসে দেখলো, ওরা বাড়ি নেই। দরজাটা খোলা। দরজাটা ওরা খোলাই রাখতো। ভাবতো, ওদের ঘরে যে সামান্য জিনিসপত্র আছে, তা যদি দরকারে লাগে কারো, তাকে ওরা স্বাগত জানাবে। ভাঞ্জেত্তি ওদের ফিরবার অপেক্ষায় ঘরের সামনে ছায়ায় বসে রইলো। সে বসেছিলো সিঁড়ি আর দেয়ালে ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন কোণটিতে। এই গ্রীষ্মের বিকেলে ঠাণ্ডা ছায়ায় বেশ আরাম বোধ করছিলো সে। সাক্কো আর রোজা ফিরেও ওকে দেখতে পেলো না।

আবার সাক্কো এই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা বিদূরিত করলো মন থেকে। ভেবে অবাক হলো, কেন এই মধুর কাব্যের ওই কটি পংক্তিই তার মন বেছে নিলো। ভাবতে ভাবতে আর সে সইতে পারলো না। উপুড় হয়ে শুয়ে অশ্রুসিক্ত হাত দুখানির মধ্যে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, "রোজা রোজা রোজা।" তারপর শোক আর ভয়ের যন্ত্রণা এক সময়ে কাটিয়ে উঠলো। আবার তার স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবারে মনে পড়তে লাগলো ধর্মঘটের কথা, পিকেট লাইনের কথা। মনে পড়তে লাগলো, কোথায় সে বলেছিলো ইউনিয়ন বা একতা ছাড়াও কয়েকজন মানুষ কত কি করতে পারে। সব স্মৃতিকে আলাদা করে ফেলবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু এত বেশি ধর্মঘট, এত পিকেট লাইন ভিড় করে এলো তার স্মৃতিতে,—হোপডেলের কারখানার শ্রমিকরা, মিল্‌ফোর্ডের জুতোর কারিগররা, লরেন্সের কাপড়ের কলের মজুররা, কাগজকলের পাংশুটে মুখ স্ত্রীপুরুষের দল। সে দেখতে পেলো এই সব ছোট মিটিংয়ের শেষের ঘটনা। সেখানে তার টুপিটা খুলে সে ছেড়ে দিতো শ্রোতাদের হাতে ঘুরে আসার জন্য। তারই মধ্যে পয়সা সংগৃহীত হয়ে আসতো। হাতের পাতার মধ্যে দুমড়ে একটা পাঁচ ডলারের নোট রাখতো সে টুপিটার মধ্যে যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেটা কত ডলারের নোট, আর যাতে ওরা লজ্জা না পায়, দুঃখ না পায় অতি অল্প পয়সা দিতে হচ্ছে বলে।

তখন দক্ষ কারিগর হিসাবে বাঁধা সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করে সে দিনে ষোল থেকে বাইশ ডলার উপার্জন করতো। তাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা অতিরিক্ত। রোজাও বলতো, "ওদের সাহায্য করো, যত পারো সাহায্য করো। ওরা তোমার বন্ধু, তোমার কমরেড।" দিনে বাইশ ডলার পেয়েও যুদ্ধ লাগার পরই সে চাকরি ছেড়েছিলো। একদিন সারাটি রাত সে এ নিয়ে আলোচনা করলো রোজার সঙ্গে। মনের কথাও বললো তাকে। বললো, জার্মানই হোক, হাঙ্গেরীয়ই হোক, অস্ট্রীয় বা অন্য যে কোন জাতেরই হোক না কেন, তারই মতো কোন শ্রমিককে গুলি করার আগে সে নিজে প্রাণ দেবে, আত্মহত্যা করবে।

রোজা ওর কথা বুঝেছিলো। ওদের দাম্পত্যজীবনের প্রথম থেকেই

ওরা পরস্পরের সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতো। ওর বন্ধুরা অনেক বলতো, "ও, সাক্কো? সে তো সরল স্বচ্ছন্দ মানুষ।" হয়তো সে তাই, আর এই জন্যই তার উপলব্ধি হালকা না হয়ে হতো গভীরতর। এই অর্থে, তার স্ত্রীও ছিলো তারই মতো সরল সহজ। দুয়ে মিলে ওরা এক হয়ে গিয়েছিলো। যখনই সাক্কো দেখতো কোন স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে চলতে পারছে না, ঝগড়া বিবাদ করছে পরস্পরের সঙ্গে, তখনই করুণায় তার অন্তর ভরে উঠতো, যেন একজন খঞ্জ আতুরকে দেখছে সে। ব্যভিচারী মানুষ অনেককেই সে চিনতো। কিন্তু সে ভাবতো ওরা উন্মত্ত পশুরই মতো তাড়িত হচ্ছে বিবেকের দংশনে।

রোজার দিকে তাকালেই সে ওকে বুঝতে পারতো। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে সব সময় রোমান্টিক প্রেমের হাতে বয়ে চলতো, তা তো নয়। তারা একে অন্যের ওপরে রাগ করতো, হাতাহাতি করতো, কথা বন্ধ করে থাকতো পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু বেশিদিন টিকতো না এ সব। তখন মনের সমস্ত ক্ষোভ উজাড় করে দিয়ে আবার স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতো ওরা। এমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সমমর্যাদা বোধ থেকে, খোলাখুলি মনোভাব থেকে; একে অন্যকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবতো না ওরা। ওদের বন্ধুরা মনে করতো, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় ওরা যেন দুটি শিশু, আবার ওরা একই সংগ্রামের দুটি কমরেডও।

তার দেখা সব মানুষের মধ্যে ওদের দুজনের এই সম্পর্ক সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগতো ভাঞ্জেত্তির কাছে। বিশেষ করে সে অবাক হতো রোজার প্রতি সাক্কোর সহজ সুন্দর ব্যবহার দেখে। একদিন ভাঞ্জেত্তি ওদের বাড়িতে এসে দেখলো, ওরা বাড়ি নেই। দরজাটা খোলা। দরজাটা ওরা খোলাই রাখতো। ভাবতো, ওদের ঘরে যে সামান্য জিনিসপত্র আছে, তা যদি দরকারে লাগে কারো, তাকে ওরা স্বাগত জানাবে। ভাঞ্জেত্তি ওদের ফিরবার অপেক্ষায় ঘরের সামনে ছায়ায় বসে রইলো। সে বসেছিলো সিঁড়ি আর দেয়ালে ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন কোণটিতে। এই গ্রীষ্মের বিকেলে ঠাণ্ডা ছায়ায় বেশ আরাম বোধ করছিলো সে। সাক্কো আর রোজা ফিরেও ওকে দেখতে পেলো না।

রোজা তখন প্রথম গর্ভবতী। তার জন্যই ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছিলো। গর্ভাবস্থায় যেমন হয় সব মেয়েরই, তেমনি রোজার চেহারায়ও এসেছে একটা ঔজ্জ্বল্য, একটা সৌন্দর্যের আলগা ছোপ, গায়ের চামড়ার ঠিক নিচে মৃদু আলোর মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ওরা দুজনে পরস্পরের হাত ধরে হেঁটে আসছিলো, চলতে চলতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে এক একবার মৃদু একটু হাসছিলো ওরা। এত সহজ, এত স্বাভাবিক ওদের এই দৃষ্টির অভিব্যক্তি, যে ভাঞ্জেত্তি অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। পরে একদিন সে বলেছিলো, এমন সুখের সহজ আনন্দে তার প্রায় কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিলো সেদিন।

সাক্কোর স্মৃতিতেও সে দিনটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। দুজনে সেদিন গিয়েছিলো স্টিল্টন ঝরণা পর্যন্ত। জুতো, মোজা খুলে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসেছিলো একটা পাথরের ওপরে। ইতালীর একটা কেব্‌ল্ লাইন উদ্বোধনের মতো বোকামি উপলক্ষ্যে রচিত একটা সুন্দর গান গাইলো দুজনে। তারপর অনাগত সন্তানের নাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

এ আলোচনার শেষ নেই, এ বড় ভালো লাগতো সাক্কোর। সে বললো, 'যদি ছেলে হয়, তার নাম দেবো আন্তোনিও।'

আগে স্থির হয়েছিলো, দান্তে হবে ওর নাম। রোজা বললো, 'না, বার বার কেন মত বদলাও তুমি?'

'ধরো যদি যমজ হয়, তবে তো দুটো নামই দরকার হবে।'

'না, যমজ হবে না।'

'মেয়ে?'

'তুমি না একবার বলেছিলে, সারা দুনিয়ায় ইনীস্ নামটি সবচেয়ে সুন্দর?'

'না, সবচেয়ে সুন্দর নাম রোজা।'

রোজা তখন বলেছিলো, 'নিক্, কেউ যদি শুনতে পায় আমাদের কথাবার্তা? এমন বোকার মতো কথা বলছি আমরা, যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, আমরা যেন দুটি শিশু পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাতের মুঠি কামড়াও দেখি।'

সে তার হাতে কামড় দিলো, আর রোজা কেঁদে ফেললো।

'ও কি, কাঁদছো কেন?'

'পেটে সন্তানটা বড় হয়ে উঠেছে।' সহজভাবেই বললো রোজা।

সাক্কো চুমু খেলো ওকে। ওর কান্না থামলো। খানিকক্ষণ বসে রইলো দুজনে। তারপর বন্য ফুলে ভরা একটা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে ফিরলো ওরা। ছোট্ট একটি ছেলের মতো নানা রঙের ফুল তুললো সাক্কো, সেগুলো জড়িয়ে একটা মালা তৈরি করে পরিয়ে দিলো রোজার খোঁপায়। হাত ধরাধরি করে দুজনে ফিরে এলো বাড়িতে। শেষে একসময়ে ওরা ভাঞ্জেত্তিকে দেখতে পেলো। হঠাৎ নিজের ঐশ্বর্য আর ভাঞ্জেত্তির নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে অভিভূত হয়ে পড়লো সাক্কো। মনে মনে বললো, "হায় রে দুর্ভাগা বার্তো!"

আবার স্মৃতি উজ্জীবিত হয়ে উঠলো, ব্যথার তীর এসে বিঁধলো বুকে। হাতের তেলোর একপাশ কামড়ে ধরলো সাক্কো, জোরে, আরো জোরে। ভাবলো, এ ব্যথার যন্ত্রণায় অন্য ব্যথা দূর হয়ে যাবে। তার এই দুর্দশার মেঘের অন্তরাল থেকে ভেসে এলো ভাঞ্জেত্তির কণ্ঠস্বর; শান্ত অবিচল আশ্বাসের সুরে ভাঞ্জেত্তি ডেকে বলছে, 'নিকোলা, নিকোলা, আমার কথা শুনছো, নিকোলা? ওখানে আছো তুমি? কী করছো এখন? কথার জবাব দাও, বন্ধু!'

সাক্কো তার বিছানায় উঠে বসলো। শত্রুকে যেমন করে তাড়ায় মানুষ, ঠিক তেমনি করে সে সরিয়ে দিলো তার সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত অতীত। তারপর তার বন্ধুর মতো কণ্ঠস্বরে বন্ধুর কথার জবাব দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শোকহীন হয়ে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতি কষ্টে সে বললো, 'এই তো, আমি এখানে, বার্তো!'

তারপরেই আবার এক মুহূর্ত পরে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে সে বললো, 'বার্তো, কটা বাজে বলতে পারো? কটা বেজে গেছে এরই মধ্যে?'

ইতালীয় ভাষায় জবাব দিলো ভাঞ্জেত্তি, 'আটটা বেজে গেছে এখন। প্রতীক্ষার যন্ত্রণা আর বেশিক্ষণ সইতে হবে না, কিন্তু সব আশা ছেড়ে দেওয়ার মতো সময় হয়নি এখনো।'

'কিসের আশা করছো তুমি?' সাক্কো প্রশ্ন করলো, 'আশায় আশায়

আমার সমস্ত শক্তিকে আমি নিঃশেষ করে দিয়েছি, বার্তো। এবারে আমি নিশ্চিত জানি, এই শেষ। সে জন্যে ভাবি না আমি। আশা আর করতে চাই না। এখন চাই এ অবস্থা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক।'

'নিকোলা, এমনি করে কথা বলছো তুমি!' ভাঞ্জেত্তি প্রায় হালকা সুরে বললো, 'ভয়ঙ্কর অসুস্থ কারো চেয়ে আমাদের আশা কি একটুও কম? সত্যি বলছি, তার চেয়ে আমাদের বেশি আশা আছে। বাইরে কি ঘটছে তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভাবছি, আমরা নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতাই আমাদের শত্রু। এ কথা না ভেবে বাইরে সব জায়গায় কি হচ্ছে, তাই ভাবো। হাজার হাজার মানুষের মুখে ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের নাম। ওরা আমাদের মরতে দেবে না। ওদের হাতে আমার জীবন আমি ছেড়ে দিয়েছি, নিকোলা। সেই জন্যই আমি এত শান্ত। আমার কণ্ঠস্বর তো শুনছো তুমি, আমি কি শান্ত নই? এই হচ্ছে তার কারণ। লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে আমাদের ঘিরে, ওরা সমর্থন করছে আমাদের।'

সাক্কো সায় দিলো, 'তোমার কণ্ঠস্বরের শান্তভাব অনুভব করছি আমি, কিন্তু বুঝছি না কেমন করে এ সম্ভব?'

'এ খুব সহজ কথা।' ভাঞ্জেত্তি বললো, 'আমার দৃষ্টিকে আমি অনেক তীক্ষ্ণ করে ফেলেছি। এই বন্দীশালার পাথরের দেয়াল ভেদ করে বাইরের ঘটনা দেখতে পায় সে। তুমি জানো নিকোলা, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ এই দুর্দশাপন্ন নোংরা বন্দীশালার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাবে যে দৃষ্টিতে তুমি আমি আজ তাকাই অসভ্যদের খোড়ো ঘরের দিকে। সহজভাবে তা দেখার মতো চোখ আছে আমার, তা বুঝবার মতো বোধ আছে। তোমার আমার সাহস বজায় রাখার জন্য এ কথা বলছি না আমি। তবু জেনে রাখো নিকু, যেদিন প্রথম এ দেশে এসেছিলাম, সেদিনের চেয়ে আমি অনেক ভালো আছি এখন। সেদিন আমার চোখ এত অভিজ্ঞ হয়নি। আমার চারপাশে এমন বন্দীশালার দেয়াল ছিলো না তখন, তবু কিছুই দেখতে পাইনি সেদিন। প্রথমে আমি নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট মানুষদের এক ক্লাবে ডিস ধোয়ার কাজ নিলাম। সেখানে ধনীরা আসতো সময় কাটাবার জন্য। গরমে অন্ধকারের মধ্যে, দিনে ষোল ঘণ্টা কাজ করতাম তখন।

ময়লা জঞ্জাল, বাষ্প আর উকুনের গন্ধ আসতো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে। চোখ তুলেও তখন কিছু দেখতে পাইনি আমি। তারপর এ কাজ থেকে সে কাজ,—ডিস ধোয়ার কাজ, দিনমজুরী, পাথরের খনিতে গাঁইতি দিয়ে পাথর উপড়ে তোলা। দিনে দু ডলার, দিনে তিন ডলারের বিনিময়ে তখন আমার দেহ, আমার যৌবন, আমার শক্তি বিকিয়ে দিয়েছি আমি। আমার বিশ্বাস করো নিক্, এক সময়ে দিনে বাট সেণ্ট আর এক ডিস পচা মাংসের বিনিময়েও কাজ করেছি আমি। তখন নিজের চারপাশে তাকিয়ে নিরাশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতাম না। তখন এই বন্দীশালার দেয়ালের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত, অনেক বেশি উঁচু দেয়াল আমার চারপাশে। কিন্তু আজ ভবিষ্যৎকেও দেখতে পাই আমি, আমি বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি,—আমি কখনো চিরদিন বেঁচে থাকতাম না। আগে হোক পরে হোক, মৃত্যু আসতোই। কিন্তু আমি তোমায় বলছি নিক্, মৃত্যু যে পথে আসছে, তার ফলে তুমি আর আমি চিরদিন বেঁচে থাকবো। আমাদের নাম কোনদিন বিস্মৃত হবে না।'

চোর মাদীরো তার নিজের কুঠুরিতে বসে সব শুনছিলো। সব বুঝতে পারছিলো না সে। যে সামান্য ইতালীয় আর পর্তুগীজ ভাষা জানতো সে, তা দিয়ে এখান থেকে খানিক ওখান থেকে খানিক আঁচ করতে পারছিলো। হঠাৎ শিশুর মতো সে চিৎকার করে উঠলো, 'কিন্তু কোথায় থাকবে সে নাম, বার্তোলোমিউ? ভবিষ্যতে কোথায় থাকবো আমি?'

'হায় রে দুর্ভাগা!' ভাঞ্জেত্তি বললো।

মাদীরো তার কুঠুরির দরজায় এসে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আমার কী হবে, বার্তো? আমার সারা জীবনে তোমাদের মতো দুটো মানুষ আর আমি দেখিনি। আমার সারা জীবনে তোমরা দুজনই প্রথম আমার সঙ্গে সস্নেহে ভদ্রভাবে কথা বললে, যেন আমি মানুষ, যেন জানোয়ার নই আমি। কিন্তু কী হবে এতে? কোনদিন ভালো হওয়ার একটু সুযোগ পাইনি আমি।'

'তা ঠিক বটে। কোনদিন সুযোগ পাওনি তুমি।'

'সাকোর কথা শুনেছি আমি। সাকো আমায় বলেছে, তার বাগান

ছিলো, ভোর চারটেয় উঠে সে মাটি কোপাতো, আবার কাজ থেকে ফিরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আবার বাগানে কাজ করতো সে। ওর কথা শুনতে শুনতে একটি মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে আমার মনে। তার দু হাত ভরা টাটকা তোলা ফল। যাদের ফল নেই অথচ ফলের প্রয়োজন তাদের সব ফল বিলিয়ে দিতো সে। আমি শুধু শুকনো ঘাস আর আগাছাই তুলেছি, বার্তো!'

ভাঞ্জেত্তি বললো, 'সে শস্য তুমি বপন করোনি, সে চারাগাছ রোপণ করোনি তুমি।'

'তবে তোমরা দুজন কি আমার বন্ধু?' মাদীরো প্রশ্ন করলো।

ভাঞ্জেত্তি জবাব দিলো, 'কি জিজ্ঞেস করছো তুমি? তা কি বুঝতে পারছো না, সিলেস্তিনো? অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছি আমরা তিনজন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবো আমরা। সারা পৃথিবী তখন বলবে, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি আর একটি চোর মৃত্যু বরণ করলো। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক মানুষ বুঝতে পারবে, তিনটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা বুঝলেই আমরা আরো ঘনিষ্ঠতর হবো।'

মাদীরো প্রতিবাদ করলো, 'কিন্তু আমি তো অপরাধী, আর তোমরা নিরপরাধ। সমস্ত দুনিয়ায় যদি একটি মানুষও জানে তোমরা নিরপরাধ, তবে সে মানুষটি আমি। তোমায় বলছি আমি। আমি জানি সে কথা।'

উত্তেজনা আর আবেগের স্রোতে ভেসে গেলো মাদীরো। তার কুঠুরির দরজায় মুষ্ট্যাঘাত করে ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চিৎকার করতে লাগলো, 'হ্যাঁ, নিরপরাধ! নিরপরাধ! তোমরা শুনছো? ওরা নিরপরাধ! এই মানুষ দুটি নিরপরাধ। আমি জানি। আমি মাদীরো, চোর, খুনী। দক্ষিণ ব্রেনট্রির সেই গাড়িতে ছিলাম আমি। আমি সেই অপরাধে, সেই হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যারা খুন করেছিলো তাদের নাম আমি জানি, তাদের মুখ চিনি। তোমরা নিরপরাধ দুটি মানুষকে হত্যা করছো!'

'শান্ত হও, শান্ত হও।' ভাঞ্জেত্তি বললো, 'চিৎকার করে কী হবে? নরম হয়ে কথা বলো। শপথ করে বলছি, তাহলে সারা পৃথিবী তোমার কথা

শুনতে পাবে।'

'হ্যাঁ, শান্ত হয়ে বলো।' সাক্কো বললো, 'বার্তো যেমন বলছে, তেমনি শান্ত হয়ে, নরম হয়ে বলো। বার্তোর কথা শোনো। ও খুব জ্ঞানী মানুষ, আমি সারা জীবনে যাদের জেনেছি, তাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী। ও ঠিকই বলেছে, নরম স্বরে কথা বললে সারা পৃথিবী তোমার কথা শুনতে পাবে।'

মাদীরো চিৎকার থামালো, কিন্তু দেহটা কুঠুরির দরজার গায়ে চেপে দাঁড়িয়ে রইলো। তার তিক্ত কান্না, তার শোক, তার হতাশা, তার নিরাশার দুঃখ,—সব মিলে বিচলিত করে তুলেছে তার পাশের দুটো কুঠুরির মানুষ দুটিকে। এই দুর্ভাগা চোরটির প্রতি দুজনের মনেই জাগলো অপত্য স্নেহ। দুজনেই ভাবলো, ছেলেটা অন্ধ হয়েই জন্মেছে, চোখ আর মেললো না কোনদিন। ওদের নিজেদের জীবনের পথ ওরা নিজেরাই তৈরি করেছে। পিছনে তাকিয়ে এখনো ওরা ওদের অগ্রগমনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দেখতে পায়। স্বেচ্ছায় সুচিন্তিতভাবে কাজ করে করে এই পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে ওরা। তবু ওরা বুঝলো, মাদীরো করতে পারতো না এ রকম। মাদীরোর এ পরিণতি ছিলো পূর্বনির্দিষ্ট, অবশ্যম্ভাবী। ওর এই পরিণতি যেন একটা বিষময় গাছের ফল, যেটা রোপণ করেছিলো অন্য কেউ।

মাদীরোর চিৎকার শুনে বন্দীশালার দুজন রক্ষী আর হাসপাতালের একজন ভৃত্য ছুটে এলো। কিন্তু ভাঞ্জেত্তি ওদের বললো, সব ঠিক হয়ে যাবে, ওরা চলে যাক।

'ও রকম চিৎকার—' একজন রক্ষী বলতে শুরু করলো।

ভাঞ্জেত্তি কর্কশ কণ্ঠে ওকে থামিয়ে দিলো, 'মৃত্যুর আগের মিনিট সেকেণ্ড যদি গুনতে পারতে তবে তুমিও চিৎকার করতে। এখন চলে যাও তোমরা।'

সে আর সাক্কো দুজনেই এবারে মাদীরোর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। আধঘণ্টা ধরে সস্নেহে বিজ্ঞের মতো গভীর উৎকণ্ঠায় ওরা কথা বললো ওর সঙ্গে। একদিক থেকে মাদীরো ওদের এক মূল্যবান বস্তু দান করলো। তার জন্য উৎকণ্ঠায় ওরা নিজেদের ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলে গেলো। সাক্কো মাদীরোকে বললো তার বাড়ি, তার স্ত্রী, তার সন্তান দুটির কথা।

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছোট ছোট মজার কাহিনী বললো সে। বললো তার ছেলে দান্তের প্রথম হাসির কথা,বললো ছ-সাত সপ্তাহের শিশুর মুখের হাসি দেখতে কেমন লাগে। সে বললো, ‘এ যেন ঠিক আত্মার আত্মপ্রকাশের মতো। এর অস্তিত্ব তো রয়েছেই, কিন্তু হঠাৎ সূর্যকরোদ্ভাসিত পৃথিবীতে জলসিঞ্চিত কুসুমের মতো যেন পাপড়িগুলো মেলে দিলো সে।’

‘মানুষের আত্মা আছে বিশ্বাস করো তুমি?’ মাদীরো ফিসফিসিয়ে বললো।

ভাঞ্জেত্তি জবাব দিলো তাকে। জ্ঞানে আর কোমলতায় পরিপূর্ণ তার অন্তর। বিগত কয়েক দিনে সে যেন কয়েক শো বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সে মাদীরোকে বললো, কতকাল ধরে মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছে।

ভাঞ্জেত্তি কোমল কণ্ঠে বললো, ‘মানুষ তো পশু নয়। আমাদের বোঝা দরকার, যারা সবচেয়ে বেশি ভগবানের কথা বলে, তারাই আবার মানুষের ওপরে এমন ব্যবহার করে যাতে মনে হয় ভগবানের অস্তিত্ব অসম্ভব। এমন ব্যবহার করে তারা যেন মানুষের আত্মা নেই, তাদের ব্যবহারই এর প্রমাণ। কিন্তু ভেবে দেখো, কেমন একসূত্রে বাঁধা আছি আমরা তিনজনে, কেমন ঘনিষ্ঠভাবে। তুমি মাদীরো বড় হয়ে উঠেছো প্রভিডেন্সের অলিগলির দৈন্য-দুর্দশার মধ্যে। তুমি চুরি করতে, মানুষ খুন করতে। আর তোমার পাশেই রয়েছে সাক্কো, আমার জানাশোনা সবার সেরা মানুষ, সৎ জুতোর কারিগর, সৎ শ্রমিক। আর রয়েছি আমি, ভাঞ্জেত্তি, যে চেয়েছিলো তার সহকর্মী শ্রমিকদের নেতা হতে। তুমি হয়তো ভাববে, আমরা তিনজন তিন রকমের মানুষ। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমরা ঠিক একই আচ্ছাদনের তলায় রোপণ করা তিনটি বীজের মতো। একই আত্মার মাধ্যমে আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তারই মাধ্যমে আমরা যুক্ত রয়েছি লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে। যখন আমাদের মৃত্যু হবে তখন সমস্ত মানবজাতির অন্তরে আঘাত লাগবে, আর এমন তীব্র বেদনা অনুভব করবে তারা, যার কথা ভাবতেও কান্না পায় আমার। সেদিক থেকে বিচার করলে মানুষের মৃত্যু নেই। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো, সিলেস্তিনো?’

'আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে চেষ্টা করছি বুঝতে।' মাদীরো বললো, 'আমার সমস্ত জীবনেও কোন কিছু বুঝবার জন্য এত চেষ্টা আমি করিনি।'

এবারে সাক্কো বললো, 'এ কথা তোমায় কখনো জিজ্ঞেস করিনি আমি, সিলেস্তিনো। কিন্তু এবারে আমার জবাব দাও। দক্ষিণ ব্রেনট্রির অপরাধের যে স্বীকারোক্তি করেছিলে তুমি, তা কি করেছিলে এই ভেবে যে যেমন করেই হোক এ অপরাধে না হোক, অন্য অপরাধে তোমাকে মরতেই হবে, স্বীকারোক্তিতে তোমার ক্ষতি নেই কিছু? নাকি আমাদের কথা ভেবে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলে?'

'সত্যি কথা বলছি আমি।' মাদীরো বললো, 'তোমার আর ভাঞ্জেত্তির কথা প্রথমে খবরের কাগজে পড়লাম। তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না, কতদিন ধরে ভেবেছি আমি, বুঝতে চেষ্টা করেছি, ওরা তোমাদের হত্যা করার জন্য কেন উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। তারপর তোমার স্ত্রী একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁকে এক ঝলক দেখলাম আমি। আর মনে মনে ভাবলাম, সাক্কোকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে হবে আমাকে। নিজের কী হবে তা নিয়ে ভাবনা নেই আমার। এই হচ্ছে আসল কথা। হয়তো সমস্ত দুনিয়ায় কেউ আমায় বিশ্বাস করবে না, এমন কি বেঁচে থাকলে আমার নিজের মাও করতেন না। আমি এখন সত্য কথাই বলছি। যদি মানুষের জীবনে এমন একটু সময়ও আসে যখন সে সহজ সরলভাবে সত্য কথা বলে, তবে সে এমনি সময়। তেমনিভাবে আমি বলছি, আমার মনে হলো, হয়তো নতুন করে বিচার হলে খুনের দায়ে আমি দোষী সাব্যস্ত হবো না। কিন্তু এ কথা জানতাম, যদি স্বীকারোক্তি করি তবে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ কথা জেনেও আমাকে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিলো, বলতে হয়েছিলো সত্যি সত্যি যা ঘটেছে।'

ভাঞ্জেত্তি চিৎকার করে উঠলো, 'কিছু তো রয়েছে তোমার মধ্যে! দেখো নিকোলা, অন্যের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে বড় আর কী থাকতে পারে মানুষের মধ্যে? এর জন্যই মরছি আমরা। শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য আমরা জীবন দিচ্ছি। কিন্তু মাদীরো কী করছে? ওর দিকে তাকিয়ে ওর অবস্থাটা বুঝে দেখো। ও প্রাণ দিচ্ছে আমাদের জন্য। হ্যাঁ,

ঠিক তাই। আমায় বলো সিলেস্তিনো, কেন এ কাজ করলে? কেন করলে বলতে পারো আমায়?'

সহজ কণ্ঠে চোর মাদীরো বললো, 'তুমি জানো? একশো বার এই প্রশ্ন আমি নিজের কাছে করেছি। কেমন করে এর উত্তর দেবো জানি না, কিন্তু এক-এক সময়ে এর উত্তর শুধু অনুভব করতে পারি আমি।'

ষোলো

রাত নটায় পাদ্রী এলেন। মৃত্যুশিবিরের ওরা তিনজনই বংশপরম্পরায় রোমান ক্যাথলিক। কিন্তু সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি আগেই জানিয়ে দিয়েছে, পাদ্রীকে তাদের প্রয়োজন নেই। তাই চোর আর খুনী সিলেস্তিনো মাদীরোর জন্যই পাদ্রী এলেন। ওয়ার্ডেন তাঁকে নিয়ে এলেন নিঃসঙ্গ মৃত্যুস্তব্ধ কুঠুরিটাতে।

ঘড়ির কাঁটায় বাইশে আগস্টের শেষ মিনিট, শেষ ঘণ্টাগুলো শেষ হয়ে এলো, আর দণ্ডাজ্ঞা পালনের সময়ও এগোতে লাগলো। যারা এই কাজটির সঙ্গে যেমন করেই হোক সংযুক্ত, তারা এই সময়ের ক্ষীয়মানতা উপলব্ধি করতে পারছিলো, এ সময় ফিরে আসবে না আর। এর জন্য ম্যাসাচুসেট্সের গবর্নরের অদ্ভুত প্রত্যয় আরো দৃঢ় হলো, আর পিকিংয়ের রাস্তার এক ঝাড়ুদারের চীনা বৌ দুঃখে নেতিয়ে পড়ে কেঁদে ফেললো। তার চোখের জল যেন সময়ের ক্ষীয়মানতারই প্রতিরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্মল মন নিয়ে সহজভাবেই শুতে গেলেন, কিন্তু চিলির তাম্রখনির এক শ্রমিক খেতে বসেও রুটির কোন স্বাদই পেলো না, আর তার অন্তর ক্রমে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ম্যাসাচুসেট্সের রাজ্য বন্দীশালার মানুষগুলোর আত্মাও ঘণ্টায় ঘণ্টায় সঙ্কুচিত হতে লাগলো। আর তাদের মুখগুলোও পাণ্ডুরতর হয়ে উঠলো।

ওয়ার্ডেন পাদ্রীকে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ওই পর্যন্ত যাবো। এইটুকু যাওয়াই আমার শাস্তি, এ কথা শুধু আপনাকেই বললাম ফাদার, সারা দুনিয়ায় আর কাউকে এ কথা বলিনি। আরো বলছি, যার ফলে

আমি ওয়ার্ডেন হয়েছি, সে ভাগ্যের প্রতি আমার এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই।'

পাদ্রী চলার গতি কমিয়ে তাঁর পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিলেন। মৃত্যুর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত তিনি। তার পরিমিত পদক্ষেপ, তার অপরূপ ছন্দ, করুণ সঙ্গীতের লয়ে তার রহস্যময় ধীর নৃত্য। বহু জায়গায় বহুবার তিনি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাকে বাড়ায়নি। অবগুণ্ঠনবতী মৃত্যুকে তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, কিংবা মৃত্যুভীতি একটুও জয় করতে পারেননি। ঘনিষ্ঠতায় যেটুকু জেনেছেন তিনি, তা তাঁর এই রহস্যাবৃত শত্রুর সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। আর এখন বন্দীশালার পরিচিত নিরানন্দ করিডর দিয়ে চলতে চলতে তাঁর এই ধর্মীয় বাণী শোনানোর অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে কী কী সমস্যা আসতে পারে তাই তিনি ভাবতে লাগলেন।

তিনি শুনেছেন, কোন পাপী আত্মাকে উদ্ধার করতে পারলে পরলোকে তার পুরস্কার পাওয়া যায়। কিন্তু আজ এই পাথরে গড়া সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চলতে চলতে তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না, পরলোকের আলোকোজ্জ্বল জীবনে কী আনন্দ তিনি লাভ করবেন, যদি তিনি সাক্কো, ভাঞ্জেত্তি বা এক হতভাগ্য চোরের মতি পরিবর্তন করাতে পারেন। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে যেমন কথা হবে ভাবছেন, তারই খানিকটা তিনি মনে মনে মহড়া দিতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিবারই যেন যে সমস্যা আসবে বলে ভেবেছিলেন, তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি। মনে মনে অনেক বিতর্কের পর তিনি স্থির করলেন, দেবদূতের অগম্য জায়গায় যাওয়ার মতোই ওদের দুজনের সঙ্গে তাঁর নিজের দূরত্বকে দূর করার চেষ্টা না করে তিনি সিলেস্তিনো মাদীরোর আত্মার পরিশুদ্ধির চেষ্টা করবেন; তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই খুব বাধা পাবেন না।

অপরাধ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, কারণ সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির অপরাধ কি ক্ষমা কিংবা প্রতিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি? এই মানুষ দুটি হচ্ছে লাল ড্রাগনের দীর্ঘ জিহ্বার অগ্রভাগ, যে ড্রাগন পাদ্রীর সম-

সাময়িক কালের একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য, বর্তমান ইউরোপের সমস্ত মিষ্টতা, সমস্ত রস সে শুষে নিচ্ছে তার সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর জঠরে। ওদিকে চোর বা খুনীর অপরাধ এমন কঠিন নয়, অন্তত ওদের মতো কঠিন তো নয়ই। তা ছাড়া সমস্ত স্বীকারোক্তি করে সে মার্জনা ভিক্ষা করেছে।

ওয়ার্ডেনের সঙ্গে মৃত্যুশিবিরের দিকে যেতে যেতে পাদ্রী ঠিক এই ঘটনারই মতো সাদৃশ্যপূর্ণ আর একটি অনন্য ঘটনা স্মরণ না করে পারলেন না, ততটা হৃদয়বৃত্তিহীন নন তিনি। এখানে দুটি মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে, অথচ লক্ষ লক্ষ লোক ওদের ভালবাসে। আর এদের সঙ্গে একটি চোরও মরছে। অধর্মীয় হলেও পাদ্রী ওদের পরিণতিকে যীশু খৃষ্টের পরিণতির সঙ্গে তুলনা না করে পারলেন না। যীশুও মরেছিলেন শাসন-কর্তাদের ইচ্ছায়; তাঁর যন্ত্রণারও সাথী ছিলো দুই চোর। এই কথা মনে করে পাদ্রী ভাবলেন, "হয়তো, এই সিলেস্তিনো মাদীরোকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে স্থাপন করা হয়েছে, হয়তো আমিও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে প্রেরিত হচ্ছি। আমি যখন প্রভুর সম্পূর্ণ ইচ্ছা জানি না, তখন তাঁর পরিকল্পনার এক-আধটু ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারি। আমি বিশপ নই, কার্ডিনালও নই। সুতরাং তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বুঝবার চেষ্টা না করে নির্দেশ মেনে চলবো আমি।"

তিনি ওয়ার্ডেনের দিকে ফিরে বললেন, 'সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির কাছে আবার গেলে কি কোন লাভই হবে না?'

'কোন লাভ হবে না, আর আমার মনে হয় ওদের কাছে যাওয়ার অধিকারই আমাদের নেই।'

'তবে ওই চোরের প্রতিই আমার কর্তব্য করবো।' পাদ্রী মাথা দুলিয়ে বললেন। মৃত্যুসারির কুঠুরিগুলো পর্যন্ত তিনি নীরবে হেঁটে এলেন। এখান-কার বাতাস অবশ্যম্ভাবিতায় ভরাট, এ বাতাসে দুর্দশার শৈত্য। পাদ্রী ওয়ার্ডেনের গা ঘেঁষে চলতে লাগলেন, যেন ওঁর কাছাকাছি থেকে মনের ভয় কাটিয়ে দিচ্ছেন। মাদীরোর কুঠুরির দরজায় এসে ওয়ার্ডেন বললেন, 'সিলেস্তিনো, আমি একজন ধর্মযাজককে নিয়ে এসেছি। মৃত্যু যদি আসেই, তবে ওঁর সঙ্গে কথা বলে তুমি তার জন্য প্রস্তুত হতে পারো।'

ওয়ার্ডেনের পিছন থেকে পাদ্রীর নজরে পড়লো মাদীরোর কুঠুরির সহজ শৃঙ্খলা। একটি খাটিয়া আর কখানা বই ছাড়া কিছু নেই সেখানে। এই জায়গা থেকে মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, ঠিক যেমন নিঃসম্পদ, নিরাবরণ হয়ে সে পৃথিবীতে এসেছিলো তেমনি ভাবে। পাদ্রীর চোখের কোণে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির কুঠুরি দুটোর খানিকটাও প্রতিফলিত হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে রাখলেন, আর সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে তাঁর বর্তমান কর্তব্য পালনের জন্য নিজেকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করে তুললেন।

মাদীরো তার বিছানায় উঠে বসলো। মাথা তুলে সে শান্ত হয়ে বসে রইলো, ওয়ার্ডেনের কণ্ঠস্বর শুনেও দরজার দিকে ফিরে তাকালো না। ওকে দেখে পাদ্রী অবাক হয়ে ভাবলেন, ও জানে কিনা এখন রাত নটা বেজে গেছে, আর ওর সময় আর জীবনের আশা শেষ হয়ে এসেছে। মনে মনে যদি সে জেনেও থাকে এ কথা, তার জন্য কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করলো না মাদীরো, সে সম্পূর্ণ শান্ত স্বরেই বললো, 'আপনাকে আর ধর্মযাজককে ধন্যবাদ। ওঁকে চলে যেতে বলুন। ওঁকে আমি চাই না, আমার প্রয়োজন নেই।'

পাদ্রী ওয়ার্ডেমের কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ও কি আজ সারাটা দিনই এমনি ছিলো? এমনি শান্ত, এমমি অচঞ্চল?'

'না তো!' ওয়ার্ডেন বললেন ফিসফিসিয়ে। মাদীরোর এখনকার এমনি ব্যবহারের কারণ খুঁজে না পেয়ে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করলেন। 'ওর ব্যবহার তো এখন একেবারে উলটো। সেই ভোর থেকেই তো ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছিলো ও, কখনো অজ্ঞান হয়ে গেছে, কখনো ভয়ে চিৎকার করেছে ওর ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে, ঠিক যেমন চিৎকার করে শুয়োরছানাটা, যখন মাথায় হাতুড়ির প্রথম আঘাত পেয়ে সে বুঝতে পারে মৃত্যু আসন্ন।'

'তবে? কী করবো এখন?' পাদ্রী প্রশ্ন করলেন।

'ইচ্ছে হলে ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারেন আপনি।' ওয়ার্ডেন জবাব দিলেন।

"খুনীর আত্মার জন্য কেমন করে সংগ্রাম করবো?" পাদ্রী ভাবলেন.

কারণ ঠিক এই কাজটি আর কোনদিন করতে হয়নি তাঁকে। "কোথায় শুরু করবো সংগ্রাম?" তারপর তিনি স্থির করলেন, মাদীরো যেমনভাবে তাঁকে জবাব দিয়েছে তেমনি সহজ সরলভাবে তিনি মাদীরোকেই জিজ্ঞেস করবেন প্রশ্নটা। তিনি বললেন, 'ধর্মযাজকে কেন প্রয়োজন নেই তোমার?'

এবারে মাথা তুললো মাদীরো, দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে পাদ্রীর দিকে এমন স্বচ্ছ তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সে, যে পাদ্রীর মনে হলো যেন একটা বর্শার ফলা এসে বিঁধেছে তাঁকে, আর তাঁর নীতি, তাঁর ন্যায়পরায়ণতার মিনার থেকে তাঁকে নামিয়ে এনেছে নিচে যেখানে একটি ছেলে নির্ভীকভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময়ের চেয়ে এ বিস্ময় গভীরতর, রহস্যময়। শৈশব থেকে যে সুচিন্তিত যুক্তির বর্মে নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন পাদ্রী, এ বিস্ময় যেন তার সমস্ত আবরণ ভেদ করে মুহূর্তের জন্য আসল মানুষটিকে স্পর্শ করলো। তাই মানুষটি একটি নিশ্চিত উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলো, আর সে উত্তর যখন এলো, তখন সে একটুও অবাক হলো না।

গভীর আন্তরিকতায় অনেক কষ্টে নিজের চিন্তা, নিজের ভাষা সংগঠিত করে মাদীরো ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, 'ধর্মযাজকে প্রয়োজন নেই আমার, তিনি হয়তো ভীতি নিয়ে আসবেন তাঁর সঙ্গে। এখন আর আমার কোন ভয় নেই। আজ, কাল, পরশু, তার আগের দিন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি ভীত হয়ে ছিলাম। বার বার মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করেছি আমি, আর প্রতিবারেই অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছি। পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বস্তু এই ভয়। কিন্তু দুজন কমরেড পেয়েছি আমি, নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিও ভাঞ্জেত্তি। ওঁরা আমার সঙ্গে কথা বলে আমার ভয় দূর করে দিয়েছেন। সেই জন্যই আমার ধর্মযাজকে প্রয়োজন নেই। মৃত্যুকে যদি ভয় না করি, মৃত্যুর পরে যা আসবে তার জন্যও এতটুকু ভয় থাকবে না আমার।'

পাদ্রী মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কী বলেছে তোমায়? ওরা কি তোমায় ভগবানের মার্জনা এনে দিতে পারে?'

'ওঁরা আমায় মানুষের মার্জনা এনে দিয়েছেন।' শিশুর মতো সরল

জবাব দিলো মাদীরো।

'আমার সঙ্গে প্রার্থনা করবে তুমি?' পাদ্রী প্রশ্ন করলেন।

'প্রার্থনা করার কিছু নেই আমার।' মাদীরো জবাব দিলো। 'আমি দুজন বন্ধু পেয়েছি। যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছি আমি, ওঁরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।'

এই কথা বলে মাদীরো হাত দুখানা ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। পাদ্রীরও আর ওর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হলো না। যেমনি এসেছিলেন ওঁরা তেমনি চলে গেলেন। কিন্তু এখন ফিরে যেতে যেতে পাদ্রী একবার কুঠুরির মধ্যে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ওদের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন দুটি মানুষকে যাদের কাহিনী নিউ ইংল্যাণ্ডের নতুন কিংবদন্তী হয়ে থাকবে। তিনি যখন তাকালেন ওদের দিকে ওরাও ওদের দৃষ্টি তুলে ওঁর চোখে চোখ রাখলো।

এখন পাদ্রী দ্রুততর গতিতে বন্দীশালার সুড়ঙ্গপথ এবং করিডর পেরিয়ে চললেন। তবু দ্রুতগতিকেও তিনি খানিক সংযত করে রেখেছিলেন যাতে ওয়ার্ডেন বুঝতে না পারেন যে তিনি সত্যি সত্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে, তাঁর পশ্চাতে এই মৃত্যুশিবিরে এমন এক রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে যা শুধু তাঁর বোধকেই নাড়া দেয়নি, তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে। সেই রহস্যের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গেলেন তিনি।

সতেরো

শেষ পর্যন্ত পাদ্রীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ওয়ার্ডেন খুশি হলেন। অনেক কাজ রয়েছে তাঁর। ওদিকে রাত প্রায় দশটা বাজে। লোকে তো বোঝে না, ঘটনার ভয়াবহতা ছাড়াও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পশ্চাতে কত কাজ রয়েছে। মাঝে মাঝে অন্য সব বন্দীশালার ওয়ার্ডেনদের মতোই তিনিও দার্শনিকের মতো ভাবতে বসেন তাঁর কাজ আর বিরাট জটিল এক কবরখানার ডিরেক্টরের কাজের মধ্যে কত সাদৃশ্য। দুটো কাজই এক রকম। কিন্তু এমনটি তো নিজের ইচ্ছেয় করেননি তিনি, জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে যদি

জড়িয়ে থাকে অনেক বেশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তবে তা তিনি পরিবর্তনও করতে পারবেন না, কিংবা তাতে বাধাও দিতে পারবেন না।'

প্রথমে ওয়ার্ডেন মৃত্যুশিবিরের পাশের খাওয়ার হলে গেলেন। এই হলটা সাংবাদিকদের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। মৃত্যুদণ্ড প্রত্যক্ষ করতে কিংবা মৃত্যুদণ্ডের সময় কাছাকাছি থাকার জন্য যে সাংবাদিকদের বিশেষ নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তারা সবাই ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। সংবাদ-পত্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার মূল্য ওয়ার্ডেন বুঝতেন, তাই রিপোর্টার-দের কি কি অসুবিধে হবে আগে থাকতেই ভেবেচিন্তে তার ব্যবস্থা করে রাখতে চেষ্টা করেছেন তিনি। টাটকা কফির গন্ধে হলঘরের বাতাস ভরপুর; সুস্বাদু স্যাণ্ডউইচ, আর ভালো টাটকা কফি কেক স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ওয়ার্ডেন বিশেষ অর্ডার দিয়ে পঁচিশ পাউণ্ড চমৎকার রুটি খরিদ করিয়েছেন, কারণ তিনি বুঝতেন, কেউ কখনো বন্দীশালায় এসে এক টুকরো রুটিও মুখে দিলে তাকে বোঝানো দরকার যে বন্দীশালার রুটি পোকায় খাওয়া নয়, আর এতগুলো সাংবাদিককে একবারে পেয়ে এই কথা বুঝিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট মূল্য আছে।

টেলিফোন কোম্পানীও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা ছটি নতুন ব্রাঞ্চ লাইন দিয়েছেন যাতে মৃত্যুদণ্ডের সব খুঁটিনাটি অপেক্ষমান জগতের কাছে বিনা বাধায় অবিলম্বে পৌঁছতে পারে। রিপোর্টাররা যদি হঠাৎ কিছু লিখতে চায়, কোন চিন্তা, কোন মনোভাব যদি ব্যক্ত করতে চায় তারা, তার জন্য প্রচুর কাগজ আর পেন্সিলেরও ব্যবস্থা রেখেছেন ওয়ার্ডেন। খানিকটা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব নিয়ে তিনি ভাবছিলেন সেই ঘটনা পরম্পরার কথা, যার ফলে আজ প্রাচীন ম্যাসাচুসেট্সের এই জায়গাটি, তার বন্দীশালা এবং তিনি নিজে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টিকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিজের সৃষ্ট নয় এমন এক অবস্থাকে আর একবার মেনে নিলেন তিনি এবং স্থির করলেন, এই অবস্থায় তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যাতে সব কিছু কোন অঘটন কিংবা জটিলতা ছাড়াই সম্পন্ন হয় তাই দেখা।

খাওয়ার হলে আসতেই রিপোর্টাররা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেললো। যতটা সম্ভব সব খুঁটিনাটি খবর তারা জানতে

চায়,—রক্ষী, চাকর, ডাক্তার, যারা মৃত্যুদণ্ড পালনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, তাদের সবার নাম জানতে চায় ওরা। ওরা জিজ্ঞেস করলো, মৃত্যুদণ্ডের আগের শেষ মুহূর্তগুলোতে তিনি গবর্নরের আপিসের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখবেন কিনা, যাতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিতের কোন আদেশ যদি হয়ই তবে তা না জানবার ফলে ওদের মৃত্যুদণ্ড হয়ে না যায়। কার পরে কাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তাও জানতে চাইলো ওরা।

'আপনারা শুনুন,' ওয়ার্ডেন প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাকে সারারাত আপনাদের কাছেই থাকতে হবে। এখনো আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আপনাদের জন্য আমার একজন সহকারীকে রেখে যাচ্ছি। আমার পক্ষে যা সম্ভব সে সমস্ত খবরই উনি আপনাদের দিতে পারবেন। কিন্তু আপনাদের বোঝা দরকার, আমরা শুধু জনসাধারণের ভৃত্য, এক অপ্রিয় কর্তব্য পালনের ভার পড়েছে আমাদের ওপরে। আমি অবিশ্যি সব সময়েই গবর্নরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করবো। আপনাদের বোঝা উচিত, এই মানুষ তিনটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছি আমি। সুতরাং ওরা আইনগতভাবে যে সাহায্য ন্যায়তই পেতে পারে তার চেষ্টা আমি করবো। আর, প্রথমে দণ্ড হবে সিলেস্তিনো মাদীরোর, তারপর নিকোলা সাক্কোর, আর সবার শেষে দণ্ড হবে বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির। এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না আমি।'

ওরা সবাই তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিলো। বিশেষজ্ঞের মতো অবিচলিত-ভাবে একটুও কম বেশি না বলে তিনি যে অবস্থাটা সামলে নিতে পেরেছেন, তার জন্য মনে মনে গর্ববোধ করলেন ওয়ার্ডেন। তিনি যখন সাংবাদিকদের নিয়ে ব্যস্ত তখন বন্দীশালার ডাক্তার, ইলেকট্রিসিয়ান, দুজন রক্ষী এবং বন্দীশালার ক্ষৌরকার মৃত্যুশিবিরে চলে এসেছে। ওয়ার্ডেনের মতোই তাদের প্রত্যেকটি কাজের বেদনাদায়ক তাৎপর্য সম্পর্কে তারা সচেতন। কিন্তু ওয়ার্ডেনের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে না তাদের, তাদের কাজ পড়েছে ওই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষ তিনটির সঙ্গেই। সুতরাং তাদের জন্য নির্দিষ্ট অপ্রিয় কাজগুলোর প্রতি তারা বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে, তা স্বাভাবিক।

এই লজ্জা এবং অস্বুখকর অনুভূতিকে চাপা দেওয়ার জন্য এই বিরাট ঘটনায় তাদের নিজেদের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলো তারা, ভাবতে লাগলো কেমন করে আগামী কাল এই ঘটনাকে বর্ণনা করবে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই বিচলিত বোধ করছিলো, প্রয়োজন বোধ করছিলো ওদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার,—দুজন বিপ্লবী আর একটি চোরের কাছে। ওদের মাথা কামাতে কামাতে ক্ষৌরকার ক্ষমা চেয়ে নিলো। ভাঞ্জেত্তিকে সে বললো, 'এ আমার গভীর দুর্ভাগ্য যে এই কাজটি আমায় করতে হচ্ছে। আমার তো হাত নেই এতে।'

'তোমার হাত নেই, সত্যি।' ওকে আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললো ভাঞ্জেত্তি, 'তোমার কাজ তুমি করছো। এতে কী বলার আছে?'

'যদি আপনাদের সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে পারতাম আমি।' ক্ষৌরকার বললো। ভাঞ্জেত্তির মাথা কামানো হয়ে গেলে সে ইলেকট্রিসিয়ানের কানে কানে বললো, যতটা খারাপ লাগতে পারতো, ততটা খারাপ অভিজ্ঞতা তার হয়নি; আর নিঃসন্দেহে ভাঞ্জেত্তি মানুষটি একেবারে অস্বাভাবিক রকমের, সবার থেকে আলাদা।

কিন্তু ক্ষৌরকার অনেকবার কথা বলবার চেষ্টা করলেও সাক্কো কোন কথাই বললো না। সে শুধু ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো; আর ক্ষৌরকারের কথাগুলো তার গলায় এসে থমকে মিলিয়ে গেলো।

মাদীরোকে নিয়ে ক্ষৌরকারের অভিজ্ঞতা হলো একেবারে আলাদা, মাদীরো যেন একটি ছোট্ট ছেলে। তার শান্তভাবে প্রায় ভয় পেয়ে গেলো ক্ষৌরকার। বাইরে করিডরে এসে রক্ষীদের কাছে ফিসফিসিয়ে সে বললো ওর শান্তভাবের কথা। ওরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিলো ওর কথা, আর অর্থপূর্ণভাবে ইঙ্গিত করলো মৃত্যুপ্রকোষ্ঠের দিকে।

ইলেকট্রিসিয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো রক্ষীরা বন্দীদের অন্তর্বাস বদলে এই বিশেষ ঘটনার জন্য তৈরি অন্তর্বাস পরিয়ে দিলো। তারপর ওরা মৃত্যুর কালো পোশাক পরলো। এই পোশাক পরে ওরা ওদের কুঠুরি থেকে মৃত্যুপ্রকোষ্ঠে যাবে। এই ভয়ানক পোশাক পরতে পরতে ভাঞ্জেত্তি কোমল সুরে বললো, 'এবারে বরের পোশাক পরা হলো। এই দরদী সরকার

আমাকে গরম পোশাক দিয়েছে, দক্ষ ক্ষৌরকার দিয়েছে আমাকে কামানোর জন্য। আর, আশ্চর্য, আমার সব ভয় চলে গিয়ে এখন মন ভরে উঠেছে শুধু ঘৃণায়।'

সে ইতালীয় ভাষায় বলছিলো। রক্ষীরা ওর কথা বুঝতে পারলো না, কিন্তু ক্ষৌরকার বুঝতে পারলো। কথাগুলোর অনুবাদ করে সে বন্দীশালার ডাক্তারকে বললো। তিনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তাঁর পেশাদারী উন্নাসিকতার বর্মে নিজেকে তিনি আচ্ছাদিত করে রেখেছেন।

মৃত্যু-পোশাকের হাতা এবং ট্রাউজারের পায়ের দিকটা চিরে দেওয়া ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ। ক্রুদ্ধ মন নিয়ে সে এই কাজ করলো, অভিসম্পাত দিলো নিজেকে এবং নিজের দুর্ভাগ্যকে, যার জন্য এ কাজ করতে হচ্ছে তাকে। এক সময় ভাঞ্জেত্তির গায়ে লাগলো তার হাত। ভাঞ্জেত্তি ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দূরে সরে গেলো। তারপর তেমনি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো রক্ষীদের যারা ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ দেখছিলো।

কঠিন স্বরে ভাঞ্জেত্তি বললো, 'এই কাজে তোমরা নিজেদের জড়িত করেছো। যুগে যুগে তোমাদের মতো অনেক আসবে। ভগবান যদি থেকেও থাকেন, তবু যারা মৃত্যুর পরিচারিকা হিসাবে কাজ করে সেই নপুংসকদের তিনিও ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে লড়াই করে জীবন দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো আমার, অথচ তোমাদের মতো মানুষকে পাঠানো হয়েছে আমার কাছে। তোমাদের ওই অভিশপ্ত হাত সরিয়ে নাও। যে প্রভুর ভৃত্য তোমরা তার ক্লেদ লেগে রয়েছে তোমাদের হাতে।'

ক্ষৌরকার আবার অনুবাদ করে বললো। কিন্তু বন্দীশালার ডাক্তার বললেন, 'কী আশা করছো তুমি? একটা মানুষকে হত্যা করার চেয়ে বেশি কিছু তো আর করতে পারবে না। যদি সে কথা বলতেই চায়, তবে কেমন করে থামাবে তাকে? ও যা বলছে তা নিয়ে আমার কাছে আর এসো না। যা খুশি করুকগে ও।'

রক্ষীরা আবার কুঠুরিগুলোর দরজায় তালা লাগালো। প্রত্যেক কুঠুরিতে রইলো কালো পোশাক পরা একটি করে মানুষ। মাদীরোর এতটুকু পরিবর্তন নেই। কালো পোশাক পরে আগের মতো স্থির হয়ে তার

বিছানায় বসে আছে। নিকোলা সাক্কো দাঁড়িয়ে ছিলো তার কুঠুরিতে, নতুন পোশাকটা ধরে টানছিলো আর অবাক হয়ে দেখছিলো সেটা। ভাঞ্জেত্তি দরজার ফাঁকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার মুখে ক্রোধের অভিব্যক্তি, তার ধমনীতে রক্ত বইছে কঠিন ধীর গতিতে। জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে তার মধ্যে। জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ সে, সে সজীব, দরজাটা টানতে টানতে তার বাহুর মাংসপেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছিলো। দুঃখহীনভাবে সে অতীত জীবনকে স্মরণ করলো, কিন্তু কঠিন ক্রমবর্ধমান ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তার অন্তর। ইতালীর সূর্যকরস্নাত এক গ্রামে মুক্ত সুখী শৈশবকে মনে পড়লো তার। আবার যেন মায়ের কাছে গেছে সে। মায়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে তার নরম গালের উত্তাপ সে অনুভব করলো তার নিজের গালে। তিনি অসুস্থ, তাঁর বিছানার পাশে অবিরাম বসে রইলো সে, আর নিজের প্রচণ্ড প্রাণপ্রবাহের খানিকটা তাঁর মধ্যে দিয়ে দিতে চাইলো। সেই কবে, কতদিন আগে সে নিজের অন্তরে জীবনের ও সংগ্রামের শক্তির প্রকাশ অনুভব করতে শুরু করেছিলো। সে নিজে যেন একটি কুয়ো, তার মধ্য থেকে জল তুলে নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে সবাই, অথচ তার নিজের তৃষ্ণাই কোনদিন দূর হলো না।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইতালীও মুছে গেলো। মায়ের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে তার যে পুরাতন গ্রাম্য জীবন গড়ে উঠেছিলো তা থেকে পালিয়ে এলো সে। শ্রম আর লড়াই, জীবনধারণের শুকনো রুটির জন্য পরিশ্রম আর অন্তরে এক আদিম ক্ষুধা,—এই যেন হয়ে উঠলো বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি, এই যেন তার জীবন, তার অস্তিত্বের গভীরতর অর্থ। সে সাক্কোর মতো ছিলো না। জীবনের সমস্ত ঝড়বন্যার জন্য যেন জন্ম হয়েছিলো তার, কিন্তু তার জন্ম এ ঝড়বন্যা উত্তরণের জন্যও। আত্মসমর্পণ সে করতে পারে না। মৃত্যু যেমন অসম্ভব, তাকে যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি তার সমস্ত দেহ, প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন বলতো, আত্মসমর্পণ অসম্ভব। আর এক পা এগোও, আর একটু কথা বলো, আর একবার চ্যালেঞ্জ করো, কোন পথ নিশ্চয়ই মিলবে। জীবনই জীবনের সমাধান, মৃত্যু নয়। মৃত্যু তো এক দৈত্য, ক্লেদাক্ত, কুৎসিত ভয়ংকর। তাকে ওর শত্রুরা পূজা করে। সে মৃত্যুকে

অস্বীকার করেছে ঘৃণায় আর ক্রোধে। জীবন তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর ঠিক তেমনি সেও সংযুক্ত জীবনের সঙ্গে। এখন তার কথা আর তার চিন্তা এক হয়ে গেছে।

'আমাকে বাঁচতেই হবে। বুঝতে পারছো তোমরা? বাঁচতে আমাকে হবেই। আমার কাজ কেবল শুরু হয়েছে। সংগ্রাম চলেছে। আমাকে বাঁচতে হবে, এই সংগ্রামের অংশ হতে হবে। আমি মরবো না, মরতে পারি না…'

বন্দীশালার ডাক্তার সাংবাদিকদের ঘরে এসে ওয়ার্ডেনকে খবর দিলেন। ওয়ার্ডেন একটা টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে বিশেষ রিপোর্টার এবং সাংবাদিকদের দলকে শান্ত এবং নীরব হতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'বন্ধুগণ, বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে গেছে। অর্থাৎ, প্রথানুসারে তাদের মাথা কামানো এবং পোশাক পরিবর্তন করানো হয়ে গেছে। এই রাজ্যের গবর্নর ওদের মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছেন সেই মধ্যরাত্রির আর এক ঘণ্টা কয়েক মিনিট বাকি। রাত এগারোটার পরে মধ্যরাত্রির আগে একবার বৈদ্যুতিক তারগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যখন দেখবেন আলোগুলো হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেলো, তখন বুঝবেন এই পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন আমি আপিসে গিয়ে টেলিফোনে গবর্নরকে ডাকবো এবং গবর্নরের কোন আদেশ যদি আমার জন্য থাকে, তা তৎক্ষণাৎ আমাকে জানানোর ব্যবস্থা করবো।'

আঠারো

শেষ ঘণ্টা এলো, রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যেকার ঘণ্টা। এর পরেই শেষ হবে দিনটি, আর দিনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে অনেক কিছু, আশা আর স্বপ্ন আর সুবিচার আর ন্যায়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। এই শেষ ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পরিশ্রান্ত নীরবতায় উপলব্ধি করলো, একটা কিছু চাইলে, তার জন্য প্রার্থনা করলে, আকাঙ্ক্ষা করলে কিংবা শুধু বিশ্বাস করলেই সে বস্তু পাওয়া যায় না।

এই শেষ ঘণ্টায় রাজ্যভবনের চারপাশে পিকেট লাইন বিরাটতর হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বন্দীশালার দিকে মার্চ করার কথাও বলছে সেখানে। কিন্তু সেই পিকেট লাইনে যোগদানকারী মানুষদের কাছে এ কথা স্বচ্ছ হয়ে গেছে যে এতে এখন আর কোন পরিবর্তন আসবে না, যা ঘটতে যাচ্ছে তার অবশ্যম্ভাবিতাকে রোধ করা যাবে না। মাঝে মাঝে গবর্নর তাঁর আপিসের জানলার পর্দা তুলে পিকেট লাইনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ের পর ঘন সংবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের দৃশ্যটা তাঁর চোখে 'অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং যা দেখলেন তাতে তিনি বিচলিত হলেন না।

লণ্ডনে তখনও ভোর পাঁচটা বাজেনি। মৃত্যুর ঘড়ির কাঁটা তার ক্ষুদ্র বৃত্তটিতে সারারাত ধরে ঘুরে এসেছে। এখন এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ব্রিটিশ কয়লাখনির শ্রমিক, কাপড়ের কলের শ্রমিক আর নাবিকদের মুখ পাংশুর হয়ে উঠেছে। ওদের মৃত্যুর আগের এই শেষ ঘণ্টা, এই কথাটা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়লো। মনে হলো যেন এদের শ্রান্ত দেহ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, আর তাদের ন্যুব্জ দেহ যেন সময় আর দূরত্বের বাধা স্মরণ করে তার অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতিতে আর একটু নুয়ে পড়লো।

রিয়ো-ডি-জেনিরোতে তখন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে। সেখানে ক্রমবর্ধমান এক জনসমুদ্র যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে গর্জন করে আবেদন জানাচ্ছে। সে গর্জন এত তীব্র যে মনে হলো আকাশ তাকে প্রতিধ্বনিত

করে পৌঁছে দেবে সুদূর ম্যাসাচুসেট্‌সের বোস্টন নগরীতে।

মস্কোয় তখন শ্রমিকরা কেবল কারখানায় যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছে। এখানে ওখানে দেয়ালপত্রিকা ঘিরে তারা এক-একটা দল হয়ে ভিড় করতে লাগলো। আর তাদের মুখে মুখে ফিসফিসিয়ে একটা প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়লো, 'বোস্টনে এখন সময় কত?'

অনেকে চোখ মুছলো, গলা পরিষ্কার করলো অনেকে। অন্য সবাই প্রকাশ্যেই কেঁদে ফেললো লজ্জাহীনভাবে, ঠিক যেমন ফরাসী শ্রমিকরা সারারাত আমেরিকান দূতাবাসের বাইরে অপেক্ষার পর কেঁদে ফেলেছিলো।

ওয়ার্শয় দিনের প্রথম আলো কেবল ফুটে উঠছে তখন। সেখানে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চেষ্টা করলেই ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই ওয়ার্শয় শ্রমিকরা নিঃশব্দে ভূতের মতো সারারাত ঘুরে ঘুরে তাদের বেআইনী পোস্টার লাগানো শেষ করেছে। সে পোস্টারে আহ্বান জানানো হয়েছে ওয়ার্শর জনসাধারণের প্রতি সাকো আর ভাঞ্জেত্তির জীবনরক্ষার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করতে।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নীতে তখন বিকেলের মাঝামাঝি। সেখানে নাবিকরা তাদের দড়িদড়া ফেলে রেখে আটজনের সারি করে নগরীর মধ্য দিয়ে মার্চ করে চলেছে আমেরিকান দূতাবাসের দিকে। তীব্রকণ্ঠে তারা দাবি জানাচ্ছে, একজন সৎ জুতোর কারিগর আর একজন দরিদ্র মাছের ফেরি-ওয়ালার জীবন নিয়ে এদের নিজেদের জীবনেরই এক অংশকে ছিনিয়ে নেওয়া চলবে না।

বোম্বাইয়ে তখন বিরাট কাপড়ের কারখানার শ্রমিকরা কেবল তাদের শিফ্‌টের কাজ শুরু করেছে। তখন ক্রীড়াবিদের মতো গতিশীল একজন লাফিয়ে উঠে একটা মেশিনের ওপরে দাঁড়িয়ে অন্য সবাইকে বললো, 'যারা মৃত্যু বরণ করছে, আমাদের সেই দুই কমরেডের সম্মানে এখন এই শেষ ঘণ্টাটি আমরা কাজ বন্ধ রাখবো।'

আর টোকিওতে পুলিস তাদের লম্বা লাঠি ঘুরিয়ে আমেরিকান দূতাবাসের সম্মুখে ঘনসংবদ্ধ শ্রমিকদের পিছু হটিয়ে দিলো। টোকিওতে

তখন দুপুর। শ্রমিকদের দৈন্যময় বস্তিগুলোতে মানুষের মুখে মুখে একই প্রশ্ন। সেখানে অনেকেই লজ্জাহীন হয়ে কেঁদে ফেললো। যদি কান্নার শব্দকে ধরে হিসাব করা যেতো তবে মনে হতো যেন মৃদু কান্নার শব্দ সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। আর এ ব্যাপারে কঠিন সত্য হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের জন্মের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন আর একটি ঘটনাও ঘটেনি, যা এত দূরবিস্তৃত, এত সাধারণ, অথচ এত সহজেই সংবেদন জাগায় মানুষের মনে।

নিউ ইয়র্ক নগরীতে ইউনিয়ন স্কোয়ার নীরব মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তাদের ক্রন্দন মিশে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্রন্দনের সঙ্গে। প্রতি মিনিটে বুলেটিন ছড়ানো হচ্ছে। দণ্ডায়মান স্ত্রীপুরুষের দল পরস্পরের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো কাঁধে কাঁধ দিয়ে, হাতে হাত দিয়ে। তারা শক্তি সঞ্চয় করতে চাইলো সূক্ষ্মদেহ ভয়ঙ্কর মৃত্যুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য, যে মৃত্যু দুজন শ্রমিক আর একটি চোরের জীবন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জীবনেরও একটা মূল্যবান অংশ ছিনিয়ে নিচ্ছে।

কলোরেডোর ডেন্‌ভারে সময় তখন দু ঘণ্টা পিছনে। এই জন্যই হয়তো সেখানকার মানুষেরা তখনো পরিবর্তনের আশা করছে। সেখানে তখনো দরখাস্তে সই হচ্ছে, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে, অনেকে অনুনয় বিনয় করে টেলিফোন অপারেটরদের বলছে বোস্টনে রাজ্যভবনের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দিতে। সানফ্রান্সিসকোতেও এমনি অবস্থা। সেখানে তখন রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে। ওখানকার শ্রমিক স্ত্রীপুরুষেরা ক্রুদ্ধ প্রতীক্ষায় মার্চ করছে, আর সাক্কো-ভাঞ্জেত্তি প্রতিরক্ষা কমিটির স্থানীয় আপিসে ডেন্‌ভারের মতোই উৎসুক এবং মরিয়া হয়ে কাজ করে চলেছে ওরা। সমস্ত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বারো-চোদ্দটা শহরে এই কমিটির আপিস রয়েছে, কোথাও একখানা ভাড়া করা ঘর, কোথাও বা ছোট একটি ডেস্ক শুধু, আবার কোথাও হয়তো কারো বাসগৃহের একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু যেখানেই আপিস আছে, সেখানেই মানুষ জমায়েত হচ্ছিলো এই আশা নিয়ে যে অল্প কয়েকজন মিলেও তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে পারবে আর পারবে তাদেরই ভ্রাতৃতুল্য এই

মানুষ তিনটির জন্য অন্তত কিছু কাজ করতে।

এক বিরাট শোকের পর্দা যেন নেমে এসেছে বোস্টন নগরীর ওপরে। সেখানে এমন একটি পুরুষ, স্ত্রীলোক বা শিশু নেই যে গভীর যন্ত্রণাময় অনুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারছিলো না বন্দীশালায় কী হচ্ছে। জলে ঘেরা ছোট্ট চার্লসটাউন বন্দীশালা আলোয় উদ্ভাসিত। রক্ষীরা দুর্ভাবনায় এবং আশঙ্কায় তাদের মেশিনগানের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সৈনিক আর পুলিসেরা কাছাকাছি সব রাস্তাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব লোক, যাদের জীবনের কর্তব্য, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুর মতো মানুষকে পাহারা দেওয়া, তাদের কাছে সারা পৃথিবীর এবং বোস্টনেরও সমস্ত ঘটনা এক দুর্ভেদ্য রহস্য বলে মনে হচ্ছিলো। এই দুটি ঘৃণিত বিপ্লবীর নির্যাতনকে কেন যে সমস্ত মানবজাতির একটা বিরাট অংশ ভাগ করে নিচ্ছিলো, তার লেশমাত্রও উপলব্ধি করতে পারলো না ওরা। সরকারীভাবে অধিশিষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সাম্যবাদীরা তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই মানুষ দুটিকে ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া এর মধ্যেই এত দূরপ্রসারী হয়েছে যে এই ব্যাখ্যার কোন মূল্যই দেয়নি কেউ। তা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে আর রয়েছে শুধু একটা ভাষাহীন প্রশ্ন তাদের মুখে মুখে, যাদের পক্ষে এই দুজন মৃত্যু-মুখাপেক্ষী ইতালীয়কে ঘৃণা করা প্রয়োজন, আন্তরিকভাবে ওদের মৃত্যুকামনা করা প্রয়োজন। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলো, এই শেষ ঘণ্টাটিতে তারা প্রায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে। সঠিক বলা যায় না কত লোক সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সুবিচারের জন্য জীবনপণ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর সব মহাদেশ মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম হবে না। তাঁদের প্রত্যেকে এই শেষ ঘণ্টায় তাঁর নিজের বিশ্বাসে অটল রইলেন। আইনের অধ্যাপক তাঁদেরই একজন। বন্ধুত্বের তাগিদে, কিছু কাজ করার তাগিদে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার তাগিদে তিনি আবার এসে পিকেট লাইনে যোগ দিয়েছেন। নিকোলা সাক্কো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তির মৃত্যুর আগেকার এই মিনিটগুলোতে তিনি পিকেট লাইনের সঙ্গে রইলেন। মিনিটগুলো যতই শেষ হয়ে আসছিলো ততই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন, কেমন নাটকীয় পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি।

বোস্টন এবং সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মতো তিনি সোজাসুজি সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে নিজের সব জিজ্ঞাসার নিরসন করতে পারছিলেন না। স্বাভাবিকভাবে তাঁর নিজের মনোবিকলনের ধারা আরো জটিল, আরো কুটিলগতি। তাই তার সন্তুষ্টি সহজে আসে না। অন্য সব মানুষের মতোই ভবিষ্যতের ছবি তিনি দেখতে পান না, তিনি জানেন কী না ঘটবে, সে ঘটনায় কোন্ অংশ গ্রহণ করবেন তিনি। কিন্তু এই সহজ কথাটি তিনি বুঝতে পেরেছেন, যারা ক্ষমতাশালী, তারা সাধারণ নির্যাতিত মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এ কথাও তিনি জানতেন, শক্তির প্রশ্ন প্রার্থনায় সমাধান হয় না। তবু এর পরের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছেন। তিনি জানতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মুক্তি চেয়েছিলো, তারা, শুধু আমেরিকার এই মানুষেরা, যদি একক ঘনসংবদ্ধ আন্দোলনে দানা বেঁধে ওঠে, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়, অথবা একে পুরোপুরি সম্ভব মনে করেন না তিনি। কিন্তু তাঁর এই অনুভূতির সঙ্গে মিশে রয়েছে গভীর ভীতি আর অস্বচ্ছ আশঙ্কা।

ওঁর ভয়ের খানিকটা ছিলো পিকেট লাইনের যোগদানকারী সাধারণ শ্রমিকদের সম্পর্কেই। নিজের কাছেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "ওরা কী অনুভব করছে? কী ভাবছে ওরা? কেমন ব্যঞ্জনাহীন কঠিন ওদের মুখ। মনে হয় একটুও বিচলিত হয়নি ওরা, অথচ আসলে ওরা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওই তো মেয়েদের কোলে শিশুরা, আর পুরুষদের মুখে কর্মশ্রান্তির ছাপ। ওদের শোকের নিশ্চয় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য ওরা এই শোকাহত শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। কী সেই বৈশিষ্ট্য? কী ভাবছে ওরা?" তারপর নিজেকেই আবার তিনি বললেন, "এ বিস্ময়কর বটে, কিন্তু ওরা কী ভাবে তা নিয়ে তো কোনদিন মাথা ঘামাইনি আমি। এখন তা জানতে চাইছি। আমি জানতে চাই কোন্ বিশেষ বাঁধনে ওরা বাঁধা পড়েছে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির সঙ্গে। আমি জানতে চাই, কেন আমার এই ভয়।"

আসল কথা হচ্ছে, তাঁর ভয়ের উৎস একাধিক, তার প্রকাশও হয়েছে একাধিক ধারায়। আর খানিক বাদেই সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির কী পরিণতি হবে তা ভাবতেও মৃত্যুর ভয়াবহ শীতলতা নেমে আসছিলো তাঁর অন্তরে। আবার পিকেট লাইনের মানুষগুলোর ভোঁতা কঠিন ক্রুদ্ধ মুখগুলোর কথা ভেবেও মনে মনে ভয় এবং অমঙ্গলাশঙ্কায় এক শীতলতা অনুভব করছিলেন তিনি। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, 'ওরা যদি জেগে উঠে, তবে কী হবে? ওরা আর ওদের সঙ্গে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি জেগে উঠে বলে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে ওরা মরতে দেবে না? কী হবে তবে? আমি তখন কোথায় দাঁড়াবো?"

তিনি যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আজই খানিক আগে প্রতিরক্ষা দপ্তরে তাঁর এই সন্দেহ এবং গভীর দুশ্চিন্তার কথা তিনি বলেছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিরক্ষা সমিতির একজনের কাছে। তিনি জানতেন মানুষটি সাম্যবাদী। লোকটি দীর্ঘকায়, মুখখানা কৌণিক, তাঁর মাথার চুল লাল। আস্তে কথা বলেন তিনি, এককালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাঠের ব্যবসায় করতেন। পরে সমাজতন্ত্রীদের সমর্থনে তিনি রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। আর তার ক'বছরের মধ্যেই নবগঠিত বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী দলের বিশিষ্ট সভ্য হয়ে পড়েছেন। এ কথা কখনো তিনি গোপন করেননি। অংশত সেই কারণেই আইনের অধ্যাপক আজ বিকেলে ওঁকে খুঁজে বের করে চূড়ান্ত হতাশভাবে বলেছিলেন, 'ওরা এখন মরবে, আর কোন আশা নেই।'

সাম্যবাদী বললেন, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

'ও শুধু কথার কথা।' অধ্যাপক বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা, 'আমি বন্দীশালায় গিয়েছিলাম, এখন সেখান থেকেই আসছি। এই শেষ। শুরুতেও যেমন ছিলাম, সব শেষেও তেমনি হতাশ হতে হলো। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমি জানি, ওরা নির্দোষ, তবু ওদের মরতে হবে। ওদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৎবুদ্ধির ওপরে আমার বিশ্বাসেরও মৃত্যু ঘটবে।'

'আপনি সহজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন।' সাম্যবাদী বললেন

'তাই কি ? আপনার বিশ্বাস কি এর চেয়ে গভীর ? কোথায় আপনার বিশ্বাস ?'

'আমেরিকার শ্রমিক সাধারণের ওপরে।' সাম্যবাদী জবাব দিলেন।

'ওটা আপনাদের পুঁথিগত বিদ্যার কথা। বাস্তবে কি তাই আছে আপনাদের ? আপনাদের সঙ্গে কোনদিন তর্ক করিনি আমি। আমি জানতাম, এই মামলাটির সব ব্যাপারে আপনারা ছিলেন। মাঝে মাঝে আপনাদের উৎসাহী এবং নিঃস্বার্থ কাজ দেখে আপনাদের প্রশংসাও করেছি। সাম্যবাদী হলেই অন্য সবার মতো আমি তাকে গালাগালি করি না, কারণ সুবিচারের পৃথিবীতে অন্য সবার মতোই আমারও বাঁচার প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই আপনাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছি আমি। কিন্তু আপনাদের বর্তমান মনোভাব আমায় মনে ক্রোধের উদ্রেক করছে। কোন বিশ্বাস আছে আপনাদের শ্রমিক সাধারণের ওপরে ? তারা কোথায় ? হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে ওরা হত্যা করছে, কারণ ওরা শ্রমিক, ওরা ইতালীয়, ওরা সাম্যবাদী, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী—কারণ এদের সতর্ক করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন, সবার কৃতকর্মের জন্য অন্তত কাউকে বলি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় আপনাদের শ্রমিক সাধারণ ? ফেডারেশন তো কিছু করলোই না, তার বড় বড় নেতারা চুপচাপ বাড়িতে বসে আছে, এমন কি পিকেট লাইনেও আসেনি তারা। আর শ্রমিকরা,—তারা কোথায় ?'

'সর্বত্র।'

'ও কি একটা জবাব হলো ?'

'এই মুহূর্তে এইটেই জবাব। আপনি কি চান শ্রমিকরা বন্দীশালায় অভিযান করে গিয়ে সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে মুক্ত করে আনুক ? অলীক স্বপ্নে ছাড়া এমনটি কখনো ঘটে না। সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে হত্যা করতে পারে ওরা। ওরা আলবার্ট পার্সন্‌স্‌কে হত্যা করেছে, টম্ মুনী এখনো বন্দী, আরো অনেকে নির্যাতিত হবে, কিন্তু চিরদিন নয়। হত্যাকারীর মতো এইসব কাজ ওরা করছে শুধু একটি মাত্র কারণে,—ওরা আমাদের ভয় করে, ওরা জানে চিরদিন এইসব আমরা সহ্য করবো না।'

'কারা সহ্য করবে না ? সাম্যবাদীরা ?'

'না, সাম্যবাদীরা নয়, শ্রমিক সাধারণ। আর যারা সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিকে হত্যা করছে তারা সাম্যবাদীদের ভয় করে, কারণ সাম্যবাদীরা সেই শ্রমিক সাধারণের সঙ্গেই মিশে আছে।'

'কী যে চিন্তাধারা আপনাদের!' অধ্যাপক বললেন, 'আজকের এই বিশেষ রাত্রিতে এ কথায় আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন?'

'আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনার বিশ্বাস, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি এবং ন্যায়বিচারের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'ও বড় নিষ্ঠুর কথা।'

'কিন্তু এ সত্যকে আপনার স্বীকার করতেই হবে।'

'যদি স্বীকারও করি, তবু এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে আপনার কথাগুলো কি বাগাড়ম্বর বলে মনে হয় না? সমস্ত পৃথিবী দাবি জানাচ্ছে, ওদের হত্যা করা চলবে না, তবু মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে ওদের। স্বীকার করছি, আমি ভীত। আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি। আপনাদের নামগোত্রহীন শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আপনাদের যেমন বুঝতে পারি না, তারাও তেমনি দুর্বোধ্য আমার কাছে।'

'সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিও দুর্বোধ্য আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তিও।' আইনের অধ্যাপক দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন। এ কথা সত্য। তাঁর চূর্ণিত আশা এবং হারানো বিশ্বাসের জন্য গভীরভাবে দুঃখাহত তিনি। পিকেট লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে বললেন, 'এখন আমি সত্যিই নিজের জন্য কাঁদছি, ওদের জন্য নয়। মহামূল্যবান অপূরণীয় এক সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি আমি। নিজের জন্যই কাঁদছি নিজে।'

এমনি করে প্রত্যেকে কাঁদছিলো তার নিজের মতো করে। কিন্তু তবু কিছু লোকের চোখ শুকনো। ওরা না কেঁদে অন্য কাজ করছিলো। তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, চিরদিন মনে রাখবে এ ঘটনা, নিজেদের একাত্ম করে দেবে ওদের সঙ্গে। অন্তরে তারা লিখে রাখছিলো সব কথা

মনুষ্যজাতির আদি থেকে আজ পর্যন্ত সবকিছুর এক হিসাবনিকাশ করছিলো মনে মনে, স্মরণ করছিলো কবে প্রথম ন্যুব্জ পিঠের উপরে প্রথম চাবুক পড়েছিলো। যাদের চোখে জল নেই তারা পরস্পরকে বলছিলো, 'কান্নার চেয়ে বেশি কিছু সম্ভব, চোখের জলের চেয়ে ভালো অন্য কিছু।'

আর বন্দীশালার অভ্যন্তরে তখন শেষ ঘণ্টাটিও শেষ হয়ে এলো। ওদের তিনজনের প্রথম মানুষটির মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত,—সে জন সিলেস্তিনো মাদীরো,—চোর, খুনী। ডেপুটি ওয়ার্ডেন এবং দুজন রক্ষী ওর কুঠুরির দরজায় এসে ইঙ্গিত করলো। মাদীরো ওদের প্রতীক্ষায় ছিলো। অত্যন্ত শান্তভাবে বিস্ময়কর আত্মমর্যাদার সঙ্গে সে উঠে এসে রক্ষী দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তেরোটি পদক্ষেপ ফেলে মৃত্যুপ্রকোষ্ঠে হেঁটে এলো। সেখানে এসে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে দর্শকদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। পরে কেউ কেউ বলেছিলো, ওর মুখে নাকি ছিলো ক্রোধের অভিব্যক্তি। কিন্তু অন্য সবাই বলেছিলো, বৈদ্যুতিক চেয়ারে ওকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখাচ্ছিলো। ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ ওর শরীরের মধ্য দিয়ে বইয়ে দেওয়া হলো। বন্দীশালার আলোগুলো একবার স্তিমিত হয়ে আবার জ্বলে উঠলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সিলেস্তিনো মাদীরোর মৃত্যু হলো।

এর পরে নিকোলা সাক্কোর পালা। মাদীরোর মতোই সেও সহজ আত্মমর্যাদা নিয়ে হেঁটে এলো। মাদীরোর পরে ওর এই ধীরভাব দেখে দর্শকদের মন ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দুজন লোক এমনি সহজভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করবে, এটা স্বাভাবিকও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। তবু তাই ঘটলো।

সাক্কো একটি কথাও বললো না। গভীর শান্তি এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে হেঁটে গিয়ে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসলো। ওরা যখন বৈদ্যুতিক তারগুলো ঠিক করছিলো, তখন সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। আলোগুলো স্তিমিত হলো, আর এক মুহূর্ত পরেই মৃত্যু হলো নিকোলা সাক্কোর।

সবার শেষে বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি। এই কার্যক্রম কর্মচারীদের কাছে এবং যারা মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে এসেছে, সেই সাংবাদিকদের কাছে যেন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠলো। সাক্কোর মৃত্যুর পরে একটা সশব্দ

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সমবেত মানুষগুলোর মধ্য থেকে। আর সবাই ফিসফিসিয়ে আলোচনা করতে লাগলো ভাঞ্জেত্তি কী করবে। ওরা যেন মৃত্যুপ্রকোষ্ঠে ভাঞ্জেত্তির প্রবেশের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছিলো, কিন্তু ঠিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারলো না ওরা। মৃত্যুপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার সময়ে তার সিংহের মতো ধীরতা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি কী গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। তার আত্মসমাহিত শান্ত ভাব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওদের অসহ্য হয়ে উঠলো। ওদের আত্মসন্তুষ্টি, তিনটি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যক্ষ করার সহনশক্তি সত্ত্বেও ওরা আর সহ্য করতে পারলো না। ওদের আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তিকে সে গুঁড়িয়ে দিলো। যেন বিচারের দৃষ্টি নিয়ে সে ওদের দিকে তাকালো। তারপর আগে থেকেই স্থির করা কথা কটি ধীরে পরিষ্কারভাবে সে বললো, 'আমি আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই, আমি নিরপরাধ। কোনদিন কোন অপরাধ আমি করিনি। হয়তো কিছু পাপ করেছি, কিন্তু অপরাধ নয়।...'

অনেক কঠিন মানুষ ছিলো সেখানে। তবু তাদের কণ্ঠ সঙ্কুচিত হয়ে এলো। অনেকেই নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। আমেরিকানবাদ বলে যা পরিচিত তার সম্পূর্ণ বিরোধী দুটো ইতালীয় বিপ্লবীর জন্য তারা কাঁদছে বলে কান্না থামানোর কথা কেউ ভাবলো না তখন। এ কথা কারো মনেই এলো না। কেউ কেউ চোখ বুজলো, কেউ বা মুখ ঘুরিয়ে নিলো। তারপর স্তিমিত হয়ে এলো সমস্ত আলো। আবার যখন সব আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ততক্ষণে বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তি মৃত।

কথাশেষ

এককালে এই বোস্টন নগরীতে ছিলো এক ক্লাব। নাম তার এথেনিয়াম্। সুদূর অতীতে ইমার্সন আর থোরোর সময় থেকে যাঁদের নাম যুক্ত রয়েছে এই নগরীর অতীত ইতিহাসের সঙ্গে, তাঁরা সবাই ছিলেন এই ক্লাবের সভ্য। সাকো আর ভাঞ্জেত্তির চরম বিচার যাঁরা করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির মতো সেই সব ব্যক্তিদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিলো এই ক্লাবে। কোন বিদেশী, কোন ইহুদি কিংবা কোন নিগ্রো এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি কোনদিন।

মৃত্যুদণ্ডের পরের দিন উনিশশো সাতাশের তেইশে আগস্ট ভোরবেলা দেখা গেলো এই ক্লাবের পাঠগৃহের প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার সঙ্গে লাগানো রয়েছে এক এক টুকরো কাগজ। আর তার প্রতিটি টুকরোতেই লেখা রয়েছে :

"এই দিনটিতে বর্বর নিষ্ঠুরতায় হত্যা করা হয়েছে নিকোলা সাকো আর বার্তোলোমিউ ভাঞ্জেত্তিকে। ওরা স্বপ্ন দেখতো মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্রের; আশা করেছিলো, আমেরিকায় তা সম্ভব হয়ে উঠবে। আর এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক হলেন তাঁদেরই সন্তানরা, যাঁরা দূরাতীতকালে পালিয়ে এসেছিলেন মুক্তি আর আশার এই পিতৃভূমিতে।"